সে ছিল শয়তানী

বিকাশ কান্তি রায় চৌধুরী

ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

প্রকাশক
শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ পট
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

ছয় টাকা।

যাঁরা অগ্রজ, বাংলা-সাহিত্যের সারস্বত সভায় হাত ধরে যাঁরা এগিয়ে
নিয়ে এলেন অনুজকে, আর আমার দরদী পাঠক সমাজকে—

শয়তানের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বড় নির্মম, ওরা সন্ধি করেনা। হত্যা মদে মাতাল যে মানুষ সেও তার ছবি দেখতে পায় আপন মন-মুকুরে। ফলে, রক্তাক্ত হয়ে ওঠে শিকারীর অন্তর। অন্তরের সেই আনন্দ-বেদনার উত্তাল তরঙ্গে শিকারীর প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয় তার কাহিনী। অনেক বড় গৌরবের সাথে অনেক বড় গ্লানি, অতিকায় লাভের খাতায় পাতাজোড়া লোকসান, অনেক বাহবার নিচে গুমরে মরা অনেক ব্যথা—এই তার জীবন। তাই শিকার আর তার শিকারী—এ দুয়েরই কাহিনী নিয়েই 'সে ছিল শয়তানী'।

এই লেখকের অন্য বই ঃ

‘অরণ্য-ভারত’

অরণ্য ও আরণ্যকের অনবদ্য জীবন বেদ ।

॥ এক ॥

'ঘউ-ঘউ-ঘউ'—কাছারির ঘাটে পা দিতেই ঐকতান তুলে অভ্যর্থনা জানায় ওরা। একটি দুটি করে ওরা আমাকে ঘিরে ধরলে শেষ পর্যন্ত। দাবী আদায়ের জন্যে যেন একদল নাছোড়বান্দা ধর্মঘটীর পাল্লায় পড়লুম।

'ঘউ-ঘউ-ঘউ'—তারস্বরে চেঁচিয়ে ওরা গলা ফাটায়, তবে ওরা মারমুখো মোটেও নয়।

ধ্বনি ধরনের অভ্যর্থনায় আমি এখন অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু আজ যেন বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি। ওদের অভাব-অভিযোগটা নিতান্তই আটপৌরে। মানুষের ভাত কাপড়ের আর্জিটাকে ওরা শুধু দুবেলার দুমুঠোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছে। তবু ঐটুকু দিতেও কাছারির পাঠক সিং নিতান্ত নারাজ। তাছাড়া খ্যাপা বরকন্দাজ তো তার পাঁচ হাতি পাকানো বংশদণ্ডটি হামেশাই উঁচিয়ে আছে। কাছারিবাড়ির বাঁশের বেড়া ওদের মুখের ওপর প্রবেশ নিষেধ পরোয়ানা টানিয়ে দিয়েছে বলেই বোধ হয় পথের মাঝখানে ওরা আমাকে পাকড়াও করলে আজ।

বহু সাধ্য সাধনায় সোরগোল থামিয়ে বহুতর কৌশলে বোঝালুম যে আর্জি ওদের বেবাক মঞ্জুর করেছি আমি।

দল থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল এক কুকুরী মা। কোলে তার গোটা চারেক কচি-কাঁচা। বাচ্চা কটিকে কোলে কাঁধে নিয়ে পা বাড়ালুম কাছারির দিকে। ওরা লেজ নাড়ে। কুকুরী মা আমার পায়ের উপর গড়াগড়ি দেয়।

ঢালাও হুকুম এবার। রীতিমত মাছভাতে রাখবে ওদের বহাল তবিয়তে।

দুপুরের ভোজ সেরে আবার তারস্বরে তান ধরলে ওরা। দিব্যি পেট পুরে আহার পেয়েছে। তাই বুঝি এই সাধুবাদ! না, এ তো কৃতজ্ঞ কণ্ঠের কোরাস্ নয়— এ যে বিক্ষোভেরও বাড়া। ওদের ভাষা আমার কাছে হিব্রুর চাইতেও হয়তো দুর্বোধ্য। তবু এইটুকু বুঝতে দেরী হলো না যে আরও কিছু আর্জি ওদের নামঞ্জুর রয়ে গেছে তখনও।

কিন্তু কি সে আর্জি!

বিকেল বেলায় বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লুম 'গ্যাঁড়াপোল' পাখি শিকারের চেষ্টায়। শিকলে বাঁধা 'বাঘা'ও ছিল সঙ্গে। বাঘা বাঘ নয়। তবে কাছারির পোষ্য হিসেবে মাছ মাংসের কল্যাণে ওর চেহারাখানি বেশ তেল-কুচকুচে ভুঁড়িভারী গোছের। বাঘার বাবা এ্যালশেসিয়ন জাতে নিকষ কুলীন। মায়ের জাত গোত্র অবিশ্যি বড় গলায় বলার মত কিছু নয়। মেঠো কুকুরের পাল বাঘাকে বেশ সমীহ করে চলে। হয়ত হিংসেও করে কিছুটা। তবু ওরা যে যেখানে ছিল অচিরেই এসে জুটলো আমার পাশে।

ভুঁড়িভারী মানুষের যা হয়—বাঘাও একটু আলসে। তাই দু একবার বিরক্তি প্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু আভিজাত্যের মান ভুলে জনতার সাথে ভিড়ে গেল সে।

অদূরে নদীর ওপারে সুন্দরবন। দিগন্ত বিস্তৃত নীল অন্তহীন আকাশের ললাটে যেন এক গভীর গাঢ় নীল ছাপ লেপে দিয়েছে কেউ। বিদায়ী সূর্য সেই প্রশস্ত নীল কপালে সিঁদুরের টিপ্ হয়ে জ্বলেছে। গম্ভীর, ধ্যানমগ্ন, বিরাট, মুদ্রিত-চক্ষু, কুঞ্চিত ললাট। নদীর ঢেউভাঙা জলে শত লক্ষ হয়ে লুকোচুরি খেলছে লাল সূর্য। ভেড়ির উপরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চেয়ে দেখছিলুম সেই খেলা।

হঠাৎ আমার সারমেয় বাহিনী এমন হৈ হুল্লোড় শুরু করে দিলে যে বোকা বনে গেলুম প্রথমটা। ভেড়ির নিচে কেওড়ার ঘন জঙ্গলে বাঘিনী এসে আস্তানা গাড়ে প্রায়ই। আত্মরক্ষার অভ্যস্ত তাগিদে

কয়েক পা পিছু হটে এসে আশ্রয় নিলুম রোদে বিছানো জেলেদের কটি জালের পেছনে।

বাঘার নেতৃত্বে বিশৃঙ্খল বাহিনীতে শৃঙ্খলা বজায় হয়েছে ততক্ষণে। নিজের মনেই হেসে মরি। ও হরি! এতো বাঘিনী নয়, বাঘরোল মাত্র। অতগুলো ষণ্ডামার্ক কুকুরের বেড়াজালে আটক পড়ে বেচারী ভয়েই কাঠ। অতএব আমার সারমেয় বাহিনীকে অবিলম্বে অবরোধ ত্যাগের নির্দেশ দিলুম। কিন্তু কে শোনে কার হুকুম।

বাঘাকে টেনে নিয়ে সবে মাত্র ভেড়ির উপরে উঠেছি, হঠাৎ কানে এলো খ্যাক্-খ্যাক্-খ্যাক্। আক্রমণের হুঙ্কার নয়—নিতান্তই করুণ কাতর আর্তনাদ। ছুটে যেয়ে দেখি মস্ত বড় এক কুমীরের লম্বা চোয়ালের নাগপাশে বন্দী হয়ে বৃথাই হাত পা ছুঁড়ছেন ক্ষুদে বাঘ মশাই। কুমীর ভায়া মিটি মিটি চায়। কুকুরকুলের কোলাহলের প্রতি বেশ একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে গুটি গুটি তিনি নেমে পড়লেন নদীতে। টুপ—অদৃশ্য হলো কুমীর তার শিকার সমেত।

ভেড়ির পথ বেয়ে এগিয়ে চললুম বনের দিকে। একপাশে লম্বা শীষওয়ালা ধানের ক্ষেত। বহুদূর পর্যন্ত হলুদ সোনা রঙের তলে লুকিয়ে আছে মাটি। এখানে ওখানে ছোট বড় ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছের খণ্ড খণ্ড জঙ্গলও দেখা যায় ধানের ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে। ভেড়ির অপর পাশে নদীর পাড় বরাবর চলেছে কেওড়া আর গেঁয়োর গভীর নিরেট জঙ্গল। অজগরের মত প্রস্থের অভাব সে পুষিয়ে নিয়েছে তার অতিদীর্ঘ আকারে।

অদূরেই নদীর ওপারে শুরু হয়েছে সুন্দরবনের সীমা।

অতএব এই ভেড়ির পথে একেলা চলেনা বড় কেউ। কাছারি থেকে রূপো আসতে চেয়েছিল সঙ্গে। ওকে ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলুম। কিছুটা এগিয়ে দেখি ভেড়ির নিচেকার সরু পথে ধানের ক্ষেতের আড়ালে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছে রূপো। নায়েব মশায়ের হুকুম—অতএব সে নিরুপায়।

রূপোকে অনেক বোঝালুম এবার। আমি তো আর সেই খোকাবাবুটি নই এখন। এখানকার পথ ঘাট ঝোপ জঙ্গলের খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমার নখদর্পণে। তাছাড়া হাতে রয়েছে গুলিভরা দোনলা। আকাশের উড়ন্ত পাখিকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারি খুশিমত। গাছের ডালে ডালে বানরকুল, সঙ্গে একপাল কুকুর।

ইচ্ছে ছিলনা, তবুও রূপোকে বিদায় নিতে হলো বাধ্য হয়ে। বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললুম আমি।

নদীর বাঁকে চড়ার উপর তখনও রোদ পোহাচ্ছে কটি কুমীর। একরাশ হাড়গোড় নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলছে ওদের ছা-বাচ্চারা।

এক ঝাঁক বকও নির্বিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে লম্বা তালে পা ফেলে।

আর ঐ বানরকুল! বন্দুকওয়ালা মানুষকে ওরা মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখেনা সত্যি। তবে আজ কিন্তু ওরা গা ঢাকা দিলে। বরং মানুষের সাথে মেঠো কুকুরদের এমন আত্মীয়তা দেখে ওরা খুব একচোট ঠোঁট উলটে হাসলে বোধ হয়। ভারী মজা মনে হলো ওদের। গাছের ডাল ঝাঁকিয়ে আর ভেঙচি কেটে ভয় দেখায় ওরা। কুকুরের পাল যত চেঁচায়, ওরাও তত ক্ষ্যাপায়।

বনের পারে একপাল বনমোরগ রঙবাহারী তুফান তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এপারেও মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল কয়েক ঝাঁক পাখি। ওদের পেছনে আরও উঁচুতে উড়ে চলেছে দুটি পাখি, এক জোড়া কাস্তেচোরা। তাড়াতাড়ি বন্দুক উঁচিয়ে লক্ষ্য করলুম ওদের একটিকে। উড়ে চলার গতিবেগ নিয়ে ধানের ক্ষেতের অনেকখানি দূরে এসে পড়লো শিকার। জোড়ার অনাহত পাখিটি চক্রাকারে তখনও উড়ে বেড়াচ্ছে মাথার উপরে আর চেঁচিয়ে ডেকে মরছে ওর হারানো সঙ্গীকে।

ওর ঐ অলক্ষণে ডাকে যেন চাবুকের মার। বন্দুকে তখনও ভরা রয়েছে একটি গুলি। বাকীটাও ভরে নিলুম। কিন্তু কি যেন

মনে হলো। ভাবলুম, থাকগে যাক। দেখিনা কেন আগে, কতবড় শিকার নিয়ে ফিরে আসে বাঘা।

ফিরে এলো বাঘা। যত জোরে ধানের ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শিকার কুড়িয়ে আনতে তার চাইতে অনেক বেশী জোরে ছুটে ফিরে এলো সে। আশ্চর্য ব্যাপার! মুখে তার শিকার নেই অথচ চীৎকারও নেই।

শুধু অস্ফুট গোঙরানি। মেঠো কুকুরের দল হুল্লোড় শুরু করে আবার। বাঘা ভয় পেয়েছে ঠিকই, খুবই ভয় পেয়েছে।

তবে কি আহত শিকারকে আগেভাগেই আগলে বসে ছিল কোন বাঘ! না, খুব সম্ভব অদূরের ঐ খণ্ড জঙ্গলে আছে বানরদের আড্ডা। দলবদ্ধ বানরযূথের তাড়া খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছে বাঘা। কিংবা হয়তো উদ্যতফণা কোন সর্পরাজের ফোঁস ফোঁসানির মুখে নিতান্ত বেসামাল হয়ে পড়েছে সে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ধানের ক্ষেতে নেমে এখন শিকার সন্ধান করার চাইতে সাধ করে ফাঁদে পা বাড়ানো বোধ হয় বেশী বোকামি নয়। তাছাড়া কুকুরগুলোও কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। অতএব কাস্তেচোরা পাখির মুখরোচক মাংসের মায়া ত্যাগ করে কাছারির পথে পা বাড়ালুম।

মেঠো কুকুরের দল কাছারিবাড়ির এলাকাকে এড়িয়ে চলে বরাবর। কিন্তু আজ ওরা আমার সাথে ঢুকতেই চেয়েছিল। রূপোকে দরজার কাছে দেখে ওরা শত হস্ত দূরে দাঁড়িয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানালে। কুকুরী মা কিন্তু নির্ভয়ে এগিয়ে এলো আমার পায়ের কাছে। রূপোকে বললুম ওর বাচ্চা কটিকে এনে দিতে ওদের মায়ের কাছে। বাচ্চা কটিকে দুধ খাইয়ে চলে যাচ্ছিল মা।

তবে বাচ্চারা যে নাছোড়বান্দা। কুকুরী কিন্তু ওদের সঙ্গে নিতে চায়না। ধমক দেয়। তারপরে মুখে করে তুলে নিয়ে একটি একটি

করে সব কটিকেই এনে দিলে আমার কাঁছে। আমি ওদের কোলে তুলে নিতেই কুকুরী মা চলে গেল ওর দলে।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে গলা টিপে ধরলে পৃথিবীটার। রাতের আহার নিয়ে বেড়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রূপো বরকন্দাজ হাঁক দেয়, 'আয়, ব্যাটারা আয়'। সাড়া দেয়না ওদের কেউ। অথচ আশপাশেই আছে সবাই।

রূপোর মুখে খবর শুনে শেষ পর্যন্ত উঠে আসতে হলো আমাকে। আমি ডাকি, 'আয়রে তোরা আয়'। ওরা অমনি উত্তর পাঠায়—'ঘউ-ঘউ'। আবার ডাক দিতেই ওরা এলো বটে, কিন্তু বাড়া ভাতে মুখ না দিয়েই চেঁচিয়ে পাড়া মাতায়। কুকুরীমা তো তার সুমুখের পা দুটি দিব্যি তুলে দিল আমার গায়ের ওপর।

রূপো ববকন্দাজের রাগ হয়—'নেড়ী কুত্তা তো। নাই দিলি মাথায় উঠতি চায়। খাতি পেয়েছে, এখন শুতি দাও, নেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুতি দাও। বাইরি যে ঠাণ্ডা পড়তিছে।'

'তবে আসতে দে ওদের কাছারির মধ্যে। আস্তাবলের পাশের ঘবটা তো খালি। ওখানেই থাক কেন ওরা।'

'দোহাই দাদাবাবু'—রূপো যেন আঁৎকে উঠলে আমার কথায়। 'কত্তাবাবু আসিতিছে কাল কাছারি দেখতি।'

'বেশ, তবে বাবা এলে কালই এর ব্যবস্থা হবে'—রাগ করে আমি চলে এলুম আমার নিজের ঘরে।

রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমোয় কার সাধ্যি। মেঠো কুকুরের দল মহা সোরগোল তুলে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাঘাও চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে।

ঢং ঢং—দেওয়ালের বড় ঘড়িটাতে দুটো বাজলো।

পাশের ঘর থেকে সাড়া দেয় পাঠক সিং। 'ও কিচ্ছু ভয় নেই হুজুর। ওরা হামেশাই চেঁচায় অমনি। শীতের শুরু থেকে শেষ অবধি একটু চেঁচামেচি তো হয়েই থাকে'।

পাঠক সিং আরও কিছু বোঝাতে চাচ্ছিল তার ক্ষুদে হুঁজুরকে, কিন্তু ও ঘর থেকে নায়েব মশায়ের গলা শুনে সে থেমে গেল। 'ঐ হাড় হাবাতে অলপ্পেয়েরা তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে বাবা। কালই আমি ওদের দূর করবো। কিছুকাল ধরে গেরস্তের হাঁস মুরগী খায়, ছাগলছানা পর্যন্ত সাবড়ে দিতে শুরু করেছে ওরা। যার খাবি তাকেই জ্বালাবি। দাঁড়াও বাবা, সকালটা একবার হোক—'

'সকাল পর্যন্ত সবুর সইবেনা নায়েব মশায়। এক্ষুণি আমি দেখতে চাই ব্যাপারটা। হ্যাঁ—এক্ষুণি।' গেরস্ত বাড়ির আদাব আস্তাকুঁড়ের ফ্যান চেটে যারা কৃতজ্ঞতায় লেজ নাড়ে তারাই কিনা চুরি করে গেরস্তের হাঁস মুরগী!

বুকের ভেতরটাতে এক অজানা উৎকণ্ঠা। রূপোকে বলি বড় পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালিয়ে নিতে। পাঠক সিংকে হুকুম করি ওর বন্দুক ভরে নিতে। নিজেও ভরে নিলুম আমার দোনলা। নায়েব মশায় নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখেন শুধু।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। আলো দেখে ছুটে এলো তক্ষুণি মেঠো কুকুরের পাল। কেঁউ কেঁউ করে ওরা নালিশ জানায়—বড় মর্মান্তিক সেই অভিযোগ।

সবাই এসেছে ওরা। কিন্তু কোথায় সেই কুকুরী মা? আমি চেঁচিয়ে ডাকি, 'আয়-বুড়ি আয়'। কেওড়ার জঙ্গলে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে আমার আকুল কণ্ঠস্বর। ধানের ক্ষেতে প্রতিধ্বনি জাগে—সে যে হারিয়ে গেছে হায়। কুকুরী মা নিয়ে গেছে শেষ বিদায়। ওর সঙ্গীরা শুধু তাই আমাকে দেখায়। রক্তের দাগ জমাট বেঁধেছে কোথাও। তারপর সে হালকা হয়ে হারিয়ে গেছে ধানের ক্ষেতে।

পায়ের ছাপ এঁকে গেছে খুনী। খুঁটিয়ে দেখি সেই ছাপ।

আজ রাতে তার তল্লাসী নিরর্থক। খুনীর পাত্তা পাওয়া যেতে পারে কাল সকালে।

ফিবে আসছিলুম নিজের ঘবে। বেড়াব দরজা খুলে ধরে রূপো ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'ওদের একটু হুকুম কব দাদাবাবু। আস্তাবলেব পাশের ঘরটাতেই আস্তনা নিক ওবা'।

এব পবেও আবাব ঘুম! ভোব না হতেই ডেকে তুললুম সনাতনকে। ঘোড়া ছুটিয়ে ডেকে আনুক সে ময়না শিকাবীকে।

চতুষ্পদীদেব পায়েব ছাপ পড়তে জানে শুধু মযনা। হ্যাঁ, অমন নির্ভুলভাবে আব কেউ বলতে পাবে না অত খুঁটিনাটি।

আমিও পাঠ নিয়েছি দীর্ঘ দশ বছব ধবে। পদাঙ্ক পাঠ কবেই আমি তখন বলতে পাবি পাযেব মালিকেব বয়স কত। অস্পষ্ট পাযেব ছাপ অনুসবণ কবে নির্ভুলভাবেই আমি আন্দাজ কবেছি ভবঘুবে বাঘেব ঠিকানা।

আবাদী প্রজাব মন পাইনি তবু—বাহবা তো দূবেব কথা।

ময়না শিকাবীকে ওবা বলে বনবিবিব ববপুত্তুব। হযতো তাই। বাঘেব বেলায় মযনা যেন দেবগুরু বৃহস্পতিব মতই বিজ্ঞ। বনেব কাদায় বা মাটিতে একপলকেব একটু দেখায গড়গড় কবে মুখস্থ বলে যাবে ময়না সহস্র খুঁটিনাটি। পায়েব ছাপ যে বেখে গেছে সে বাঘ না বাঘিনী, বয়সে সে কচি না বুড়ো। চলন তাব ভাবী না হালকা, সে শান্ত না দুর্দান্ত, কোন পাযে সে আহত, না দস্তুবমত অক্ষত। সে নওজোয়ান শক্তিধব না বদমেজাজী এক ববব—তাও জানে ময়না। কুঁড়ের বাদশা সেই বাঘ—ভাবিক্কি দেহ কিংবা লম্বাটে গড়নেব, চটপটে স্বভাবেব—তাও।

ময়নাকে তাই না ডাকলেই নয। নইলে এতটুকু ইচ্ছে ছিলনা আমাব।

রাহুগ্রস্ত সূর্যেব মত ময়না শিকাবীব আড়ালেই রয়ে গেলুম আমি। অথচ এব আগে দু'দুবাব—

থাক সে কথা এখন। এতগুলো মানুষেব যেন চোখ নেই। জলজ্যান্ত ঐ পায়ের ছাপগুলোকেও ওরা আমল দিতে চায়না কেউ।

বনের বাঘ নদী পেরিয়ে প্রায়ই আসে এপারে। কিন্তু সে তো শুধু নরমাংসের লোভে। মনুষ্য মাংসের অভাবে গো মাংস ভক্ষণেও সে গররাজী নয়। সুন্দরবনের মহামহিম মহারাজ, একটা কুকুরীকে মুখে তুলে নিয়ে যাবে! ছিঃ—এহেন অ-রাজজনোচিত কাজ ওরা কল্পনা করতেও পারে না। পায়ের ছাপ স্পষ্ট নয়। আর রক্তপাত তো অন্য কারণেও ঘটতে পারে। হয়তো নদী থেকে এসেছে কোন্ কুমীর। চারপায়ে হেঁটে আসে সে চুপিসাড়ে। কুকুরীকে টেনে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়।

বিচিত্র নয় ঠিকই। কিন্তু মেঠো কুকুরের দল তাহলে ধানের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে অমন করে চেঁচিয়ে মরতো না। ওদের কেউ কেউ আলের ওপর ছুটে গিয়েছিল কিছুটা দূর পর্যন্ত। রক্তের দাগও হারিয়ে গেছে ঐ আলের মুখেই।

আর রয়াল বেঙ্গল মহারাজ নদী পেরিয়ে এপারে আসেন নিছক নরমাংসের লোভে—বিশ্বাস করিনা আমি অমন একটা আজগুবি কথা। নরমাংসের প্রতি এতখানি লোভ থাকলে বনের মৌ চোর কি কাঠুরেদের কেউ আর ফিরে আসতো না ঘরে।

বনের একটা বিশাল এলাকা জুড়ে আমিও তো চৌহদ্দী করে বেড়াচ্ছি আজ বহু বছর ধরে। বাঘের পাল্লায় একেবারেই পড়িনি এমনটিও তো নয়। বন্দুকধারী শিকারীকে ওরা সমীহ করে চলে—তা তো চলারই কথা। কিন্তু আমি তো দেখেছি অনেক দিনের আরো অনেক ঘটনা। দ্বিপদীকেই ওরা ভয় করে মনে মনে—এইটেই বোধ করি আরো বেশী সত্যি।

কুকুরীর মাংসের প্রতি ওদের পক্ষপাতিত্ব হয়তো নেই। তবে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! চাপাটির প্রতি আসক্তি আমার কস্মিন কালেও কেউ দেখেনি। আর পেটেও যে সয়না তাও তো দেখলুম। খাদ্যমন্ত্রীর মূল্যবান উপদেশ বাণী কোনদিনও আমার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেনি। অথচ পেটের জ্বালা জুড়োতে চাপাটি উদরস্থ

করেছি দিনের পর দিন—এক জ্বালার বদলে জেনে শুনেই ডেকে এনেছি একরাশ জ্বালা।

কুকুরীকে যিনি মুখে তুলে নিয়ে গেছেন তিনিও ওই রয়াল বেঙ্গল বংশীয় কোন মহামহিম কেউ। বয়সে বুড়ো আর বার্ধক্যে পঙ্গু কোন রাজপুরুষের পক্ষে এহেন কাপুরুষোচিত আচরণ অবিশ্যি অসম্ভব নয়।

তবে আমার ধারণা এক্ষেত্রে সে বাঘিনী মা।

বাঘের চাইতে বাঘিনী অনেক বেশী ভয়ঙ্করী। তবে সন্তানের কল্যাণের জন্য সে অতিমাত্রায় সাবধানী। তার এই অতিসাবধানতার দিনগুলিতে সে মানুষের মুখোমুখি হতে নিতান্ত নারাজ। এমনকি শৃঙ্গী বা দন্তীদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়না সে। ছোকরা শূকরকে এড়িয়ে বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে এও আমি দেখেছি।

কিন্তু কার কথা কে শোনে। অতএব আসুক সেই ময়না শিকারী।

রূপোকে দিলুম শ'খানেক লোক জোগাড়ের দায়। সকালেই আমি ঘেরাও করবো অদূরের ঐ খণ্ড জঙ্গল। আমার বিশ্বাস বাঘিনী আস্তানা নিয়েছে ওরই কোন একটিতে। সম্ভবতঃ, কাল তাকে দেখেই অমন করে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছিল বাঘা।

হুকুম শুনে রূপো বরকন্দাজ আমতা আমতা করে। নায়েব মশায় বিপন্ন বোধ করেন। রাত পোহালেই বাবা আসছেন কাছারি পরিদর্শনে। একটি দিন মাত্র কাটিয়ে যাবেন এই কাছারিতে। প্রজাদের অভাব অভিযোগ, হিসাব নিকাশ, দেনাপাওনা বা আর্জি আদালতের জন্যে কয়েক ঘণ্টা সময় মোটে। এই মূল্যবান দিনটিকে হারাতে চাইবেনা কেউ খোকাবাবুর খেয়ালে।

খেয়াল!

খেয়াল বৈকি। কোথায় বাঘ! কেউ এখনও দেখেনি তাকে।

একটা গরুও খোয়া যায়নি কারো—মানুষ তো দূরের কথা। বনের বাঘের ডাক শুনছি দিনে রাতে। আর কাছারির এলাকা থেকে শিকার ধরে নিয়ে যাচ্ছে রোজই, অথচ একটি হাঁক ডাক শোনা যায়না তার!

ওদেরকে বোঝাতে পারিনা কিছুতেই—বৃথা চেষ্টা। তখন তো অতশত বুঝতে শিখিনি যে এরা জাতেই ভোলানাথ। দুচারটে মানুষের জান খতম না হওয়া অবধি ওদের মাথার টনক নড়েনা। ভোলানাথের মতই ওরা কণ্ঠে ধারণ করে ওদের পাপের হলাহল। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের দাঁতে বোধ হয় সমুদ্র মন্থনের চাইতেও অনেক বেশি বিষ আছে। তাই শেষ পর্যন্ত সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করা সম্ভব হয় না। বিষের জ্বালায় ওরা জমিদারের সদর কাছারিতে এসে ধর্না দেয়; পীরের কাছে সিরণী মানত করে; দরগায় বকরী জবাই দেয়, কালীবাড়িতে ঢিল বাঁধে, দেবতা দক্ষিণ রায়ের ভেট চড়ায় আর বনবিবির পালা গায়।

তারপর কোন এক শিকারীর হাতে শত্রু মারা পড়লে ওরা সেই শিকারীকে ভোজ দেয়, নজরাণাও দেয় কখনো।

বাবা আসেন বজরায়। দুপুরের আগে বজরা এসে পৌছাবে না ঘাটে। বিপন্ন নায়েব মশায়কে তাই বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলুম এই বলে যে দুপুরের আগেই আবার ফিরে আসবো আমি।

বেলা এদিকে বেড়েই চলেছে। ময়নার পাত্তা আনেনি সনাতন পেয়াদা। না আসুক ময়না। বুড়ো বিশুকে সঙ্গে নিয়ে লোকজন জুটিয়ে আমিই যাব একা।

কিন্তু লোকজনও তো যথেষ্ট পরিমাণে জোগাড় করতে পারেনি রূপো। মোটে পনেরো বিশজন জোয়ানকে হাজির হতে দেখলুম এতক্ষণে।

অস্থিরচিত্তে পায়চারি করি আর বারবার সেই অস্পষ্ট পায়ের ছাপ কটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করি কিংবা আলের উপর রক্তের দাগ

দেখে পথের সন্ধান করি। এবারেও দেখছিলুম সেই রক্তের নিশানা। হঠাৎ মেঠো কুকুরের পাল কলরব করে ওঠাতে পিছনে তাকাই তক্ষুনি।

একদল ঘোড় সওয়ার। তাদের পুরোভাগে রয়েছেন বাবা নিজে। দুই পাশে দুই শিকারী—তাজু মিঞা আর হাসান, পিছনে সনাতন পেয়াদা ও আর আর ঘোড় সওয়ার। ময়না আসেনি সঙ্গে।

তাজু মিঞা আর হাসান পরীক্ষা করে দেখে পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ। 'বড় শিয়ালের ছিচরণ এ কখখনো নয় হুজুর'—বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ে হাসান শিকারী।

তাজু মিঞা বলে, 'মেঠো কুকুরে কি মন পড়ে বড় শেয়ালের। মানুষ কি গাই বাছুর হলি না হয় কথা ছিল'।

প্রজারা এসে জড়ো হয়েছে ততক্ষণে। ওরা বিবরণ জানায় বাবাকে। পোদ্দারদের হাঁস মুরগী আর ছাগলছানাও চুরি গেছে কটি মাস দুয়েকের মধ্যে। বিশ্বাস বাড়ীর দু দুটো বকনা বাছুর, দ্বিজবর মোড়লের এক পাল বাজহাঁস আর আমীর সেখের এক গণ্ডা বকরীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা। খোয়া গেছে অন্ততঃ আধকুড়ি মেঠো কুকুর।

তাজু মিঞার সন্দেহ হয়না তবু। বরং দিব্যি সে বলে বসলো তার সিদ্ধান্তের কথা। রাজার জাত ঐ বড় শেয়াল, পাতি শেয়ালের মত ছিঁচকে চুরির দায় রাজা মহারাজার ঘাড়ে চাপানো চলে কি?

তাজুর কথায় রাগ হল আমার। বাবা কিন্তু তাঁর স্বভাব-গম্ভীর মুখভাব বজায় রাখতে না পেরে হাসিতে ফেটে পড়েন। বনের রাজা বাঘ। সবাই তাকে মহারাজা বলে মানে। ছিঁচকে চুরির দায়ে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে ওরা নারাজ।

জিনের গায়ে আঁটা চামড়ার পেটি থেকে বাবা ওঁর নিজের দোনলা বন্দুকটি তুলে দেন আমার হাতে।

'চার দিয়ে আরও দুচারটে দিন দেখলেই ভালো হতো। কিন্তু

লোকজন জোগাড় করে তৈরী হয়েছ যখন তখন যাও। দায়ে পড়ে চুরি হয়তো করেছে সে। তা বলে চোর সে সত্যি নয়, সে সত্যিই মহারাজ। কথাটা মনে রেখে কাজ করো কিন্তু'—মনে করিয়ে দেন বাবা।

একটানা দিগন্ত প্রসারী ধানের ক্ষেতের মধ্যে এক এক টুকরো জঙ্গল—মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস যেন, কিংবা হলুদ রঙের দৃশ্যপটে যেন সবুজের ছিটেফোঁটা।

কাল সন্ধ্যেবেলায় যেখানে সেই শিকার হারিয়েছিলুম এগিয়ে এলুম সেই পথ ধরে। চুপিসাড়ে এসে ঘেরাও করলুম খালের পারের একফালি জঙ্গলকে।

নিবেট—গেঁয়ো আর গরাণ গাছগুলো যেন ঠাসাঠাসি করে সূর্যের আলোকে রুখে দিচ্ছে।

ঐটুকু এক জঙ্গল, অথচ কি ভয়ঙ্কর ওর চেহারা। চারপাশে ছড়িয়ে আছে একরাশ হাড়গোড় আর অগুণতি কঙ্কাল। গাছের আগডালে বসে রোদ পোহাচ্ছে কটি শকুনি। গাছের ডালে কিন্তু বানর নেই একটিও, না একটি বাবুইয়ের বাসা। মিশকালো কটি দাঁড়কাক হঠাৎ কা-কা করে কি এক অলক্ষুণে ইঙ্গিত জানালে। নইলে গোটা পরিবেশ জুড়ে ভারী হয়ে চেপে বসে আছে শুধু শ্মশান পুরীর নিস্তব্ধতা।

বাঘার মুখেও একটা 'ঘউ' শব্দ নেই। যতবার ওকে জঙ্গলের দিকে ঠেলে দিই সে অমনি তার প্রতিবাদ জানায় গোঁ গোঁ শব্দ করে। দুপা এগোয় তো দশ পা পিছিয়ে আসে লেজ গুটিয়ে। কাল সন্ধ্যেবেলাতেও সে ঠিক এমনি ভঙ্গী করেই ফিরে এসেছিল। আজও সে স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছে, হুঁসিয়ার, জেনো ভয় ওখানে ভয়ঙ্কর।

দূরে দূরে আরও কটি জঙ্গল। তাড়া খেয়ে সব চাইতে নিকটের কোন জঙ্গলে পালিয়ে যেতে চাইবে বাঘিনী। অতএব অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে জাল গুটিয়ে আনতে হবে তিন দিক থেকে। ব্যূহমুখ

খোলা রেখে ঘাঁটি আগলে থাকবো আমি। জায়গা বাছাই করে গাছে চড়ে বসলুম তাই।

হাসানকে সঙ্কেত করতেই তিনদিক থেকে বেজে উঠলো অমনি ঝাঁঝ, করতাল আর ভাঙা টিনের খ্যান্ খ্যান্ আওয়াজ।

ওরা জাল গুটিয়ে আনছে।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা দুলছে। এই বুঝি এলো সেই সময়। এই বুঝি—। চারদিক থেকে ঘেরাও করা বরং বেশী বিপজ্জনক। কোণঠাসা হলে বাঘ হয়ে ওঠে বড় ভয়ঙ্কর। মরীয়া হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যূহের সব চাইতে দুর্বল স্থানে। আর কাউকে না কাউকে জখম করে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় প্রায়ই। একবার সেই ভুলের মাশুল দিয়েছি আমি—বড় করুণ, বড়ই বেদনাদায়ক সেই ভুল।

তাজু আর হাসান প্রায় পঞ্চাশ জন জোয়ানের সাহায্যে বাঘিনীকে তাড়িয়ে আনছে আমার বন্দুকের ডগায়। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে বসে আছি আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু মেলে।

লম্বা শীষওয়ালা ধানের ক্ষেতে কাঁপন লাগলো না? হ্যাঁ—তাইতো। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখি—ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে। চতুর চোর গুঁড়ি মেরে পালিয়ে যাচ্ছে যে আমার চোখে ধূলো দিয়ে।

আর এক পলকের সন্ধানী দৃষ্টি—এক মুহূর্তের বিচার বিশ্লেষণ মাত্র।

'হুড়ুম'—আমার বন্দুকের একটি গর্জন মাত্র প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো তক্ষুণি মানুষের কাতর কণ্ঠের আর্তনাদে। তীরের মত কানে এসে বিঁধলো কটি কথা, 'আল্লা-জান খতম'। কানে নয় শুধু—কথা শব্দভেদী বাণ হয়ে বুঝি বিঁধলো এসে বুকে। খুনীর তল্লাসীতে এসে শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ মানুষের লাল তাজা খুনে হাত রাঙিয়ে আমিই হলুম খুনী।

যন্ত্র চালিতের মত গাছ থেকে নেমে ছুটে গেলুম ওর দিকে। লোকটি তখনও পালাবার চেষ্টা করছিল।

হাসান ওর কাঁধের উপর এক ঘা বসিয়ে দিল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে। তারপর ওরা টেনে নিয়ে এলো ওকে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আমারই পায়ের তলায়।

'পায়ে একটু ছড় কেটে গেছে গুলিটা। ব্যাটার বুকে বিঁধতো যদি—'

লোকটা কটমট করে চাইতেই হাসান কথা থামিয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরে, 'নড়াচড়া করবি তো জ্যান্ত গোর দিয়ে যাব আজ তোকে।'

হাসানের উদ্যত বন্দুককে তাচ্ছিল্য করেই লোকটা এবার আমার দিকে চায়, 'হুজুর, আমি রহমান। আপনি চিনতি পারবেন না। কর্তা চেনেন।'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে হাসান, 'ব্যাটা খুনে ডাকাত হুজুর। ওপারের কাছারির নায়েব মশায়কে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল ঐ ব্যাটা। সেই থেকে ফেরার। অনেক খুঁজিছি আমরা ওকে। হুজুর হুকুম দিন। পিঠমোড়া করে বাঁধি ব্যাটাকে। হাতের কাছে লাঠি-সড়কি পেলি বন্দুকেও ওরে সামাল দেওয়া দায়।'

'না, হুজুর, আপনার গায়ে হাত ওঠাই এমন সাধ্যি নেই আমার। ওস্তাদ তাহলি'—

লোকটা পায়ের ব্যাথায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

ছিমছাম চেহারা, মুখে ছুঁচলো দাড়ি আর চোখ দুটো ওর অস্বাভাবিক লাল। পায়ের মাংসপেশী ভেদ করে চলে গেছে গুলিটা। হাত দিয়ে চেপে রেখেছে রহমান তার ক্ষতস্থান। তবু রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার আঙুলের ফাঁক থেকে।

ক্ষত চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগ করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলুম। টিফিন ক্যারিয়ারে ছিল কিছু হালুয়া আর সন্দেশ। রহমান

সেগুলো একগালেই খেয়ে নিল। এক ফ্লাস্ক চাও ঢক ঢক করে আলগোছে খেয়ে ফেললে সে।

সুস্থ হয়ে রহমান এবার সেলাম জানায় আমাকে, 'সেলাম, হুজুর, লাখ সেলাম।'

জিজ্ঞাসা করি রহমানকে এমন একটা ভীষণ জায়গায় কেন আস্তানা নিয়েছে সে। এ যে বাঘের বাসা।

রহমান হাসে, 'বাঘ নয় হুজুর, বাঘিনী। আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। মাস কয়েক আগে প্রথম যেদিন আলাম হেথায় সেদিন মোলাকাৎ হলো হঠাৎ। তখন ওর বাচ্চা হবে।'

'তারপর!'

'তারপর আমি ক'লাম, যা লক্ষ্মীটি, আর কোথাও যা তুই। আমিও তোর মত ফেরারী। সন্ধ্যে হলি আমি নিত্যি ঘরে যাব। ঘরে আমার বৌ ছেলেপুলে আছে। ঐ হোথা বড় কাছারির আধ মাইলটাকের মধ্যি আমার ঘর। ঐ তো আরও কডা ঝোপ ঝাড় রয়েছে। তুই যা না আর কোথাও। লক্ষ্মী মেয়ের মত ও চলে গেল।'

'কোথায় চলে গেল?'

'কি জানি হুজুর। ঐ হোথাকার কোন গেঁয়োব বনে হবে হয়তো।'

'তারপর?'

'তারপর পরের দিন আবার এসে হাজির। আমি তখন চাল ফোটাচ্ছি। বেটি এসেই কয়, 'হালুম'। বুঝতি পারলাম বেটির ক্ষিধে পেয়েছে খুব। দুটো মুরগী ছাড়িয়ে রেখিছিলাম ভাতের সঙ্গে টাকনা দেবো বলে। তারই একটা ছুঁড়ে দিতি হলো শেষ পর্যন্ত। নইলে নাছোড়বান্দা হয়ে বসে রইল। নড়তি চায় না। রাগ হলো। ক'লাম, 'এই নিয়ে দূর হ' লক্ষ্মীছাড়া। নিজির পেট চালাতি পারিনে তা তোর পেটের জোগান দিই কোত্থেকে। আরদিন আসলি এই বর্শা দিয়ে তোর পেটটাই আমি ফেড়ে দেবো।'

'তারপর ?"

'অনেক দিন আব আসেনি সেই হতি। সেদিন দেখি তিন তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে বেটি জল খাচ্ছে খালেব ওপাবে। ভাবী ভাল লাগলো। হেঁকে কই আমি, 'আয বেটি, মুবগী নিয়ে যা'। আমীব সেখেব উঠোন থেকে একগণ্ডা মুবগী ধবে নিয়ে এসেছিলাম শেষ বাত্তিবি এখানে আসাব পথে। হাঁক শুনেই দেখি বেটি হাজিব। সব কডা মুবগী ওবে দিয়ে দেলাম। চাব মাযে পোযে খাবে তো।'

অবাক হয়ে শুনছিলুম এতক্ষণ বহমানেব গল্প। জিজ্ঞাসা কবলুম, 'সত্যি বলছো বহমান ?'

বহমানেব বাগ হয। 'আমি দাগী আসামী হুজুব। খুন জখম কবি, ডাকাতি কবি সত্যি। কিন্তু মিথ্যে তো বলিনে কখনো। হুজুব মা বাপ। আমাবে মেবে গোব দিয়ে যান এই গাছতলায। আমি বা[illegible] কবো না। হুজুবেব কাছে আমাব আর্জি শুধু এইডে যে হুজুব আমাবে পুলিশে দেবেন না। বাগে পেযে ঐ তালপাতাব সেপাইগুলো তম্বি কববে এডা আমি ববদাস্ত কবতি পাবিনে হুজুব। হুজুবেব আব সব হুকম আমি জান দিয়েও মান্যি কববো। আল্লাব কসম! জবান দিচ্ছি হুজুব। আমাবে বাঁধতি হবে না।'

'তোমাকে বাঁধবো না বহমান। আল্লেব পথটুকু পেবিয়ে ভেড়িব নিচে আমাদেব ঘোডা বাঁধা আছে। সনাতন পেয়াদা আছে ওখানে। সনাতনেব কাছ থেকে ঘোডা চেয়ে নিও আমাব নাম কবে। কাছাবিতে কর্তা এসেছেন আজ। কাছাবিতে যেয়ে কর্তাকে সেলাম জানিযে বলবে খোকাবাবু পাঠিয়েছেন তোমাকে।'

বহমান তাব লাঠিতে ভব দিযে উঠে দাঁড়ায়। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ঐ হোথায গাছেব তলে আছে আমাব দশটা সড়কি আব দুটো বর্শা। হুজুবকে আমি দিয়ে দেলাম ওগুলো।'

বহমান লাঠিতে ভব দিয়ে এগিযে যায়।

লোকটা খুনী ডাকাত। কালী কপালীর সাকরেদ ছিল সে। কালীকে ডাকাত থেকে সংসারী সাজিয়েছেন বাবা। রহমানকেও সাধু সংসারী সাজিয়ে নিতে জানেন তিনি। যাক সে কথা।

বাঘিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এখন আর লেশমাত্র সংশয় নেই কারো মনে। রাতের বেলায় সে রোজই হানা দিচ্ছে কাছারির এলাকায়।

মেঠো কুকুরের পর হাঁস মুরগী ছেড়ে বাছুর যজ্ঞ শুরু হয়েছে সবে। পর্যায়ক্রমে আসবে গরু-মোষ আর মানুষের পালা।

দলবল নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করবো কিনা তাই ভাবছি, এমন সময় হাজির হলো ময়না।

ময়না বলে, 'এটা দিনের কাজ নয়। ফিরে চলো দাদাবাবু। রাতের আঁধারে বাঘিনীর বুদ্ধিকে হারাতে পার কিনা তারই পরীক্ষা আজ তোমার।'

॥ দুই ॥

মিথ্যে বলেনি ময়না—দিনের কাজ ওটি নয়। শত চেষ্টাতেও বাঘিনীকে দিনের বেলায় খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না তখন।

পরে বুঝেছি মানুষের বুদ্ধির তুলনায় মোটেও কমতি যায়না বাঘিনী। তাছাড়া অনেক বেশী হুঁসিয়ার—অনেক বেশী চুপিসাড়ে মানুষের উপর খবরদাবী কবে চলতে পারে সে।

মাঠজোড়া ধানেব ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে আশ্রয় নেওয়া খুবই সহজ তার পক্ষে। অথচ ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলা মানুষের সাধ্যে কুলোয় কই।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে এলো। বাবার সুমুখে অহঙ্কার করে বলেছি, ময়নাকে কিছু দবকার হবেনা আমাব। হাত গুটিয়ে বসে থাক সে।

ময়না শুধু মুচকি হাসে আব অলক্ষ্যে বসে মুখ টিপে হাসেন বুঝি আর একজন।

যাক্, আয়োজন আমার সম্পূর্ণ।

ভেড়িব পথের বাঁকে কাছারির মুখে খোঁটায় বাঁধা হয়েছে ছোকবা গোছেব একটা মোষকে। ত্রিশ গজ আন্দাজ দূরে ভেড়ির পাশের এক কেওড়া গাছে মাচান বাঁধা হয়েছে হাসা'র জন্যে।

কাছাবির পেছন দিকে মস্ত বড় পুকুর। পুকুরের ওপারে এক তেঁতুল গাছ। দৈত্যের মত দেহ তার, মাথায় ধরা রয়েছে যেন শিব ঠাকুরের ছাতা। এই তেঁতুল গাছের তল দিয়েই পোদ্দার বাড়ীতে ঢুকবার পথ—ধানের ক্ষেত থেকে গাঁয়ের সদর পথ। তাজু মিঞা ওৎ পেতে থাকবে এই তেঁতুল গাছে পোদ্দার বাড়ীর সদর দবজা পাহারা দিয়ে। ফটক আজ খোলা থাকবে রাতে। বারান্দার খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে একটি বাছুরকে—বাঘিনীর চার।

মেঠো কুকুরদের নিয়ে মুস্কিল হলো বড় কম নয়। ওরা কাছারির উঠোন ছেড়ে নড়তে চায়না কিছুতে। কাছারির দরজা খোলা রেখে ওদেরকেই চার করা যাক না কেন।

কাছারির পশ্চিমে এক প্রাচীন বট। দীর্ঘ তার জটা, বহুদূর বিস্তৃত তার ছায়া। ওরই নিচে থেকে শুরু হয়েছে দিগন্ত জোড়া ধানের ক্ষেত। অদূরেই সারি বন্দী ঝোপ-ঝাড়, কেওড়ার ঘন জঙ্গল। বাঘিনীর নিশীথ অভিসারের পক্ষে বেশ পছন্দসই। রহমানকে সঙ্গে নিয়ে এই বটের ডালে মাচান বেঁধে বসে থাকবো আমি।

ময়না আপত্তি করে ওঠে হঠাৎ, 'কখ্খনো তা হতে দেবো না আমি। সেয়ানা হয়েছো। তাই খোকাবাবু না বলে দাদাবাবু কই তোমারে। তা বলে ঐ রহমানের সঙ্গে রাত কাটাবে মাচানে বসে এমনতরো সেয়ানা হওনি এখনও।'

স্থির হলো ময়নাই থাকবে আমার সঙ্গে। তবে এই অভিযানের নেতা আমি, ময়না নয়।

হাসিমুখেই ময়না মেনে নিলে সেই কথা। 'লক্ষণ ভাইয়ের মত মুখ বুজে মেনে নেবো আমি রামদাদার হুকুম। বাপজান সাক্ষী রইল—' ময়না শিকারী হাসিতে ফেটে পড়ে।

দীর্ঘ অলস রাত্রি। ঝাঁকড়া মাথা বটের ডালে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে একপাওয়ালা হাজার বক। পূর্ণিমার জোৎস্না রাতে ওদের সাদা রঙ যেন সোনার আলোয় জ্বলছে। কাকেরাও ঘুমুচ্ছে। আমারও ঘুম পাচ্ছে। ঘুম পায়না শুধু ময়না শিকারীর। লক্ষণের চাইতেও দুর্ভেদ্য ওর প্রহরা।

কাককুল হঠাৎ এক এক সময় কলকণ্ঠে কলরব করে ওঠে—'কা-কা-কা।' চমকে উঠি। ভাল করে চেয়ে দেখি চারিদিকে। না—কিছুই না।

মাঝরাতে মেঠো কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ শব্দে পাড়া মাতিয়ে তোলে। ওরা হুটোপুটি করে, ছুটোছুটি করে বেড়ায় সেই ছোট্ট

গাঁ খানি জুড়ে। আমাবও অমনি কবে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়ি।

মেঠো কুকুবেব দল শান্ত হয়েছে ততক্ষণে। ওদেব ছুটোছুটি নেই—একটা একটানা ডাকও শোনা যাচ্ছে না আব। দ্বিধা আসে, জাগে সংশয়। তবে কি বাঘিনী গা ঢাকা দিলে আবাব! অথবা সে গাঁয়েব মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন কবেছে! না—সম্ভবতঃ সে শিকাব তুলে নিয়ে সবে পড়েছে।

কিছুই স্থিব কবতে না পেবে অভ্যাসবশে ময়নাব দিকে তাকাই। ময়না অমনি মাথা নিচু কবে বিনীত ভঙ্গীতে বলে, 'হুকুম কব দাদা।' বাগ হতো হয়তো। কিন্তু ময়নাব বলাব ভঙ্গীতে হেসে ফেললুম।

ওই মেঠো কুকুবেবা সব খবব জানে। কাছাবিব উঠোনে যেয়ে আবাব জড়ো হয়েছে ওবা। অতএব কাছাবিব পথে পা বাড়ালুম। কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গুজে দিব্যি ঘুমুচ্ছে ওবা। আমাব শব্দ পেয়ে কেউ কেউ একবাব ছোট একটা ঘউ শব্দ কবলে মাত্র।

বুঝলুম, ভুল কবেছি।

তাড়াতাড়ি ফিবে যেতে হবে আবাব নিজেব জায়গাটিতে। একটি বকবী আব একজোড়া মুবগীকে চাব কবেছি আমি

গাঁয়ে ঢুকবাব তিন তিনটে সদব পথই আগলে আছি আমবা—হাসান, তাজু মিঞা আব আমি। কিন্তু সদব ছেড়ে খিড়কিব পথে আসে যদি সে! গাঁয়েব সীমানা ববাবব টহল দিয়েই আসিনা কেন এই ফাঁকে।

কথাটা ময়নাকে বলতেই কোমব বাকিয়ে কুর্ণিস কবে ময়না। 'যো হুকুম দাদাভাই। কিন্তু সীমানা ববাবব পথ কই যে টহল দেবে চৌকীদাবেব মত?'—জিজ্ঞেস কবে ময়না।

বুড়ো বটেব তলে ফিবে এলুম আবাব। জোৎস্না রাত—আকাশেব আলো পৃথিবীব বুকে উজাড় কবে ঢেলে দিয়েছে ঐ চাঁদ

আর তারা। অনেক দূর অবধি দেখা যায়। কিন্তু সেই যে সাদা কালো রঙের বুড়ী বকরীকে আমি খোঁটায় বেঁধে রেখেছিলুম— আমার সেই চার? মুরগী জোড়া তো তেমনি বাঁধা আছে খুঁটিতে!

পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বালিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখি সব। রক্তের দাগ—ধূলোর উপর দিয়ে শিকারকে টেনে নিয়ে যাবার দাগও। কিন্তু শক্ত মাটির উপর পায়ের ছাপ পড়েনি কোথাও। না পড়ুক। বাঘিনী আমার টোপ গিলেছে ভেবে মনটা ভারী খুশি হল। ময়নাকে জিজ্ঞেস করলুম রক্তের দাগ ধরে বাঘিনীর যাতা-য়াতের পথ সে হদিশ করতে পারে কিনা। না—ময়না কোন উৎসাহ বোধ করেনা। বরং নির্বিকার তাচ্ছিল্যের ভাব তার মুখে।

'রাতের কিছুটা বাকী আছে এখনও। চল, ঘুমুতি চল। কাল সকালে আবার দেখা যাবে।'—বললে ময়না শিকারী।

রাগ হয় আমার—খুব রাগ হয়। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবোনা আর কাল থেকে। রাগের মাথায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলুম। ঘুমুতে যাওয়া ছাড়া উপায় আছে কি! এই রাত্রে বাঘিনীব পেছু ধাওয়া করা সম্ভব নয়, আর যুক্তিযুক্তও নয়।

কাছারির পথে পা বাড়াতেই কিন্তু ফিরে দাঁড়ায় ময়না।

'রহমানের বাড়ীটা একবার ঘুরে যেতে হবে। দরকার আছে দাদাভাই।'

অবাক হয়ে গেলুম। ময়নার দরকার আছে রহমানের কাছে— এই রাতদুপুরে!

রহমানের বাড়ীর আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে ময়না। অনেক হাঁকডাকের পর শোনা গেল যে রহমান বাড়ীতে নেই। জমিদারের হুকুমে কাছারিতে পাহারায় আছে সে।

ময়নার মনের ভাব বুঝতে পারি এবার। বাঘিনীর পেটে যায়নি বকরী। আমার চারের বকরী ঐ রহমানই করেছে চুরি—এমনি ওর বিশ্বাস।

কাছারিতে ফিরে এসে দেখলুম, সত্যিই রাত জেগে পাহারায় আছে রহমান্।

'খবর কি দাদাবাবু—ভোরেব আগেই মাচান• ছেড়ে আইলে যে? এই কিছুক্ষণ আগেও যখন আসছিলে তখন ভাবলাম যে বাঘের তালাস করত্তিচ। তাই হাঁকটা পর্যন্ত দিত্তি পারলাম না।'—রহমান বেশ সহজ সবলভাবেই বললে কথাগুলো।

ময়না গর্জন করে ওঠে ওব কথায়, 'ন্যাকামি রাখ মিঞা। কাল থেকে আমাদের সঙ্গে তোকেও নিয়ে যাব।'

'আমি যাব বাঘ মারতি!' হা হা করে হাসে রহমান। 'মানষির জান নিত্তি পারি আমি। তা বলে বাঘের হাতে বেঘোরে প্রাণডা দিত্তি কও ক্যামনে। ও কাজডা আমারে কয়োনা দাদাবাবু।'

'কিন্তু বাঘিনীকে তোর যে ভয় নেই তা তো আগেই বলেছিস'—আমি জেরা করি।

'এই দ্যাখ, তুমি আবার আদালতের জজ সাহেবদের মত কথা কও যে। সেডা তো বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এ্যাদ্দিনে সে বনে চলে গেছে কবে। সেডা এ্যাদ্দিন থাকলি আমি তার কানডা ধবে টানত্তি টানত্তি কাছাবিত্তি নিয়ে আসতাম না।'

'পারিস তার কান ধরে টেনে আনত্তি?'—জিজ্ঞেস করে ময়না।

'কেন পারবনা—খুব পারি। তবে তোর হুকুমে রহমান সানার এই কড়ে আঙুলডাও নড়তি চায়না।'

ওদের কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিতে হলো।

একজনের হাতে বন্দুক আর একজনের হাতে ধরা এক ক্ষুরধার বর্শা। আর শস্ত্রপাণিকে বিশ্বাস না কবাটাই শাস্ত্র সম্মত। আমি নিজেও বোধকরি এর ব্যতিক্রম নই—অন্য পরে কা কথা।

কাকেরা বাসা ছেড়েছে। হাসান আর তাজু মিঞাও ছেড়ে এলো ওদের রাতের বাসা। না—কোথাও কিছু ঘটেনি।

তিনজনে মিলে আমরা খুঁটিয়ে দেখলুম আবার। তাজু আর

হাসান রায় দিলে যে আমাদেব অনুপস্থিতির সুযোগে বকবীকে বাঘেই নিয়ে গেছে। কিছুটা পথ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবাব পবেই সে শিকারকে মুখে তুলে নিয়ে গেছে।

বটগাছের নিচেই ধানক্ষেতেব আলপথগুলো পবীক্ষা কবে দেখা হলো। রক্তেব দাগ হাবিয়ে গেছে।

ময়না কিন্তু মানতে চায়না সেকথা। ছোট শিকাবকে সে মুখে তুলে নিয়ে যায় প্রথমটা। না পেবে উঠলে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে পাশাপাশি হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় কিছুটা।

চুপি চুপি ময়না বাবাকেই বলছিল কথাগুলো। বাবাও সায় দিলেন ওব কথায়।

বাঘিনী হয়তো চুপিসাড়ে ওৎ পেতেছিল কোথাও আমাদেব উপব নজব বেখে। মাচান থেকে নেমে আমাদেব চলে যাওযাটা সে আগ্রহভবে লক্ষ্য কবেছে। আব এই সুযোগেব সদ্ব্যবহাব কবতে সে ছাড়েনি।

'সব কথাই তোমাব সত্যি হতে পাবতো যদি সে বকবীব ঘাড় কামড়ে ধবে সোজা মুখে তুলে নিযে সবে পড়তো কোন আলপথ বেয়ে। বাঘিনীব পক্ষে একটা বকবীকে মুখে তুলে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। বন্দুক বয়ে বেড়াতে তোমাব যেটুকু কষ্ট হয তাব বেশি কষ্ট হবেনা ওব।'

মনে পড়লো কুকুবীমাকেও তো হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়নি সে মাটিব উপব দিয়ে। ময়না মনে কবিয়ে দেয় অনেক দিনেব আবো অনেক ঘটনাব কথা।

সন্দেহ দোলায় দুলতে থাকে মন। তবু আয়োজন চলেছে বিরামহীন।

পব প তিনটি বাত কাটে।

সকালবেলায় সেই একই খবর শুনি—ছাগল, বকবী, আব নয় মেঠো-কুকুর। এ গাঁয়ে, নয় ও গাঁয়ে।

পঞ্চম রাতে মাচানের স্থান বদলে নিয়েছি। তাজু আর হাসান বড় ফাঁপরে পড়েছে। মাচানে বসে ঘুম আসেনা, অথচ রাত জেগেও আর পেরে উঠছে না। ওরা বাঘিনীর অস্তিত্বে আজও বিশ্বাস করেনা। আমার খেয়ালে ওরা বিপন্ন বুঝি।

সপ্তাহকাল শেষ হয়ে গেল। আমিও ক্লান্ত। ময়না শিকারী প্রায় পক্ষকালের জন্যে কাজ নিয়েছে সরকারী কূপে। সেও চলে গেল।

রহমানকে জিজ্ঞেস করি চুপি চুপি, 'তোর সেই লক্ষ্মী মেয়েটারে একবার দেখাতে পারিস আমাকে? তোকে আমি বকশিশ দেবো—বিশ টাকা বকশিশ।'

'সেডা তো বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বনে চলে গেছে দাদাবাবু। প্রাণডার বাঁচাতি হবে তো। তা ছাড়া মার প্রাণডাতে বাচ্চার জন্যি সদাই ভয়। বন্দুক নিয়ে অত তাড়াহুড়ো করলি মানষির ভয় হয় তো বড় শেয়াল কোন ছার।'

অন্ধকার রাত এগিয়ে আসছে। সকালের কাছারিতে খবর নিয়ে এসেছে ফরমান সর্দার—একপাওয়ালা এক প্রজা। মাইল পাঁচেক দূরের এক গাঁয়ে আজু সেখের গরু মেরেছে বাঘে। রাত দুপুরে গরু বাছুরের চেঁচামেচি শুনে লণ্ঠন ধরে বেরিয়ে এসেছিল আজু সেখের জোয়ান আট ছেলে। ভয় পেয়ে বাড়া ভাত ফেলে রেখেই গা ঢাকা দিল বাঘ ভেড়ির পাশের কেওড়ার বনে।

আজু সেখের আট পুত্রের বিক্রমে সম্মুখ সমরে সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে বটে। তাবলে খালি হাতে সে ফেরেনি। কাছারির দিকে ফেরার পথে আর এক গেরস্তের গোয়ালে ঢুকে একটি এঁড়ে বাছুরকে চুরি করে নিয়ে গেছে বাঘ।

হাসান আর তাজুকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললুম তক্ষুণি। শিকারীর পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট। তবে পায়ের ছাপ পড়ে বুঝতে পারি না তখন—বাঘ না বাঘিনী সে, ভারী জাঁদরেল না হাল্কা চটপটে তার চেহারা।

বাঘ বা বাঘিনী যা-ই হোক, বাড়ীতে ঢুকবার সদর পথ ছেড়ে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে সে এসেছিল সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে। এক লাফে ভাগাড় পেরিয়ে গোয়ালের পিছন দিকে সে প্রথম হানা দেয়। সম্ভবতঃ এই সময় সে চাপা গর্জন করে তার উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে। ভীত গোবৎসগণের হুড়োহুড়ি করে ছুটে পালাবার চেষ্টায় গোয়ালের হাল্‌কা দরজা অচিরেই ভেঙে পড়ে আর ভয়ার্ত হাম্বা রবে পুচ্ছ উঁচিয়ে ছুটে বেড়ায় ওরা বাড়িময়।

ওস্তাদ শিকারী ওৎপেতে ছিল এই শুভক্ষণটির অপেক্ষায়। একটি বুড়ি গাইকে অল্পায়াসেই ধরাশায়ী করে সে। শিকারের ঘাড়ের উপর শক্ত কামড় বসিয়েছে শিকারী। ঘাড়ের গ্রন্থিসূত্র ছিঁড়ে ফেলে শিকারকে সে হত্যা করেছে তক্ষুণি। তারপর সদর পথ বেয়ে ভেড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার শিকারকে। এমন সময় আলো দেখে বা লোকজনের শব্দ শুনে সে গা ঢাকা দিয়েছে।

বাছুর খোয়া গেছে পাঁচু গোয়ালার। চাষাভূষো বিশ পঁচিশজন জড়ো হয়েছে ঘোষজার বাড়ীতে। আর ঘোষজা হাত পা নেড়ে বক্তৃতা করছে তাদেরই সুমুখে।

'বাঘ পড়েছে গাঁয়ে। অতএব গাঁ উৎসন্নে যাবে অচিরে। বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের দৃষ্টি পড়েছে যখন, তখন হালের গরু চাষের মোষ নির্বংশ হবে বছর না ঘুরতেই। তারপর গেরস্তের পালা,' ঘোষজা ঘোষণা করে বারে বারে তার চূড়ান্ত রায়।

সদলবলে ঘোষ বাড়িতে যেয়ে হাজির হতেই হাউমাউ করে কান্না শুরু করে ঘোষজা।

ঘোষ বাড়ির গোয়াল দেখে অবাক বনে গেলুম আমি। একটা শক্ত খুঁটি পর্যন্ত নেই, না একটা ভাল দরজা।

শিকারীর পায়ের ছাপ আরও সুস্পষ্ট ফুটেছে এখানে। সদর ছেড়ে খিড়কির পথেই আনাগোনা করেছে শিকারী।

কি জানি এবার যেন কেমন করে হঠাৎ আমার মনে এসে গেল একটি কথা।

যে এসেছিল সে বাঘ নয় বাঘিনী, মাঝারি বয়সের আর হালকা গড়নের বাঘিনী মা সে।

শক্তির অভাব নেই তার। তবু সে শিঙওয়ালা জানোয়ারের সাথে লড়াই এড়িয়ে চলেছে ইচ্ছে করে। চটপট শিকার ধরে নিয়ে সরে পড়াটাই তার লক্ষ্য।

তা ছাড়া বাচ্চাদের ছেড়ে বেশি দূরে যেতে সে রাজী নয়। ভারী জানোয়ারকে দূর পথে টেনে নিয়ে যাবার সুবিধে নেই বলে ছোট শিকারই তার পছন্দ।

আরও একটা কথা। মানুষকে সে ভয় করে এখনও। আজু সেখের বাড়ির কেউ দেখেনি তাকে। চেষ্টা করলে তার শিকারকে সে ভেড়ির ওপারে টেনে নিয়ে যেতে পারতো হয়তো।

হাঁস, মুরগী, ছাগল, মেঠো কুকুর—এবার চলেছে বাছুরের পালা।

কদিন পরেই শুরু হবে বুঝি গাই গরুর পালা।

তারপরে বলদ, মোষ, সবশেষে মানুষ।

ঠিকই ভেবেছিলুম আমি। তবে মানুষ পর্বে পৌছাতে আরও দুটো বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু সেকথা এখন নয়।

একমাস হতে চলেছে। ছুটি ফুরিয়ে আসছে। দিন নেই, রাত নেই দিন তিনটে মহল চৌহদ্দী করে বেড়াচ্ছি আমি। পাঁচ মাইলের একটা বৃত্তের মধ্যে বাঘিনীর শিকার সীমাবদ্ধ। আর রাতেই সে বার হয় মাত্র। দু একটা বড় গাই গরুকে ধরে নিয়ে গেছে বটে, তবে বাছুরের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

অন্ধকার পক্ষ চলেছে—অমাবস্যার আঁধার নেমেছে পৃথিবীর বুকে। নিকষ কালো আঁধার।

ময়নার অভাবে মনটাও কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। বড় দুঃখে পড়েই সেদিন বুঝেছি যে ময়না শিকারী আমাকে হিংসে করেনা। বরং নিতান্ত নির্বোধের মত আচরণ করেছি আমি। সূর্যের আলো চুরি করে চাঁদ বাহবা পায়, তার অন্ধকার অস্তিত্বকে আলোর জ্যোতি বলে জাহির করে। ময়নার জ্ঞানে আমি 'জ্ঞানী, ময়না শিকারীর জ্যোতিতে আমি জ্যোতিষ্মান।

শিকারী হওয়া সহজ নয়। আর ময়না শিকারীর সমান হতে চাই। সমস্ত অন্তর দিয়েই সেদিন ময়নার সান্নিধ্য কামনা করছিলুম।

ময়না এলোনা—হাজির হলো কালীকপালী ময়নার সংবাদ নিয়ে। ময়না আসছে পরশু দুপুরে।

বুকের নিভন্ত সাহস ফিরে আসে কালীকে দেখে। নতুন করে জেগে ওঠে দৃঢ়তা। মাচানে নয় আর, পায়ে হেঁটে বেরুব আজ কালীকে সঙ্গে নিয়ে। হাসান আর তাজু মিঞাকে বললুম গতকালের মতই মাচানে যেয়ে পাহারা দিতে। সন্ধ্যে রাতেই আহার সেরে নিয়ে ওরা চলে গেল।

রাত বারোটার আগে বাঘিনী তার আস্তানা ছেড়ে বেরোবে কিনা কি জানি!' কিন্তু মাঝরাত্রের পরেই শিকার ধরাটা তার অভ্যেস। বারোটা নাগাদ বেরুব স্থির করে কালীকে ওর খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে বললুম। কালী ঘাড় নাড়ে।

'তোমার সাথে আজ যাত্তি পারবো না বাজাভাই। উপোস আছি দিনভোর। মাঝরাতে পূজো দিতি যাব মার।'

অমাবস্যার এই রাতে কালীকপালী প্রতি বছরেই পূজো দেয় মাকালীর। পাঁঠা বলি দিয়ে প্রসাদী মাংস খায় সে শেষ রাতে। যশোরেশ্বরীর মন্দিরেও সে পূজো দিতে গেছিল কবার এই অমাবস্যায়।

জিদ ধরলুম কালীর সঙ্গে যাব বলে।

কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে আমাকে। আমার আবদার সে অপূর্ণ রাখবেনা জানি।

পুজো শেষ করতে সময় লাগে ওর এক ঘণ্টা। আর কালীতলা এখান থেকে মাইল তিনেকের মত দূর। অতএব আমাকে পাহারা দেবার জন্যে রূপোকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব করলে কালো। আমি কিন্তু রাজী নই মোটেও।

অমাবস্যার রাত। আকাশ আবার মেঘে আঁটা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল একটু আগে। এখন আর বৃষ্টি নেই, হাওয়া বইছে তার বদলে। লণ্ঠনের বাতি নিভে যাচ্ছে বারে বারে। টর্চে নতুন ব্যাটারী ভরে নিলুম, নতুন কার্তুজ ভরে নিলুম দোনলায়। কোমরের বেল্টে পরানো কার্তুজের উপর দিলুম ক্যানভাস কভার। পাতলা রেনকোটটাও পরে নিলুম। হাফ প্যাণ্টের বদলে ব্রীচ পরে মাথায় চাপালুম ওয়াটারপ্রুফ টুপি।

বারান্দায় কালো আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়েছে তার মুখের উপর। উঃ! কি নির্মম তার চেহারা। কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা, তার উপরে চন্দনে আঁকা কালী মূর্তি, চোখের উপর কাজলটানা, বুকের উপর এঁটে বাঁধা তার ঢাল, ডান হাতে বিশাল এক খাঁড়া, বাঁ হাতে তেমনি প্রকাণ্ড এক বর্শা আর পিঠে বাঁধা পাঁচ হাতি তার হরধনু, কাঁধে তীর ভরা তূণ। কালীকে অমনি অবস্থায় দুপুরে দেখলে স্বয়ং যমরাজেরও ভীতির উদ্রেক হতে পারে।

কিন্তু আমি সেদিন ভয় পাইনি। বরং রণরঙ্গে যেন মেতে উঠলো মন। বাঘিনীর সাথে বুঝি হাতাহাতি লড়তে পারি আমি।

মেঠো পথ বেয়ে চলেছি আমরা। আমার হাত ধরে রেখেছে কালো। অন্ধকার—দুঃসহ অন্ধকার। কালোকেই দেখতে পাচ্ছিনা। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক বিদ্যুতের আলোকে প্রাণপণে চেয়ে দেখছি চারদিকে।

দুপাশে ধানের ক্ষেত। ভেড়ির পথ বেয়ে চলেছি আমরা। ভয় করছে না তবু। কালী একদিন ডাকসাইটে ডাকাত সর্দার ছিল। এমনি করে পথ চলাটাই তার অভ্যেস।

কিন্তু আমি! আমার জীবনে এই তো প্রথম রাত্রি। ভয় করছে না তবু।

আলো জ্বালাতে নিষেধ করেছে কালী; কথা বলছে না সে একটিও। তবু আমার ভয় করছে না।

ভেড়ির নিচে সাপে ব্যাঙ ধরেছে।

একপাল শেয়াল ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো এই অবাঞ্ছিত অতিথি-দ্বয়ের আগমনে। 'হুক্কা হুয়া-হুয়া'-ওরা ভয় পেয়ে চেঁচায়।

এগিয়ে চলেছি আমরা।

নিকটের কোন তালগাছ থেকে শকুনিছানা মানুষী গলায় কাঁদছে। স্নায়ুগুলো একটুও সঙ্কুচিত হয়নি তাতে।

অবাক হয়ে ভাবছিলুম শুধু কালীর কথা। লোকটা কি দুরন্ত অমানুষী বুকের পাটা নিয়ে জন্মেছে। সে কি মানুষ না কালীর কোন শ্মশানচর!

যৌবনকে পিছনে ফেলে এসে আজ মনে হয় ঐ যৌবনটাই বড় সর্বনেশে এক রহস্য। যেখানে যত ভয় যৌবন বুঝি সেখানেই তত বেশি নির্ভয়। কি বেহিসেবী, কি দুরন্ত অবিমৃষ্যকারী সে।

তা হোক। বেহিসেবী বলেই সৃষ্টি করেছে সে স্মরণীয় শতদিন। আর সেই দিনগুলোই তো উত্তরকালের পরম সান্ত্বনা।

যৌবন বুঝি জীবনের নাটকীয়তাকে নিঃশেষে বিলিয়ে গেছে। স্বপ্নাতুর দুটি চোখের সীমাহীন স্বপ্নভাণ্ডারে যৌবন যেন পরশমণি। স্বপ্নকে সে রচনা করে; ভাঙে, গড়ে আবার রূপান্তরিত করে বাস্তবে।

বেহিসেবী সে—তা হোক। সে যে নীলকণ্ঠ মহাদেব। নৃত্যচঞ্চল নটরাজ সে সত্যি। এক পায়ের আঘাতে সে ভাঙে বটে, কিন্তু আর এক পায়ের তালে যে সে গড়ে চলেছে নিত্য নতুন সৃষ্টি।

আজকের আমি কি ডাকসাইটে এক ডাকাত সর্দারের সাথে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি! সে যে এক হাস্যকর অবিজ্ঞতা।

ঘণ্টাখানেক পথ চলার পরে অদূরের এক আলো এসে পড়লো চোখে। কালী ঐ আলোকেই লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে।

শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে আগুন করেছে কারা। হয়তো কোন চিতার শেষাগ্নি। আমরা এক শ্মশানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। অনেক হাড় গোড়, অনেক মাথার খুলি, অনেক শবদাহের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে গোটা জায়গাটা জুড়ে। পাশেই তরতর বহে চলেছে এক অপরিসর খাল। খালের এপারে গুটি কয়েক ন্যাড়া মাথা তাল গাছ, একগণ্ডা পাকুড় গাছ, একটু দূরে এক প্রাচীন বট।

'তোরা তৈরী?'—ছোট্ট একটা হাঁক ছাড়লো কালী।

অন্ধকারের ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব এলো,—'তৈরী ওস্তাদ।

বটগাছের তলা থেকে গুটি গুটি এগিয়ে এলো আট-দশটি মানুষ। রঙচঙে মুখ, জীবন্ত যমদূত যেন।

আগুনের ওপাশে মাটির বেদীর উপর ওরা এক কালী মূর্তি স্থাপন করলে, সাজিয়ে দিলে মঙ্গলঘট। খালের জলে স্নান করিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এল জোড়া দুই নধর দেহ ছাগনন্দন। একজোড়া পাঁঠাকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো বলির জন্যে। কালীর হাতে প্রকাণ্ড এক খাঁড়া। তারই এক আচমকা আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল একজোড়া অজমুণ্ড। স্যাঙাতেরা কালীমূর্তির সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিল কলাপাতায়। ছাগরক্ত দুহাতে মেখে নিয়ে পূজোয় বসল কালীকপালী।

আগুনের সুমুখে বসে কালীকপালী। চোখ দুটি মুদ্রিত। স্যাঙাতেরা অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বসেছে। ভয়ঙ্কর ওদের চেহারা। আগুনের আলোতে ওদের মিশকালো দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

ওদের মাটিতে পোঁতা বর্শার ফলকগুলি যেন আগুনের আলোক ঠিকরে দিচ্ছে বাইরের জমাট আঁধারের দিকে।

মায়ের লক্লকে জিভ যেন অনেক বলির রক্ত পান করে লাল টকটকে। রক্ত যেন গড়িয়ে পড়ছে তাঁর রক্ত মাখা জিভ থেকে।

মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পূজো শেষ হলো প্রায় একঘণ্টা পরে।

এতক্ষণ বন্দুকে ভর দিয়ে অবাক হয়ে দেখছিলুম আমি ওদের কাণ্ড। আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একপাল শেয়াল। মানুষের সাথে গলা মিলিয়ে ওরাও বোধ হয় মায়ের জয়ধ্বনি করলে—'হুক্কা হুয়া হুয়া।'

আবার বলিদান দেওয়া হলো। বাকী দুটি ছাগলের সাথে কয়েকজোড়া ঝুঁটিওয়ালা মোরগের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো মায়ের বেদী। মা তো হিন্দুব নন, মুসলমানেরও নন—ডাকাতে কালী শুধু ডাকাতদেরই। ওদের জাতিভেদ নেই, কিংবা ওরা নিজেরাই এক বিশেষ ধর্মাচরণে আসক্ত।

স্যাঙাতেরা ওদের ওস্তাদকে আভূমি আনত হয়ে প্রণাম করে বিদায় নিল একে একে। মায়ের শ্মশান অনুচব ঐ ফেরুপাল। ওদের জন্যে কিছু আহার রেখে বলি আর মায়ের প্রতিমা মাথায় নিয়ে মিলিয়ে গেল ওরা অন্ধকারের গর্ভে।

আমি ও কালী ফিরে চলেছি কাছারির দিকে। ঘড়িতে তখন আড়াইটে।

আশপাশের ধানের ক্ষেত থেকে শেয়ালগুলো গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। অদূরের এক গাঁয়ে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে মরছে মেঠো কুকুরের দল।

কালী থমকে দাঁড়ায় হঠাৎ। 'তোমার সেই বড় শেয়ালটা বুঝি নিত্যি গাই-বাছুর নিয়ে যাচ্ছে রাজাভাই? চলতো একবার পাশের গাঁ খানা চৌহদ্দী করে যাই।'

ডাইনে মোড় ঘুরে ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ভেড়ির পথ বেয়ে গাঁয়ের সীমানায় এসে পড়েছি প্রায়। আবার থমকে দাঁড়ায় কালী। কার হাত তালির শব্দ—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। কে ডাকছে কাকে—'আয়-আয়-আয়।' এক পলকের জন্যে দেখা গেল জ্বলন্ত দুটি জানোয়ারের চোখ। ব্যস্, চারিদিক আবার তেমনি নিস্তব্ধ।

টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে চেয়েছিলুম, কালী বারণ করলে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলি আমরা সন্তর্পণে। আন্দাজ মত কয়েকশ' গজ এগিয়ে এসেছি আমরা, কানে এলো ছোট্ট একটি চাপা আওয়াজ, 'আল্লা'।

কালী হাঁকে, 'কে যায় ওখানে?'

উত্তর আসেনা।

টর্চ জ্বেলেছি মাত্র। আলো-রশ্মি বরাবর ছুটে এলো একটা সড়কি। আবার—আবার। আমাদের বিশ পঁচিশ হাত সুমুখে একের পর এক মাটিতে এসে আমূল বিদ্ধ হলো সড়কি তিনটে।

'গুলি ছুঁড়োনা বাজা ভাই। আর একটু পেছিয়ে যেয়ে টর্চ ধরে দাঁড়াও। ব্যাটা যেন পালিয়ে যেতে না পারে। হাতে পায়ে এত জোর দিয়ে সড়কি চালাচ্ছে। রহমানটাই হবে। ও ব্যাটা পাকা সড়কি বাজ। অনেকদিন পরে ব্যাটা আমারে সড়কি ধরালে।'

কালী সেই মাটিতে বেঁধা সড়কি তিনটে তুলে নিচ্ছে। সাঁই সাঁই শব্দে ছুটে এলো আর একটি। সদ্য তোলা একটা সড়কির পাক ঘুরিয়ে কালী ঐ সদ্য নিক্ষিপ্ত সড়কিটির মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

স্থির হয়ে দাঁড়ায় কালী, হাঁক ছাড়ে তারপর, 'আর কডা আছেরে ব্যাটা তোর। সড়কি না থাকে তো লাঠি খাঁড়া ধর। এই নে—একটা তোরে ফিরিয়ে দিচ্ছি।' সজোরে কালী ছুঁড়ে দিল হাতের একটা সড়কি। সশব্দে গাছের গায়ে যেয়ে বিঁধলো সেটি। মনে

হলো যেন গাছটাকে ভেদ করে যেয়ে ওরই আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা আততায়ীকে বিদ্ধ করেছে ঐ সড়কির ফলা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কালী আবার হাঁক দেয়। 'কিরে, গাছের আড় থেকে বেরুবি না আমি এগিয়ে যাব।'

'এগিয়ে যেওনা খবরদার। আমি গুলি চালিয়ে ওকে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করছি।'—কালীকে ডেকে বললুম আমি।

'এটা লাঠি-সড়কির লড়াই রাজা ভাই। বন্দুকের সঙ্গে যুঝতে দিলে আমার ঐ মা বেটি কি আর আমার হাতের পূজো নেবে। একটু রসোনা। ব্যাটার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছি আমি।'

কালী এগিয়ে চলে। কয়েক পা এগুতেই গাছের আড়াল থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল কে। কালীও অমনি হাঁটুব চাপে মট্ করে ভেঙে ফেললে ওর হাতের একটা সড়কি। ঠ্যাঙাড়েদের পাবড়া ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গীতে ছুঁড়ে মারলে তার ভোঁতা খণ্ডটি।

'ইয়া আল্লা'—লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। 'দোহাই ওস্তাদ, জানে মেরোনা'—ধুঁকতে ধুঁকতে অনুনয় করে লোকটা।

আশ্চর্য, এ যে রহমান!

ওর চুলের মুটি ধরে ঝাঁকুনি দেয় কালী। 'আবার চুরি শুরু করেছিস্? চুরির মাল কোথায়?'—জিজ্ঞেস করে কালী।

'শয়তানীডারে দিয়ে দিইছি ওস্তাদ'—ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় রহমান। 'নিজির জন্যি এক পাই পয়সাও আর চুরি করিনে আমি—আল্লার কসম'—রহমান কাঁদতে শুরু করে, মিনতি করে আমার পা জড়িয়ে ধরে।

কে সেই শয়তানী? কার জন্যে তার এই চুরি? কি সেই চুরির মাল?

রহমানের মুখে গল্প শুনে অবাক হয়ে যাই আমরা। আমার কল্পনা কোনদিনও নাগাল পেতোনা এই কাহিনীর।

বাঘিনী মা তার তিন তিনটে বাচ্চা নিয়ে আহার সংগ্রহ করতে এখন রীতিমত নাজেহাল হচ্ছে। ক্ষিধের জ্বালায় মাঝে মাঝে সে এসে ধর্ণা দেয় রহমানের কাছে। হাঁস, মুরগী বা মেঠো কুকুরে এখন আর পেট ভরেনা। অথচ গোয়ালের গরু ধরে নিয়ে যাবার মত সাহসও নেই ওর। রহমান তাই গোয়ালের বাছুরের গলায় কোপ বসিয়ে টেনে আনে তাকে গোয়ালের বাইরে। তারপরে বাঘিনী এসে তুলে নিয়ে যায় তাকে।

কাছারির পশ্চিমে যেদিন বুড়ী বকরীকে চার করে পাহারা দিচ্ছিলুম আমি আর ময়না সে দিনের সেই চারটিকেও চুরি করেছিল রহমান, দিয়েছিল এই বাঘিনীর মুখে তুলে।

আশ্চর্য। এ যে এক অভাবিত চমক।

আর এক বিস্ময় বুঝি ঐ ময়না শিকারী। তবে রহমান আমাদের চার চুরি করে বাঘিনীর মুখে তুলে দিতে পারে একথা ময়না শিকারীও কল্পনা করেনি সেদিন।

ক্ষুধার্ত বাঘিনী রহমানকে রেহাই দিয়েছে এতদিন ধরে—এহেন কথা বিশ্বাস করবে কে!

আমার জিজ্ঞাসায় রহমান ওর অবাক দুটি চোখ তুলে চায় আমার দিকে। তারপর সে সহজকণ্ঠে বলে, 'তোমার · বাঘাডাও তো কম ভয়ানক নয় কত্তা। গাঁ শুদ্ধু লোক ভয় করে ওডারে। কিন্তু চড়চাপড়ডা তো তোমার কাছে কম খাচ্ছে না ঐ গোঁয়ার গোবিন্দডা। কই, তুমি তো ওডারে ভয় করোনা।'

কথাটা সত্যি। তা বলে পোষা কুকুরের সাথে হিংস্র বাঘিনীর তুলনা। আফ্রিকার জঙ্গলে ফাঁডারদের সঙ্গেও বুনো সিংহদের নাকি এমনি ভাব জমে ওঠে যে ফীডারদের চড়চাপড়টা পর্যন্ত দিব্যি হাসিমুখে হজম করে পশুরাজ। কিন্তু বাঘের বেলাতে এমনটি তো

কখনো শুনিনি। সুন্দরবনের আবাদী মানুষের সঙ্গে বাঘের পরিচয় বড় ঘনিষ্ঠ। তবু বাঘে মানুষে এমন ভাব জমানোর গল্প তো বলেনি কেউ এতকাল।

রহমান সেদিন বলেছিল বাঘিনীর কান ধরে টেনে আনতে পারে সে। আজও তো দেখলুম তার 'আয়-আয়' ডাকে বাঘিনী এসে তার শিকার কুড়িয়ে নিয়ে গেল। বকশিশের লোভে রহমান তাকে ডেকে আনতে রাজী নয় আমার বন্দুকের মুখে।

'চাও তো আমারে খুন করে কবর দিয়ে যাও কত্তা। কেউ জানবেনা। কিন্তু ও কাজডা আমারে দিয়ে হবে না। ওডা আমার ঘরের জরুর মত। জান থাকতি জবাই করতি দেবোনা ওরে'—বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ওর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলে রহমান।

রহমানকে বোঝালুম যে একদিন এই বাঘিনী হয়ে উঠবে মহা-ভয়ঙ্করী। তিন তিনটে বাচ্চা ওর বড় হয়ে উঠবে একদিন। সেদিন ওরা মানুষ উজাড় করে মারবে। সময় থাকতে ওদেরকে বনে তাড়িয়ে দিতে চাই অন্ততঃ।

ঐটুকু বাচ্চা কটি নিয়ে বনে গেলে পুরুষ বাঘে খেয়ে ফেলবে ওর বাচ্চা। আরেকটু বড় হয়ে বাচ্চারা শিকার ধরতে শিখলে রহমান নিজেই ওদের বনে তাড়িয়ে দেবে।

কালী কিন্তু রহমানের উপর রাগ করেনি মোটেও, 'বনের বাঘের সঙ্গে পীরিত জমিয়েছিস ব্যাটা। হিম্মৎ আছে তোর। পারলি ঠেকাস তোর বিবিজানেরে ময়না শিকারীর হাত থেকে। কালী তোর বিবির গায়ে হাত তুলবেনা—মেয়ে মানুষ মার জাত। তবে মানুষ খাতি শুরু করলি কিন্তু তোর জরু বলে সমীহ করবো না—হ্যাঁ, মনে রাখিস। চল এখন। ফরসা হয়ে আসতিছে।'

পায়ের ব্যাথায় উঠে দাঁড়াতে পারেনা রহমান।

কালী ওকে পিঠের ওপর চাপিয়ে নিয়ে দ্রুত পথ চলতে শুরু করে। গাছের ডালে ডেকে ওঠে ভোরের পাখিরা।

আরও তিন-চারটে নিস্ফল রাত্রি।

ময়না শিকারী অক্লান্তভাবেই খেটে মরছে দিনে রাতে।

এবারকারেব মত অ মাব কাছারিবাসের • মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে তাগিদ পাঠিয়েছেন বাবা।

আর দু-তিনটে দিন বড় জোর—এরই মধ্যে একটা ফয়সালা চাই-ই চাই।

বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে সকাল থেকে ঘুবতে বেড়িয়েছে ময়না। সন্ধ্যেবেলায় ফিবে এলো। বড় পবিশ্রান্ত সে, চিন্তাব ভাবে চক্ষু দুটি যেন চবম ক্লান্ত।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ কবে বেবিয়ে পড়তে হলো তবু।

বহম'ন এখন পায়েব ব্যথায় বিছানা নিয়েছে। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র হুদাবকী ক'বাব অছিলায কড়া নজর রাখা হয়েছে ওব ওপবে।

ময়না আব আমি—সঙ্গে নিলুম বাঘাকে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিযে সবাব অলক্ষ্যে এসে হাজিব হলুম আমবা গাছতলাব কে গোয়ালে। গোযালেব পাশেই ফলেব বাগান। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা মেঠো পথ। গাছেব ছায়ায় গোটা পথটা জুড়ে আবছা আঁধাব থাকে জ্যোৎস্নাবাতেও।

এগিয়ে চলি আমবা। একপাশে ধানের গোলা আ একপাশে হাঁস, মুবগী আব ছাগলেব খোঁযাড়। সঙ্কীর্ণ পথ সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে।

এগিয়ে চলেছি আমরা। দুপাশে দুখানা বড় আটচালা ঘরের দাওয়া। প্রমাণ আকাবেব মানুষেব মাথাব চাইতেও উঁচু দাওয়া। দুপাশেব ঘবের গোলপাতার চাল দুটি ঝুঁকে পড়েছে দুই দাওয়ার মাঝখানেব এই সরু গলিপথটাব উপর। আঁধার এখানে জমাট হয়ে চেপে বসেছে যেন।

এই গলিপথটুকুব পবেই প্রশস্ত আঙিনা।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম বুঝি। চোরের মত চুপিসাড়ে এসেছি

এতক্ষণ। ভাবছিলুম, গোটা পৃথিবীটার চোখেই ধুলো দিতে পেরেছি বুঝি। ও হরি! চারপাশে চেয়ে দেখি আমাকে ঘিরে আছে সেই মেঠো কুকুরের পাল। ওরা অনেক বেশি পাকা চোর।

সিঁড়ি বেয়ে দাওয়ার উপরে উঠে এলুম আমরা। সিঁড়ির দুই পাশের খুঁটিতে আড়াআড়ি ভাবে বাঁশ বাঁধা। এই বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়েই দেহ গলিয়ে দাওয়ায় উঠতে হলো। কুকুরকুলও আমার পেছু পেছু দাওয়ায় উঠতে চেষ্টা করলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়ে কেঁউ কেঁউ করে বিরক্তি প্রকাশ করলে দস্তুরমত।

নেমে গেল ওরা আঙিনায়।

দুই দাওয়ার ফাঁকে সেই গলিপথটুকু পাহারা দিতে হবে আমাকে বাঘিনীর পথ চেয়ে।

বাঁশের বেড়া দিয়ে দাওয়ার প্রান্তে নির্দিষ্ট করা হয়েছে আমার পাহারা দেবার স্থান।

ময়না আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যেন এই বাঁশের বেড়ার গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে না যাই কোনমতে। না—কোন প্রলোভনেই নয়। লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে যদি না যেতেন সীতা—কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল ময়না।

ময়না চলে গেল বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে। মেঠো কুকুরের পাল কিন্তু উঠোনের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

রাত্রি বড় জোর ন'টা। সুমুখের দীর্ঘ প্রহরগুলো পাহারা দিতে হবে আমাকে ঠায় বসে থেকে। একটা দিয়াশলাই কাঠির আলোও জ্বালানো চলবেনা।

আকাশে চাঁদ ওঠেনি, কিন্তু লক্ষ কোটি তারা জ্বলছে মিটমিট করে।

আলো নেই তবে অন্ধকারও নেই উঠোনে। কিন্তু গলিপথটাতে অন্ধকার তেমনি ভারী হয়ে আছে। সেই অন্ধকারের ওপারে দৃষ্টি চলেনা।

আমার সুমুখে আঙিনার ওপাশে দেখা যাচ্ছে সারিবন্দী কটি ধানের গোলা আর ঢেঁকিশাল। তারই পেছনে কটি ফলের গাছ।

আমি এখন চিনতে পারি গাছগাছালির পেছনে ঐ খড়ের ছাউনি দেওয়া বড় ঘরখানিতে থাকে রহমান।

আমি তা হলে জুম্মান সেখের দাওয়ায় বসে আছি। জুম্মান আমাদের অনুগত প্রজা।

উঃ, কি অসহ্য এই ওৎ পেতে থাকা। মেঠো কুকুরের দলও ক্লান্ত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুতে শুরু করলে।

লক্ষ্মণের গণ্ডী পেরিয়ে রাবণ রাজার খপ্পরে পড়েছিলেন সীতাদেবী। ময়নার এই বাঁশের বেড়ার গণ্ডী পার হলে আমিও পড়বো বাঘিনীর কবলে।

কথাটা মনে পড়তেই খুব একচোট হেসে মরি আমি। গণ্ডী পেরিয়ে পায়চারি করি দাওয়ায়। গলিপথে আসলে আমি তাকে নির্ভুল ভাবেই গুলি করতে পারি এখান থেকে।

আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে ময়নার এই বাড়াবাড়ি।

কুকুর— ওরা দশমিনিট আগেই হুঁসিয়ার করে দেবে আমাকে। ওদের এক ডজনকেই তো আমি চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। ওরা দিব্যি ঘুমুচ্ছে। অমন হুঁসিয়ার সাইরেন থাকতে আমি কেন চোখ জ্বালিয়ে পাহারা দিচ্ছি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম আঙিনায়। ওদের কেউ কেউ মুখ তুলে চেয়ে দেখে আমাকে, কেউ কেউ বা আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।

একঘেঁয়ে পায়চারি করে বেড়ানোই বা কতক্ষণ ভাল লাগে। ফিরে আসি আবার গণ্ডীর মধ্যে।

আশপাশের বাগান থেকে শেয়ালগুলো ডেকে উঠলো একসুরে গলা মিলিয়ে। মেঠো কুকুরের পাল লাফিয়ে উঠলে অমনি। 'ঘউ—ঘউ'— দে ছুট। শিবাকুলকে বরদাস্ত করতে ওরা নিতান্তই নারাজ। গোয়ালের বাছুরও ডেকে উঠল হাম্বা রবে।

বন্দুক বাগিয়ে ধরি আমি। সতর্ক দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখি চারদিকে।

আবার সব চুপচাপ। মেঠো কুকুরেরা ফিরে এলো আঙিনায় একটি দুটি করে। ওরা আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

আশাভঙ্গের অবসাদে বিরক্ত হয়ে ওঠে মন। নেমে এলুম আবার আঙিনায়—আবার সেই পায়চারি। ক্লান্ত হয়ে এসেছে পা দুটি। দাওয়ার সিঁড়িতে বসে বিশ্রাম করবো ভাবছি, হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো কটি কুকুর। ছুটে যেয়ে সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়াই আমি বন্দুক বাগিয়ে। এতক্ষণে মিলেছে বুঝি প্রতীক্ষার সেই শুভ মুহূর্তটি।

'ঘউ—ঘউ—ঘউ।' মেঠো কুকুরদের কোলাহলের জবাব এলো অন্ধকার গলি থেকে—শুধু একটা গম্ভীর গোঙরানি মাত্র।

অন্ধকার থেকে আঙিনার আলোতে এসে দাঁড়ালো একটি ভারিক্কি চেহারার জানোয়ার—আর কেউ নয়, সে আমার বাঘা। মেঠো কুকুরেরা চুপচাপ। বাঘাকে ওরা বাঘের মতই ভয় করে। সিঁড়ি বেয়ে বাঘা সোজা উঠে এলো আমার কাছে।

বাঘার পিছনে ময়না আসছে ঠিক। কিন্তু কোথায় ময়না! ঘণ্টা পেরিয়ে গেল যে। বাঘাকে জিজ্ঞেস করি ময়নার খবর। নিশ্চিন্ত আলস্যে হাই তোলে সে।

বুঝি, ময়নার নিরাপত্তা সম্পর্কে একটুও উদ্বিগ্ন নয় সে। রাগ করে বলি ওকে ময়নাকে ডেকে নিয়ে আসতে।

বাঘা নড়ে না।

একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়না বাঘিনীর সন্ধানে। বাঘা সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হ'ত ওর। কিন্তু ময়নাকে ছেড়ে ব্যাটা পালিয়ে এসেছে ঠিক।

রাগ করে বাঘার গলার বেল্ট ধরে আঙিনায় টেনে আনি ওকে। টেনে নিয়ে চলি দুই দাওয়ার ফাঁকের সেই গলিপথের দিকে। কেঁউ

কেঁউ করে অনিচ্ছা জানায় বাঘা। মেঠো কুকুরের দল ঘুম ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙছে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে।

আমিও নাছোড়বান্দা। বাঘাকে টেনে হিঁচড়ে গলির মুখটাতে এসে পড়েছি প্রায়। 'ঘউ ঘউ' করে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল বাঘা। 'ঘউ ঘউ' করে উঠল মেঠো কুকুরের পাল।

পলকপাতে দেখলুম এক জোড়া জলন্ত চোখ। বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘা। আমার দুপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেঠো কুকুরের পাল। দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারা বল যেমন ঠিকরে আসে ঠিক তেমনি এক ডজন মেঠো কুকুরকে কে যেন আবার ছুঁড়ে মারলে আমার গায়ের উপর। টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়লুম আমি। বিশালকায় এক জানোয়ার কুকুর-গুলোর সঙ্গে আমাকেও ডিঙিয়ে গেল ছোট্ট একটি লাফ দিয়ে।

পাঁচ-দশ সেকেণ্ড মাত্র। কুকুরগুলো ডিগবাজী খেয়ে উঠে দাঁড়ায় আবার। বন্দুক বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়াই আমিও। কিন্তু কোথায় সেই দুরন্ত জানোয়ার! টর্চের আলো ফেলি চারদিকে।

'শিকার পালিয়েছে দাদাভাই, যাকগে'—ময়না শিকারী ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় সস্নেহে। 'তুমি ভালো আছতো দাদাভাই'—দুর্ধর্ষ ময়না শিকারীর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে বড় বড় ফোটায়। ময়· কাঁদছে, 'আল্লা-আল্লা আমাকে জান দিলে আজ।'

'তোমাকে নয়, তোমার আল্লা জীবন ফিরিয়ে দিলেন আমাকে।'

'ও একই কথা দাদাভাই,' ময়না জবাব দিলে। 'বাঘিনীকে বাগে পেয়েছি ভেবে দোনলায় দুটো গুলি ভরেছি। যখন ঘোড়াকল টিপতি যাব তখন দেখি শিকারের পথ বরাবর আঙিনায় দাঁড়িয়ে তুমি। কপাল চাপড়ে বন্দুকটারে তখন উলটে ধরলাম নিজের বুকের দিকি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে, রতি না পারলি তোমার সঙ্গেই বেহেস্তে যাতি পারি তো।'

ময়নাকে বুকে জড়িয়ে ধরি প্রাণপণে। এই অশিক্ষিত গরীব মুসলমানটির তুলনায় আমি! ছি-ছি-ছি!

মেঠো কুকুরেরা অবাক চোখে চেয়ে দেখছে আমাকে। এখনও ওদের ভয় কাটেনি---আমাকে ঘিরে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার গা শুঁকছে ওরা বারে বারে। আমি আঘাত পেয়েছি কিনা বোধ হয় তারই আন্দাজ করছে এমনি করে।

কিন্তু বাঘা কই? সে-ই যে প্রথম ঝাঁপ দিয়েছিল বাঘিনীকে রুখতে—মরণ ঝাঁপ।

রক্তরাঙা মাটির কাদায় শুয়ে তখনও ধুঁকছে বাঘা। বাঘিনীর থাবার আঘাতে পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর মুখের উপর মুখ রেখে আমি কেঁদে উঠি 'বাঘা-বাঘা'।

বাঘা মিটমিট করে চায় আর অনেক চেষ্টা করে তার শেষ উত্তর জানায়—একটি মাত্র ছোট্ট ডাক-'ঘউ'।

হামাগুড়ি দিয়ে আমার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে একটি মেঠো কুকুর—আরও আরও দুটি। ওরা রক্তাক্ত, ওরা পঙ্গু হয়ে গেছে।

আমি কাঁদি—কান্না আমার হুকুম মানেনা তাই। দাঁত কড়মড় করে ময়না, 'শয়তানী; শয়তানী'।

শয়তানী! হয়তো সে সত্যি তাই!

কিন্তু মায়াবিনীও সে কি কিছু কম নয়!

॥ তিন ॥

কলেজের পড়ায় যে মন মগ্ন হয়ে ছিল ছুটির কদিন আগে, সে যেন বইয়ের পাতায় আড়ি পেতে বসলো আজ ছুটির পরে ফিরে এসে। ভালো লাগেনা আর কিছু।

দামাল ছেলে যেন তার দিনের বেলাকার দুষ্টুমিপনা ছেড়ে আত্মস্থ হয়ে বসেছে গভীর নিশীথের অতন্দ্র ধ্যানে।

হকির পরেই ফুটবলের মরশুম। কলেজের কমনরুমে কিংবা পাড়ার ক্লাবে বেজে উঠেছে তার সুস্পষ্ট পদধ্বনি।

তা ছাড়া আছে পাড়া বেপাড়ার থিয়েটার। ক্লাবে কলেজে তারই তোড়জোড়। বিশেষ করে ছুটির পরে কলেজ সরগরম করে তুলেছে এবার কালচারাল দল। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও নাকি অভিনয়ে অংশ নেবে—বিদ্যাসঙ্গিনী এবার কলাসঙ্গিনী।

খবরটা আমাকে শুনিয়ে যাচ্ছে আমাব অন্তরঙ্গেরা। সদর অন্দর দুই মহলেই যাদের সমান আনাগোনা তারা বাণীবাহক মাত্র নয়। মেয়েদের প্লান-প্রোগ্রামের খবরটা তারা সদর মহলে ফাঁস করে দিচ্ছে, আবাব সদরের সংবাদও ওরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্দরে। ছাত্রমহলে হঠাৎ এক সময় সংবাদ এসে হাজির হলো যে নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্রীরাই নাকি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে চায়।

'বড়ই দুঃসংবাদ দারা', আমার দিকে কটাক্ষ করে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন আমাদের পরিচালক মশায়।

সমাগত নাটুকে দলের মুখে চোখে ফুটে উঠলো এক দারুণ উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

'বড়ের চালে কিস্তি মাৎ করতে চায় ওরা। আমাদের গজ, অশ্ব মায় রাজা পর্যন্ত কুপোকাৎ হবে নির্ঘাত।'

'কুপোকাৎ করবে—কি করে?'

পরিচালক মশায় রীতিমত রেগে যান এই বালসুলভ জিজ্ঞাসায়।

বিলেতী আয়নার কাঁচের উপরেই যেন স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে ওদের অভিসন্ধি। পরিষ্কার তা তো দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

'নাটক নির্বাচনই তো মোদ্দা কথা। ৺যোগেশ বাবুর 'সীতা' হলে আমাদের লবের কাছেই নির্ঘাৎ মার খেয়ে যেতো ওদের সীতা। 'কর্ণার্জুনের' কৃষ্ণের কাছে দ্রৌপদী এঁটে উঠতে পারবেনা। 'সরমা' হলে সীতা-সরমা কেউ ধোপে টিকতোনা আমাদের তরণীসেনের কাছে। আর রাবণ-বিভীষণ তো আছেই। 'সাজাহান'—বেশ, দারাসিকো বা মহম্মদ না পারুক বাপ-ব্যাটা আছি তো আমরা। কি করবে ওদের মিস্ সেনগুপ্তা আর মিস্ রায়। মেসার্স রায় সেনগুপ্তা এণ্ড কোং ইনসলভেন্সি ফাইল করবে দেখবি'—পরিচালক মশায় তাঁর কৃশদেহটাকে যথাসম্ভব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

ও মহলের নির্বাচন কি হতে পারে তারই খবর নিয়ে এলো আর একজন দুর্মুখ।

'রবিঠাকুরের বিসর্জন'!

'ধর তোকে যদি গোবিন্দমাণিক্য—না, বড্ড ছেলেমানুষ দেখাবে তোকে মিস্ সেনগুপ্তার তুলনায়'—পরিচালক মশায় চিন্তিত হয়ে পড়েন আমার সম্ভাব্য ভূমিকার কথা ভেবে।

আমার অন্তরঙ্গের দল অমনি প্রস্তাব করে বসে জয়সিংহের ভূমিকায় আমাকে নির্বাচনের জন্যে। মেয়ে মহলের পাণ্ডাদের একজন নাকি আমাদের শম্ভুর কাছে বেফাঁস বলে ফেলেছে এই কথাটা। শম্ভু সেই বেফাঁস কথাটাকেই ফাঁস করে দিলে সভায়। সবাই একবাক্যে লাফিয়ে ওঠে, 'লড়িয়ে দিন ওকে ঐ জয়সিংহের ভূমিকায়। দেখি ওদের অপর্ণার অহঙ্কার যায় কোথায়।'

খুশি হওয়া উচিত ছিল আমার। গত বছর এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড করেছি আমি। ভোটের জোরে ওরা আমাকে হারিয়ে দিয়ে 'বিসর্জন' এর বদলে অভিনয় করলে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া'। রাগ করে অভিনয়ে অংশ নিলুম না আমি।

আজ আমি না চাইতেই পেলুম সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা। অথচ খুশি হতে পারলুম না যেন। মনের ভেতর তাগিদ নেই। গোটা মনটাই যেন বদলে গেছে।

নাটকের কাষ্টিং নিয়েই উত্তেজনা চরমে ওঠে বরাবর। কিন্তু এ যে একেবারে ঈশান কোণে কালো মেঘের ঘনঘটা। উত্তেজনার ঝড়ো হাওয়া কমনরুমের গণ্ডী পেরিয়ে হঠাৎ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে ক্লাশরুমের মধ্যে। বইয়ের পাতা ওলট পালট হচ্ছে। বইয়ের সাথে বই-পড়া মনটাও।

আমার এই আকস্মিক অনাসক্তিতে অবাক হয়ে যায় ছেলের দল। অন্তরঙ্গেরা এসে অনুযোগ করে—'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই'। ওরা ঠাট্টা করে, আমার নামে কবিতা লেখে, আমার কানের কাছে মুখ এনে গানের সুরে শোনায়, 'কোন মায়াবিনী মন করে চুরি, কহ কালা গুণমণি'।

নিজের চোখেই এবার ধরা পড়ে যায় নিজের মনটা। জোর করে ভুলতে চেষ্টা করি সেই মায়াবিনীকে।

বন্ধুরা বিরক্ত হয়, বেপরোয়া হয়ে আমাকে বিদ্ধ করতে থাকে বাক্যবাণে কিংবা কবিতা-গানে। বাড়িতে রেখে এসেছি আমি কোন চতুরিকা নিপুণিকা মালবিকাকে—বন্ধুরা শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

চতুরিকা! চতুরিকাই সে বটে। মনের কথা মনে চেপে রাখতে যেয়ে হাঁপিয়ে উঠি আমি। তবুও মুখ ফুটে বলতে পারলুম না সেদিন যে কার ধ্যানে এমন বৈরাগী সেজেছে মন।

অন্ধকারে এসেছিল অভিসারিণী। তার সেই মন আলো করা

রূপ তো আমি চোখে দেখিনি। এক লহমার জন্যে বুঝি দেখেছিলুম তার দ্যুতিময় আঁখি তারা দুটি।

এক পলকের একটু দেখা। প্রাণ দিলে আমার প্রিয় পোষ্য বাঘা। মেঠো কুকুর তিনটি মাটির উপরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেনা আর।

সেই অলক্ষুণে রাত তখনও আমার চোখের সুমুখে ভেসে বেড়াচ্ছে তার প্রতি মুহূর্তের খুঁটিনাটি নিয়ে। বাঘা সেই অন্ধকার গলির দিকে এগিয়ে যেতে নারাজ। গায়ের জোরে আমি ওর গলায় বাঁধা চামড়ার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছি সুমুখের গলির দিকে। কেঁউ কেঁউ করে প্রতিবাদ জানিয়ে পিছু হটবার জন্যে মরীয়া হয়ে ধস্তাধস্তি করছে বাঘা। হঠাৎ একটা ঝট্‌কা টানে আমার হাত ছাড়িয়ে দুরন্ত এক লাফে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঐ অন্ধকার গলিতেই।

আগুনের গোলার মত দুটি চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়লো যেন।

এক ডজন মেঠো কুকুর আমার চারপাশ থেকে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে গলিপথের ঐ আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে।

মুহূর্তের মধ্যেই দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারা বলের মত সবেগে প্রতিহত হয়ে এসে হুড়মুড় করে পড়লো ওরা আমার উপরেই।

বেসামাল অবস্থায় চিৎপাত হয়ে পড়লুম আমি মাটিতে। আমার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে তখন অতগুলো মেঠো কুকুর। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে আমাকে ডিঙিয়ে গেল একটা ভারী জানোয়ার।

একটি মেঠো কুকুরকেও সে মুখে তুলে নিয়ে যায়নি। মাত্র একটি কুকুরের ঘাড়ের উপর ওর দাঁতের দাগ। ঘাড় আর পিঠের উপর থাবা চালিয়ে সে পঙ্গু করে দিয়েছে বাকী দুটি মেঠো কুকুরকে। বাঘার বুকের উপর থাবা মেরেছে বাঘিনী।

বাঘিনীর নখে যেন তলোয়ারের ধার। অমিত শক্তি ওর আঘাতে। লম্বা নলী শিকারের দেহে আমূল বিদ্ধ করে এক খাবল মাংস তুলে নিতেই ওরা অভ্যস্ত। এর আগে গরু, মোষ এমনকি মানুষের দেহেও এমনি ধরনের আঘাতের চিহ্নই দেখেছি। কিন্তু এবার যা দেখলুম সে যে বেশ একটু আলাদা রকমের। নলী ফুটিয়ে সে একটা গভীর গর্তের সৃষ্টি করেনি। বরং ছুরি বসিয়ে টেনে আনার মত করেই শত্রুর দেহটাকে সে ফেড়ে দিয়েছে দুভাগে।

একটি মাত্র কুকুরের ঘাড়ে কামড় বসিয়েছে বাঘিনী। দাঁতের প্রয়োগ এত কম হবার নানা কারণ হতে পারে। খুব সম্ভব কুকুর কুলের এই আকস্মিক অভ্যর্থনার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না মোটেও। এমন একটা চকিত আক্রমণে হকচকিয়ে যাবারই কথা—তাই ত্বরিত গতিতে শত্রুকে পঙ্গু করে দিয়ে পলায়নের পথ পরিষ্কার করতে চেয়েছিল বাঘিনী।

দাঁতের দাগ থেকে আরও বোঝা যায় যে দন্তীর নিচের চোয়ালের বাঁদিকেব বড় দাঁতটি নেই।

কিন্তু যা তার ছিল তা দিয়েও তো সে তার মানুষ শত্রুকে দিব্যি ঘায়েল করতে পারতো। তবে আমি রেহাই পেলুম কেমন করে! সবাই বললে, কপালগুণে। কেউ বা বললেন দৈবক্রমে, ময়না কিন্তু মানতেই চায়না সেকথা।

যা ঘটে তারই নাম ঘটনা। তবে কারণ ছাড়া কিছু ঘটেনা, তা সে কারণ হোক জানা বা অজানা। ময়নার মত ঠিক তাই। আর এক্ষেত্রে কারণটাও খুব সুস্পষ্ট বলেই ওর ধারণা।

মানুষের সঙ্গে অপরিচয়ের বেড়া তখনও ভাঙেনি, অথচ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও গড়ে ওঠেনি পুরামাত্রায়। মানুষ তখন ওর কাছে ঘাতক নয়। আবার মানুষকে তার সহজ ভক্ষ্য বলে তখনও ভাবতে শেখেনি বাঘিনী।

বাঘিনীর প্রথম পরিচিত মানুষ হচ্ছে রহমান। মানুষের সঙ্গে

পরিচয়ের জড়তা কেটে গেছে ওর অনেকখানি। মানুষকে সে জেনেছে ওর বন্ধু বলে।

রহমান ওকে আহার জুগিয়েছে অনেক দিন ধরে; এই তো সেদিনেও তার প্রমাণ পেয়েছি হাতে নাতে। আহারের অভাব হলেই বাঘিনী রহমানের বাড়িতে এসে ধর্ণা দেয়। কদিনের চেষ্টার পরে ময়না আবিষ্কার করেছে এই সত্যটি। বাঘার সাহায্যে বাঘিনীর যাতায়াতের পথেরও একটা নিশানা পেলে ময়না। আর সেই সম্ভাব্য যাতায়াতের পথের উপর কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে ওৎ পেতে থাকবার জন্যে ব্যবস্থা করা হলো।

ময়নার ব্যবস্থা মতে তাই ওৎপেতে ছিলুম আমি। পাছে বাঘিনী গ্রামান্তরে যায় বা অন্য পথে রহমানের বাড়িতে এসে হাজির হয় এই আশঙ্কায় বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে বাঘিনীর সন্ধানে বেরিয়েছিল সে।

সন্ধ্যে রাতের কিছু পরেই বাঘা খুঁজে বার করল বাঘিনীকে গাঁয়ের আর এক প্রান্তে। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাঘিনীর পিছু নিলে ওরা।

গোটা গাঁ খানাকেই একবার চৌহদ্দী করে বাঘিনী দ্রুত পায়ে। কটি বাড়ির আনাচ-কানাচেও ওৎ পেতে রইল কয়েক মিনিট করে। পরিক্রমা করে এলো কটি গোশালা।

না, গেরেস্তেরা এখন হুসিয়ার হয়েছে দস্তুর মত। বাঘিনী নিরাশ হয়।

তার পরে ফিরে এলো সে এক তেঁতুলতলার অন্ধকার ছায়ায়।

ভিন গাঁয়ে যাবার মেঠো পথ চলেছে এখান থেকে ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে।

বাঘিনী মুখ ফেরায় ভিন গাঁয়ের দিকে। বুঝি সে আহারের চেষ্টায় চললো এবার গ্রামান্তরে।

ছোট্ট কটি নুড়ি ছুঁড়লে ময়না। একের পর এক টুপ্‌টাপ করে

মুড়িগুলো যেয়ে পড়লো বাঘিনীর সুমুখে। মুখ ফেরায় বাঘিনী ময়নার দিকে।

বাঘার চোখ দুটিকে হাত দিয়ে আড়াল করে খেজুর গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে ময়না।

বাঘিনী তার মনস্থির করেছে এবার। ওর অন্নদাতা বন্ধুর কাছে যাবে সে।

খেজুর গাছের আড়ালে যেখানে বন্দুক বাগিয়ে বসেছিল ময়না সেই মেঠো পথ বেয়ে দুলকি চালে চলে গেল বাঘিনী।

ময়না ওর বন্দুকের ঘোড়াকলে আঙুল রেখেছিল। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে শিকার। ট্রিগার টানলেই গর্জন করে উঠবে বন্দুক, আর্তনাদ করে উঠবে শিকার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। আবাদী মানুষ কাল জয়ধ্বনি দেবে ময়না শিকারীর নামে।

শিকার পাল্লার বাইরে চলে গেল। শিকারী তার বন্দুক নামিয়ে নিলে। বাঘাকে নিয়ে এবার অনুসরণ করলে ময়না।

বাগে পেয়েও কেন শিকারকে হাত ছাড়া করলে? বাঘার এই অপঘাত মৃত্যুর জন্যে তাই বড় কেঁদেছিল ময়না। সেই তো এই মৃত্যুর সুযোগ করে দিয়েছে।

বাঘিনী আর এক বাড়ির গোয়ালের পেছনে ওৎপেতে বসলে যে। অদূরের ঐ পথটা বেয়েই আমরা সন্ধ্যেবেলায় এসেছি। ঐ পথ ধরেই বাঘিনী রহমানের বাড়িতে আসবে বলেই তো এই বারান্দার উপরে আমাকে রেখে গেছে ময়না।

কিন্তু বাঘিনী তো এই পথে আসবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করলেনা।

গোয়ালের পাশ দিয়ে বাঘিনী চলে গেল বুঝি অন্দরে। অন্দর থেকে পুকুরের পাড় বরাবর রহমানের বাড়ির পথে আসতে পারে সে।

বাঘাকে নিয়ে ময়না সন্ধ্যেবেলাকাব সেই পথে রহমানের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে কিছুটা।

জুম্মান সেখের বাড়ির উঠান দিয়ে রহমানের বাড়িতে না এসে বাঘিনী যদি ভিন্ন পথে যায়।

ব্যাকুল হয়ে ওঠে ময়না। তার মনে পড়ে আমাদের মুখে শোনা আর একটি রাতের কথা। রহমানের 'আয় আয়' ডাকে বাঘিনী এসেছিল তার আহার নিয়ে যেতে।

মস্ত বড় একটা কুলগাছের তলে দাঁড়িয়ে রহমানের গলার নকল করে চাপা স্বরে ময়না ডাকে 'আয়, আয়'। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তর আসে পুকুরের ওপারের এক খামার থেকে—ছোট্ট চাপা গোঙানি।

ময়না আবার ডাকে। আবার আসে জবাব। তাড়াতাড়ি বাঘাকে ছেড়ে দেয় ময়না। 'যা বাঘা শীঘগির যা। দাদাবাবুকে হুঁসিয়ার হতে বলবি। এক্ষুণি শিকার মিলবে। কাল দেখিস দশখানা গাঁয়ের লোক দাদাবাবুকে বাহবা দেবে, বলবে আমার ভাই বনবিবির বরপুত্তুর। কাল বনবিবির ভেট চড়াবো। তোকে অনেক মাংস খেতে দেবো দেখিস।'

এক ছুটে বাঘা চলে এলো আমার কাছে। ময়না চড়ে বসলো গাছে। বাঘিনীও এসে হাজির হলো কুলগাছের তলে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। কয়েক মিনিট সেখানে অপেক্ষা করে বাঘিনী এবার ছোট্ট একটি চাপা গর্জন করে ওর উপস্থিতি ঘোষণা করলে বুঝি। আরও কয়েক মিনিটের অপেক্ষা। তারপর সে চললো রহমানের বাড়ির উদ্দেশে।

এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি। বাঘিনীর সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কের কথাটুকু তবু বলার প্রয়োজন ছিল বৈকি।

কিন্তু আরও একটা কথা। মানুষকে সে তার অন্নদাতা মনে করে ভালবেসেছিল ঠিকই, তবে সে ভালবাসার সঙ্গে ভয়ের ভাবও ছিল কিছুটা। রহমানের হাতের ঐ লম্বা সড়কিটাকে বাঘিনী রীতিমত ভয় করতো। আর ভয় ছিল তার জ্বলন্ত মশালে। রহমানের হাতে জ্বলন্ত মশাল দেখে বাঘিনী তার আহার নিয়ে যেতে

আসতেও সাহস পেত না। মশাল নিয়ে অনেকখানি দূরে চলে গেলে তবেই বাঘিনী তার আহার কুড়িয়ে নিয়ে যেতো।

আমি যে বরাতক্রমে বেঁচে যাই নি—এই কথাটাই ময়না জোর দিয়ে বলতো তাই।

দৈবক্রমে আমার মুখোমুখি এসে পড়ায় হয়তো সে আমাকে আঘাত হানতো। হুরন্ত এক থাবার আঘাতে আমাকে ধরাশায়ী করে পালিয়ে যেতো সে। রাত্রির ভোজের জন্য মুখে তুলে নিয়ে যেতো না বলেই ময়নার ধারণা।

গোল বাধালো ঐ কুকুর-কুল। শক্তিমান বাঘা ঝাঁপিয়ে পড়লো—যেন একটা বিত্যুতের চমক। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলে এক ডজন মেঠো কুকুর। বাঘিনী যখন আমাকে ডিঙিয়ে গেল তখন আমি চাপা পড়ে আছি কুকুরদের তলে। হয়তো আমার দেহের উপর থাবা মারবার কিংবা আমার ঘাড়ে কামড় বসাবার কোন সুযোগ ছিল না সেই মুহূর্তে।

তাছাড়া বাঘিনী ভয় পেয়েছিল বলেও মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। ক্ষুধার তাড়নায় আহার অন্বেষণে বেরিয়েছে সে। অথচ আহত কুকুরদের একটিকেও মুখে তুলে নিয়ে গেল না। সে বেশ বুঝেছিল যে ফাঁদ 'পেতে বসেছিল মানুষ তারই জন্যে। তাই সে এই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেল তক্ষুণি।

কুকুরগুলিকে মনে পড়ে বারবার।

বাঘার বড় ভয় ছিল ঐ বাঘিনীকে। একবার ওর গায়ের গন্ধ পেলে বাঘা ভয়ে কাট হয়ে যেতো। ছুটে এসে দাঁড়াতো আমার পিছনে। চোখত্নটো ভয়ে ছানাবড়া হয়ে যেতো, গায়ের লোম যেন মাথা উঁচিয়ে উঠতো, নাকটা বিস্ফারিত হতো বারে বারে।

অথচ সেই রাতে ময়না বারে বারে হারিয়েছে বাঘিনীর নিশানা আর বাঘা বারে বারেই সেই হারানো নিশানা খুঁজে দিয়েছে। একটুও ভয় পায়নি সে।

আর বিপদ যখন সত্যি এলো। শেষ মুহূর্তেও তো বাঘা পালিয়ে যেয়ে তার প্রাণ বাঁচাতে পারতো। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সুমুখে দেখেও সে তার নির্বোধ প্রভুকে ত্যাগ করেনি। বরং নিজের জীবন বলি দিয়ে উদ্যতদণ্ড শমনকে সে রুখে দিলে যেন আমারই ঘরের দরজায়। বাঘা বুঝেছিল, এ যাত্রা রক্ষে নেই আমার।

আর ঐ মেঠো কুকুরের দল! ওরাও আমাকে ভালবেসেছিল। আমি ওদেরকে দিয়েছিলুম শুধু দুবেলার দুমুঠো ভাত। প্রতিদানে ওরা দান করলে আমার জীবন।

প্রভুর বিপদে প্রভুভক্ত কুকুর হয়তো আজও তার জীবন বলি দিতে নারাজ নয়। মেঠো কুকুরেরা হয়তো আজও তেমনি করে ভালবাসে তাদের অন্নদাতাকে।

কিন্তু আর একজন ময়না কি আজও মেলে?

সেদিন কিন্তু ময়নাব কথাটা অত বড় হয়ে দেখা দেয়নি। ময়না মুসলমান কিনা সে কথা নিয়ে মাথা ঘামায় কে আবার। ময়না যে আমায় বড় ভাই। অনুজকে বাঘিনীর মুখে সঁপে দিয়ে কোন মুখে মার কাছে ফিরে যাবে অগ্রজ। এ যে এক চিরন্তন সত্য। শক্তিমান অগ্রজ সঙ্গে আছে বলেই তো বাবা তাঁর উদ্ধত অজ্ঞ পুত্রটিকে আসতে দিয়েছেন এই অভিযানে।

কিন্তু ওসব কথা থাক। সেদিনের সেরা ভাবনাটি ছিল অন্য রকমের। উদ্ধত যৌবন এক বাঘিনীর কাছে পরাজিত। আমার সকল অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে বাঘিনী। প্রতিশোধ চাই তার। প্রতিহিংসার চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলে মনকে। দেওয়ালে টানানো ক্যালেণ্ডারের তারিখের উপর আঁক কাটি— এক-দুই-তিন। একটি দিন চলে যায়—একটু করে এগিয়ে চলি আমি। গরমের ছুটির আর কতদিন বাকী।

লেখাপড়া, থিয়েটার, ফুটবল—না কিছুতেই মন বসে না। মন পড়ে আছে বহুদূরে। শহর আমাকে আর আকর্ষণ করে না।

সদরের নায়েব মশায় এসেছিলেন জমিদারির কাজকর্মে। সুন্দরবন থেকে মাছের চালানী নিয়ে এসেছিল জেলেপাড়ার বিজয় মালো। গোলপাতার বোঝাই এনেছে আহম্মদ। এক কলসী খাঁটি মধুও নিয়ে এসেছে সে আমার জন্যে।

মধুর চাইতেও বেশি মিষ্টি ওর মুখের খবর।

বাঘিনী আজও বহাল তবিয়তে চরে বেড়াচ্ছে তার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে। একটা রাতও সে রেহাই দেয়না। গেরস্তের গোয়ালে এখন গরু বাছুর রাখাই দায়। পরের বর্ষায় হালের গরু পাওয়া যাবেনা আর চাষের জন্যে।

নায়েব মশায় বলেন, সব কিছু ঐ রহমান ব্যাটার শয়তানি। ওঁরই মুখে শুনতে পেলুম যে সেই ঘটনার রাত্রি থেকেই রহমানও উধাও হয়েছে।

সর্বনাশ! বাঘিনী কি শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে রহমানকেই মুখে তুলে নিয়ে গেছে! কিন্তু রহমান যে তখন পায়ের ব্যথায় শয্যাশায়ী ছিল। ঘটনার পরে আশপাশের বাড়ি থেকে অনেক লোকই এসেছিল, কিন্তু রহমান আসেনি তো!

রহমান সত্যিই উধাও। পরের দিন থেকে তার খোঁজ পাওয়া যায়নি আর।

'বাঘে নিলে তো বাঁচা যেতো। তবে বাঘেই যদি নে ব তাকে তাহলে ওর সেই হাঁসমুখো সড়কি দুটো আর ওষুধপত্র উধাও হলো কি করে!'—নায়েব মশায় রহমানের উপর ভারি চটে আছে।

রহমান বাঘিনীকে সাহায্য করে ওর শিকার ধরতে। গোয়ালের দরজা খুলে দেয় রহমান, কিংবা গোরু-মোষকে চুরি করে নিয়ে যায় বাঘিনীর আস্তানায়।

গেঁয়োতলীর খালের ইজারা নেয় বিজয় মাছের জন্যে। এবারেও সে মাছ ধরেছিল তার মস্ত দুটো হাপর বো াই করে। হাপর দুটো অল্পজলে খোঁটায় বাঁধা ছিল যথারীতি। চালানী পাঠাবার জন্যে খুব

ভোরেই বিজয় ওর লোকজন নিয়ে হাপর তুলতে গেল গেঁয়োতলীর ঘাটে। কাছারি থেকে বড় জোর এক ক্রোশ পথ। অবাক কাণ্ড! একটি মাত্র হাপর আছে জলে কিন্তু মাছ নেই তাতে একটিও। অন্য হাপরটিকে ডাঙায় টেনে তুলেছে কে। তার ভেতরে কিছু মাছ তখনও অবশিষ্ট আছে বটে, তবে হাপরের চার পাশে নরম মাটির উপরে মানুষের পদচিহ্নের সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে বাঘের পায়ের ছাপ। ভয় পেয়ে জেলেরা ফিরে এলো কাছারিতে। তাজু মিঞাকে লোকজন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল কাছারি থেকে।

তাজু এসে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে রায় দিলে। বাঘিনীর সঙ্গে তিন তিনটে বাচ্চা! কোন একজন মানুষ এই হাপরটিকে ডাঙায় টেনে তুলেছিল মাছ চুরির আশায়। তারপর বাঘিনীর সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে চোর। বাঘিনী তখন তার শিশু সন্তানদের নিয়ে যথাসাধ্য মৎস্যভোজন করে ভরা পেটে ফিরে গেছে আস্তানায়।

ময়নার ধারণা কিন্তু একটু আলাদা রকমের। তরুণী মায়ের সঙ্গে দশ মাস বয়সের তিনটে বাচ্চা—দুটি কন্যা ও সবেধন নীলমণি পুত্র। নিশ্চয় রহমানই হাপর তুলে দিয়েছিল ডাঙ্গায়। হাপরের মাছ শেষ হলে আবার রহমানই সেই শূন্য হাপরটিকে জলে রেখে দিয়েছে যথাস্থানে। দ্বিতীয় হাপরটি নিয়ে মনের সুখে ওরা মৎস্য ভোজন করছিল। গাছের ডালে বসে রহমান জেলেডিঙিটাকে আসতে দেখে ওদের নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে নিরাপদ কোন আস্তানায়। তাড়াতাড়িতে হাপরটিকে যথাস্থানে রেখে যেতে পারেনি রহমান।

বাঘিনীর সাথে মানুষের এহেন সম্পর্ক সম্ভব হতে পারে ময়নাও কল্পনা করেনি তা। কিন্তু পায়ের ছাপগুলি যে রহমানের এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রহমানের ডান পায়ের একটা আঙুল অসম্ভব রকমের ছোট। আর পায়ের ছাপগুলি একই সময়ের। দু এক ঘণ্টার বেশী আগুপাছু হবে না।

রহমানের কথাও ভাবি। অদ্ভুত মানুষ বটে। বাঘিনীর মায়ায় সব ছাড়লে সে। লোকালয়ের বাইরে বন্য পশুর সঙ্গে পশুর মতই জীবন যাপন করছে। অথচ ওর ঘরে স্ত্রী পুত্র আছে, জমিজমা আছে। সব ছেড়ে গেল সে। বাঘিনী তার জরুর মতই বলেছিল রহমান। অবাক মানুষ বটে।

॥ চার ॥

কালের চাকা ঘুরেই চলেছে। শবরীর প্রতীক্ষাও আমার শেষ হতে চলেছে। এমন সময় এলো আর এক খবর—খবরের মত খবর এবার।

ক্ষেতের ধান খামারে উঠেছে। ধূ ধূ করছে বহুদূর বিস্তৃত বিল! আর সেই দুঃসহ শূন্যতার মাঝে এখানে ওখানে ছিটে ফোঁটা সবুজ—কোথাও বা কাঁটা উচানো কেয়ার ঝাড়, কোথাও বা গেঁয়ো-কেওড়ার একফালি জঙ্গল। আকারে হয়তো তেমন বড় নয়, কিন্তু গহনতায় এই খণ্ড খণ্ড জঙ্গলগুলি হিংস্র শ্বাপদের দুর্ভেদ্য দুর্গ বটে। বিলের বুক চিরে চলেছে অগুণতি খাল। বর্ষায় বান ডাকে ওদের বুকে, উপচে ওঠে ভরা যৌবনের জোয়াব। গবমেব দিনে ওরা দেউলে হয়ে যায় আবার! কেউ বা ধুঁকতে থাকে চরম রিক্তভাব আশঙ্কায়।

গরম তখনও অগস্ত্য মুনির মত গঙ্গা শুষে নেয়নি। চাষী মেয়েরা ধান কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে। ছেলেরা ছুটে বেড়াচ্ছে খরগোস, ইঁদুর কি শেয়াল ছানার গর্ত খুঁজে। কেওড়া গাছের আগডালে আছে বাবুই পাখির বাসা। রাখাল ছেলে মুঠো মুঠো কেওড়া মুখে ভরে আর বাবুইয়ের শিল্পকর্মের তারিফ করে তার মাথা দুলিয়ে। গাঙ শালিকের বাচ্চার সন্ধানে গেঁয়ো গাছে চড়ে বসেছে কেউ।

ধানের মরশুমে টিয়া পাখি এসেছিল ঝাঁক বেঁধে। দলছাড়া তাদের দু একটি এখনও সংসার পেতে আছে গেঁয়োর জঙ্গলে। দুঃসাহসী কোন রাখাল ছেলে লম্বা কাঠির আগায় আঠা লাগিয়ে হানা দিয়েছে সেখানেও।

বেদে-বেদেনী ঐ জঙ্গলের কিনারায় বসে বাঁশীতে ফুঁ দেয় সকাল-সন্ধ্যে।- ঢাকনি বন্ধ করা চুবড়ি ভরে ধরে আনে নানা জাতের সাপ। কেউটে, গোখরো, ভীমরাজ, দুধরাজ বা বড় বড় ময়াল সাপও রেহাই পায় না। কাছারির কাছাকাছি কোথাও আস্তানা গড়েছে ওরা। সন্ধ্যেবেলা বেদেনী তার শিকার পুড়িয়ে সাপের কোর্মা কাবাব তৈরী করে।

গরু, মোষ, ছাগল-ঘোড়া সবাই ছাড়া পেয়েছে এখন। খুশিমত চরে বেড়ায় ওরা দৃষ্টিজোড়া বিলের এলাকায়।

ভর দুপুরে মেঠো ঘোড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে হয়তো পালখানেক ছেলে। যে কটি ধরা পড়লো তাদের পিঠে চেপেই কয়েক দফা বাজির দৌড় হলো বিকেলে।

মোষের পিঠে সওয়ার হয়ে খাল পেরিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরবে ওরা গোধন সঙ্গে নিয়ে।

ভারী কর্মব্যস্ত ওদের দিন। বৈচিত্র্যে ভরা তার প্রতিটি মুহূর্ত! ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে বেরুলো হয়তো বিষধর এক সাপ। গাছের কোটরে পাখির ছানার বদলে পাওনা হলো সাপের ছোবল। বন-বেড়ালের বাচ্চাকে বন্দী করতে যেয়ে আঁচড়-কামড়ের দাগ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে কেউ। যারা খেপলা জাল নিয়ে ভর দুপুরে মাছ ধরছিল খালে, মেছো ভূত তাদের পেছু নিয়েছিল নাকি সন্ধ্যেবেলায় যখন খারা ভর্তি মাছ নিয়ে বাড়ির পথ ধরলে ওরা—মেছো ভূত তখন নাকি সুরে বললে, 'আঁমারে ভাঁগ দিঁয়ে যাঁ'।

—কিন্তু এসব ব্যাপারে ওরা অভ্যস্ত। মেছোভূত তার পেত্নীর পছন্দমত মাছ পেলে ঘাড় মটকায় না আর। বরং খুশি হয়ে পরের দিনে জলের মাছকে তাড়িয়ে এনে জালের ফাঁসে আটক করে।

সাপ ওদেরকে মারে, কিন্তু সাপকেও তো ওরা ছেড়ে কথা কয় না। বন বেড়ালের বেলাতেও তাই। শেয়ালেরাও রুখে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে। কিন্তু কোন লড়ায়েই পেছপা নয় এই বালখিল্য লড়ুয়েরা।

অবিশ্যি সেদিন ওরা ভয় পেয়েছিল সত্যি। প্রতিপক্ষ যে শেয়াল নয়, দস্তুরমত বড় শেয়াল।

সন্ধ্যে হতে চলেছে। গোধন নিয়ে ঘরে ফিরবার জন্যে সর্দার রাখাল হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। গেঁয়োর জঙ্গলের কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল ছাগলের পাল। বাঘরোলের মত চেহারার দুটি জানোয়ার হঠাৎ এসে হানা দিলে ওদের উপর। ঘাড়ের উপর কামড় বসিয়ে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা ছাগল দুটিকে।

রাখাল ছেলেরা হৈ হৈ করে পাঁচন উচিয়ে ছুটলো। ভয় পেয়ে সেই শিকারী জানোয়ার জোড়া মুখের শিকার ফেলে সুড়সুড় করে সেঁধিয়ে গেল তাদের দুর্গম আস্তানায়।

আহত ছাগল দুটি মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। পালের বাকী ছাগলেরা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল এই কাণ্ডটা।

বাঘিনীর ক্রুদ্ধ গোঙারানি শুনে হুঁস হলো ওদের এতক্ষণে। হুড়মুড় করে ছুটে পালালো ওরা।

ছেলের দল কিন্তু থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো তক্ষুণি। গেঁয়োর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো বাঘিনী। একবার মুখ উচিয়ে চেয়ে দেখল রাখালদেরকে। তারপর সেই পরিত্যক্ত শিকার দুটিকে সে মুখে তুলে নিয়ে গেল নিঃসঙ্কোচে।

'বড় শেয়াল বেরিয়েছে রে—বড় শেয়াল,' রাখালের দলে আর্তনাদ ওঠে। দে ছুট—দে ছুট।

কাছারিতেও খবর ছুটলো অমনি! কিন্তু আমার কাছে সেই খবর পৌঁছে দিলে আখতার গাজি।

আখতারের ঘোড়া রোগ আছে। অর্থাৎ ভাল দৌড়বাজ ঘোড়া দেখলেই আখতার তা কিনবেই। সম্প্রতি হরিহর ছত্রের মেলা থেকে মস্ত বড় এক ঘোড়া কিনেছে সে। দুধের মত সাদা ধবধবে তার দেহের রঙ, কপালে কালো চাঁদি—ভারি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়া। কিন্তু

এই সদ্য কেনা ঘোড়াটিকে নিয়ে আখতারের মুস্কিলও বড় কম নয়। অশ্বরাজ স্বয়ং রাজবংশ জাত, অতএব রাজা-রাজড়া ছাড়া অন্য কাউকে পিঠে বইতে সে বেজায় নারাজ। এমনকি স্বয়ং আখতার-কেও সে আমল দেয়নি। অনেক মেহনত করেও ওকে বাগ মানানো সম্ভব হলো না দেখে শেষ পর্যন্ত ওর অশ্বরাজের বিরুদ্ধে সদরে নালিশ রুজু করলো আখতার।

আখতারের অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো যথাকালে। সদরের ভাল ভাল ঘোড়সওয়ারদেরকেও হার মানতে হলো। কেউ কেউ পিঠের উপর চড়ে বসলে বটে। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পপাত ধরণীতলে।

অশ্বরাজ দুষ্ট বুদ্ধিতে এমনি দড় যে আখতারের মত দুঁধে সওয়ারকেও চিৎপাত করতে সাত মিনিটের বেশি সময় নেয়নি।

অথচ এমনি মজা যে ওরই পিঠে চেপে বাবা দশ ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে। আখতারের মনে তাই অমন বিশ্বাস জন্মেছে যে তার ঘোড়াটি রাজবংশজাত। এ হেন ঘোড়া বিকিয়ে দেবে সে কোন প্রাণে।

অমন অশ্বরাজের পিঠে সস্তাদরের পুরানো জিন মানায় না মোটেও। আখতার তাই দামী জিন-লাগাম কিনতে এসেছে শহরে।

খোকাবাবুর নজর আছে বলেই আখতার এসে ধরে বসলে আমাকে কলেজে যাবার মুখে। বাবা ওকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছিলেন যেন বাঘিনীর কথা আমার কানে না তোলে সে। কর্তার হুকুম অমান্য করবে এহেন বেকুব প্রজা সে নয়। তাই বাঘিনীর সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই আখতার জিভ কামড়ায়। কর্তাবাবুর কড়া হুকুম বাঘিনীর কথা কিছু বলবেনা খোকাবাবুকে। নইলে খবর তো অনেক আছে বলার মত। কিলবিল করে কথাগুলো ওর পেট থেকে কণ্ঠ অবধি উঠে আসছে বাজীর ঘোড়ার দৌড়ের বেগ নিয়ে।

পাছে সেই অবাধ্য বাণী বলগা ছাড়া ঘোড়ার মত বাগ না মানে, এই ভয়েই বোধ হয় আখতার তার ওষ্ঠ দুটিকে দাঁতে চেপে ধরে।

বুঝলুম, আখতার এখন বড় হুঁসিয়ার। অতএব ওর সেই উচ্চৈঃশ্রবা হয় প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা শুরু করি আবার।

এবার আখতারের কথা ফোটে। পঞ্চমুখে অশ্বপুরাণ কীর্তন করে আখতার।

জিন-লাগাম সবই হলো। আখতার তখন খুশিতে ডগমগ। খই ফুটছে যেন মুখে। ওকে সঙ্গে নিয়ে চলি বন্দুকের দোকানে। হরেক রকমের বন্দুক দেখে আর তাদের সংহার শক্তির গুণপনা শুনে আখতারের মন বিমুখ হয়ে ওঠে ওর সেকেলে ধরনের একনলী বন্দুকটার উপরে।

'একনলীতে কি আর বাঘ মারা চলে। দোনলা দরকার অন্ততঃ।'

'কিন্তু ওডা তো মানুষ মারতি চায় না। ওডা তো ছাগল খেকো'—আখতার শুরু করলে সবে।

বাঘিনীর সম্পর্কে অনেক কথাই বললে সে গড়গড় করে। তার পর হঠাৎ এক সময় যেন আঁৎকে উঠলে আখতার, 'হেই-যাঃ! কর্তাবাবু যে মানা করে দিইছিল কথা বলতি।'

হ্যাঁ, ঘোড়ার মত ঘোড়া কিনেছে বটে আখতার। প্রমাণ মানুষের মাথা সমান উঁচু ঘোড়া। জিনের রেকাবিতে পা দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে ওর পিঠে চড়ে বসতে না পারলেই ক্ষেপে যায় ঘোড়াটা। সওয়ার রেকাবিতে পা রাখলেই ঘোড়াটি তার সুমুখের দুপা উঁচিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে। পরক্ষণেই সুমুখের পা দুটি মাটিতে নামিয়ে পিছনের পা দুটি একবার সজোরে আকাশের দিকে ছুঁড়বে। ব্যস্, পিছনের পদযুগল মাটি ছুঁতেই যা দেরী, তারপর দে ছুট।

পাকা ঘোড়সওয়ারদের কেউই অশ্বরাজের এই অভ্যাসটার কথা

আমল দেননি, ফলে অশ্ববরও ওদেরকে নিতান্ত কাঁচা ঠাহর করে পিঠে বইতে রাজী নয়।

দুদিন ধরে ছোলা আর কলাইয়ের সাথে গুড় মেখে নিজের হাতে খাওয়ালুম ওকে। একশ বিস্কুট, বিশ পঁচিশটা চকোলেট আর কাপ দশেক কফিও খেলে সে। নবাব বটে আখতারের ঘোড়া।

পরের দিনে প্রাতরাশের সময় উৎরে যাচ্ছে দেখেও আমি চুপ করে থাকি। অশ্ববর কিন্তু অস্থির হয়ে ওঠে রীতিমতো। ঘন ঘন হ্রেষাধ্বনি করে সচকিত করে তোলে সবাইকে। চায়ের নেশার চাইতেও বোধ হয় চকোলেটের নেশা আরও বেশি সাংঘাতিক।

প্রাতরাশের পর কিন্তু বেশ খোস মেজাজী বলে মনে হলো ওকে। জিন লাগাম পরিয়ে নিজেও তৈরী হয়ে নিলুম। কিন্তু রেকাবিতে পা দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে ওর পিঠের উপর চড়ে বসাই দায়। মাটিতে কটি চকোলেট ছড়িয়ে দিলুম। আর সেই চকোলেট-গুলি কুড়িয়ে নেবার সুযোগে আমিও ওর পিঠের উপর সওয়ার হয়ে বসি। অভ্যাস বশে আমার বাহনটি তখন সুমুখের পাদুটি উঁচিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে বটে। তবে তখন আমি নিশ্চিন্ত। কাঁটা বুটের ধাক্কা খেতেই শুরু হলো দৌড়। লাগাম কষে সদর রাস্তা থেকে আমি ওকে নামিয়ে নিয়ে এলুম বিলে। ঘোড়া ছু টে চলেছে ওর খুশিমত। রাশ আলগা করে দিয়েছি আমি।

তেপান্তরের বিল পেরিয়ে ভোঁড় টপকে খাল ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত আখতারের বাড়ির দরজায় এসেই দাঁড়ালো ওর ঘোড়া। গম্ভীর হ্রেষাধ্বনি শুনে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আখতার।

দেখতে দেখতে ছোট্ট গাঁ খানি যেন ভেঙে পড়ল আখতারের বাড়িতে। মুসলমান প্রধান গ্রাম। ঘরের বিবিজানেরাও দেখি ছুটে এসেছেন বোরখা ছেড়ে। এতখানি আমি নিজেও কিন্তু আশা করিনি। আগে আরো একবার এসেছি এই গাঁয়ে। অভ্যর্থনার

কোন কসুর হয়নি সেবারেও। কিন্তু বিবিজানদের কোন ভূমিকা ছিলনা সেখানে।

ব্যাপারটা তাই বুঝে উঠতে কিছু সময় লাগলো। তবে কথাটা খুবই সহজ। বাঘিনীর উৎপাতে বিলের গরু-মোষ লেজ উঁচিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। রাখাল ছেলে মাঠে বেরুতে নারাজ। হালের বলদ বা দুধের গাই নজরাণা দিয়েও নিস্তার নেই। বাঘিনী এসে বাড়ি চড়াও হচ্ছে মাঝ-রাতে। ময়না শিকারী গেছে সরকারী কূপে মাইনে খাটতে। তবে আর্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে ময়না এই বলে যে, খোকাবাবু এসে পড়লেই মুস্কিল আসান হবে ওদের। নইলে ঐ তাজু কি হাসানের সাধ্যে কুলোবে না—বাঘিনীর কাছে ওরা নিতান্তই নাবালক।

আমাকে তাই মুস্কিল আসান মনে করেই মেয়েরা এসেছেন তাঁদের মনের বেদনা জানাতে। একে তো আগামী দিনের আমি তাদের হুঁজুর, তায় আবার বনবিবির বরপুত্তুর। অতএব আমি যে ওঁদের পরম আপন জন।

ঘটনা ঘটেছে পরশু দিন। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে হালের গরু মেরেছে বাঘিনী কেয়াতলীর বিলে।

খবর শুনে বাবা এসেছিলেন কাছারি থেকে। ভোর না হতেই ঘেরাও করেছিলেন বাঘিনীর আস্তানা। কিন্তু বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে সরে পড়েছে রাতের বেলাতেই।

মাচান বেধে শিকারীরা ওৎ পেতে ছিল ওখানে গত রাত্রে। আহার্যের সঞ্চয় তেমন কিছু ছিলনা। তবু সঞ্চিত আহারের কাছে আসাটাই তার চিরকালের অভ্যেস।

অবিশ্যি বাঘিনী আসেনি।

অনেক গল্প শুনলুম ওদের কাছে। অতিরঞ্জনের বাড়তি কথা গুলো বাদ দিলেও বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। সেরা সত্যিটুকু এই যে, বাঘিনী এখন আর দিনের আলোতে বেরুতে নাচার নয়।

তাছাড়া শশীকলার মত দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে ওর বাচ্চারা। দু একটা ছাগলকে ওরা অনায়াসেই শিকার করতে পারে। বাছুরকে আক্রমণ করতেও ভয় পায়না। মায়ে-পোয়ে মিলে, একটা হৃষ্টপুষ্ট বলদকে ভোজন করে অবশিষ্ট আর তেমন কিছু রাখেনি।

গাঁয়ের মানুষেব মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ এখন সুস্পষ্ট। ঐ বিলেই আছে গৃহপালিতদের অঢেল খাবার। গাঁয়ের গরু-মোষ বা ছাগল-ভেড়া বর্ষা অবধি বিলেই চরে বেড়াবে। তবু গেরস্ত আজ ওদের গোয়াল ছাড়া করতে ভয় পাচ্ছে।

কিন্তু বাড়িতে বেঁধে রেখে খাওয়াবে এমন সঞ্চয় নেই তো কারো। তা ছাড়া এ যে এক সর্বনেশে সাবধানতা। ভোজের লোভ দেখিয়ে বাঘিনীকে বাড়িতে নেমন্তন্ন পাঠানো যেন।

বাঘিনীরও তো আহারের প্রয়োজন আমাদের কারো চাইতে কম নয়। তা ছাড়া তার ক্ষুধাটাও যেমন বড়, আহারের পরিমাণটাও তেমনি একটু বেশি। অতএব গরু কি মোষ তার চাই ক্ষুধা মেটাতে। আর গরু-মোষ মারা পড়লেই তাকে মারা সম্ভব হতে পারে। নইলে তার হদিশ্ পাচ্চি কোথায়!

ওরা আমার শক্তিতে এখন আস্থা করতে শিখেছে। তাই ওদের একমাত্র সম্পদ ঐ গোধন খোয়া যেতে পারে জেনেও ওরা আমার কথাকেই মেনে নিলে।

সারা দুপুর ধরে অনেকখানি পথ পরিক্রমা করে দুপুর শেষে বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। তেপান্তরের বিল পাড়ি দিচ্ছি যেন। কানে এলো বাঁশের বাঁশির মিঠে সুর। গেঁয়ো গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে রাখাল ছেলে। বেশ ভাল লাগলো।

হাত পা ছেড়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক ওখানেই। আখতাবের গাঁ তখন একক্রোশ দূরে। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে একটা খাল। খালের গা বেয়ে বেশ বড় একফালি কেঁদ-গেঁয়োর জঙ্গল। ঐ জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়েছে রাখালদের গাঁ খানি।

ঘোড়া থেকে নেমেই কিন্তু মনের উপর একটা অশুভ ছায়াপাত লক্ষ্য করলুম।

কেন এমন হয় কি জানি! তবে এই অশুভ ছায়া যখনই আসে তখনই ঘটে ঘটনা।

আকাশের রোদ হঠাৎ নিভে গেল। জ্বলন্ত সূর্য ঢাকা পড়ল একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে।

দশবারোটা গেঁয়ো গাছ মাত্র বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া, ঝিরঝিরে হাওয়া। রাখালেরা ঐ জায়গাটুকুকে ঝকঝকে তকতকে করে নিকিয়ে রেখেছে যেন। ওখানেই ওরা আড্ডা গাড়ে প্রতি দুপুরে। মাঠের গরু নিশ্চিন্তমনে চরে বেড়ায় মাঠে।

কিন্তু এই কুঞ্জবনের গাঁ ঘেঁষে আছে কেয়ার ঝোপ। সারিবন্দী ভাবে একটির পর একটি ঝোপ এগিয়ে চলেছে অদূরের ঐ বিদঘুটে বড় জঙ্গলের ফালিটাকে লক্ষ্য করে। দুটি ঝোপের মধ্যে বিশ-তিরিশ হাতের ব্যবধান বড় জোর। মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে একটা অলক্ষুনে অনুমানে

খাল পারের ঐ একফালি জঙ্গলে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে। ওখান থেকে কেয়ার ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে অনায়াসেই সে এগিয়ে আসতে পারে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। তারপর এই কুঞ্জবনের কেন্দ্র থেকে দু-একটি রাখালকে অনায়াসেই সে মুখে তুলে নিয়ে রাত্রির ভোজ সেরে নিতে পারে খুবই সহজে।

একমাত্র ভরসা কেয়াবনের দুপাশেই গবাদি পশু চরে বেড়াচ্ছে। ওরা পূর্বাহ্ণেই হুঁসিয়ারি জানাবে। তা ছাড়া বাঘিনী এখনও মানুষ খেকো হয়ে ওঠেনি। গোধন পর্বের পাতা শেষ করতে আরো কিছুটা সময় লাগবে বলেই মনে হয়।

আখতার আর তমিজুদ্দিনের ক্ষিদে পেয়েছে খুব। সকালের

পান্তা তো এইবেলা অবধি পেটে থাকবার কথা নয়। আমারও ক্ষিদে পেয়েছে। তবে আমার সঙ্গে আখতারের গাঁ থেকে দেওয়া খাবার আছে—এক ফ্লাস্ক গরম দুধ, এক ভাঁড় দই, এক ছড়া কলা আর গণ্ডা কয়েক নারকেলের নাড়ু।

পরিচয় পেয়ে রাখালেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে এদিকে। আমি যে ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারি বা এমন আপন জনের মত আলাপ করতে পারি একথা ওরা ভাবেনি কোনদিন।

আখতার আর তমিজুদ্দিনকে একরকম জোর করেই বাড়ি পাঠালুম। রাখালেরা খুশি মনে স্বীকার করলে সন্ধ্যের আগেই ওরা আমাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দেবে আখতারের বাড়িতে। তারপরও দশ দাঁড়ের ছিপ নিয়ে কাছারিতে পৌঁছে যেতে পারবো রাত নটার মধ্যে।

রাখাল ছেলেদের মনে আজ সঙ্কোচের বালাই নেই। ওদের একজন তার সদ্য ধরা শালিক ছানাটাই আমাকে দিয়ে বসলে। আর একজন ছুটলো কেয়ার ঝাড় থেকে গিনিপিগের বাচ্চা ধরে আনতে। কেউটে সাপের তাড়া খেয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে এলো আবার তখুনি। অন্যদিন হলে ওরা দল বেঁধে ছুটে যেতো কেউটে সাপকে শায়েস্তা করতে। আজ কিন্তু এক পা নড়তেও ওরা রাজী নয়। বাঁশীওয়ালা রাখালও তার নোতুন বাঁশীটাই উপহার দিলে আমায়।

আমাকে ঘিরে বসেছে ওরা। বড় শেয়ালের গল্প বলতে হবে ওদেরকে। আধ নেংটা কেউ, কারো পরনে একখণ্ড বিবর্ণ গামছা। কারো বা কাঁকালের পাঁচ হাতি কাদামাখা কাপড় পাগ হয়ে শোভা পাচ্ছে মাথায়। দেহ এদিকে দস্তুরমত দিগম্বর। রুক্ষ আলুথালু কেশ কারো, কারো আবার কপাল গড়িয়ে তেল চোঁয়াচ্ছে। ভস্মের পরিবর্তে অঙ্গভূষণ হয়েছে খালের আঠালো কাদা। এই ভোলানাথের দলে মধ্যমণি হয়ে শোভা পাচ্ছি আমি—বড্ড বেমানান

লাগছে আমার ঘোড়সওয়ারের ব্রীচ, মিলিটারি শার্ট, কাঁটাওয়ালা বুট আর ফেল্ট ক্যাপ।

খেতে খেতে গল্প বলছিলুম আমি। ওরাও কোঁচড়ের চিড়ে চিবোয় কেউ কেউ। গল্প শুনতে শুনতে কখন এক সময় সশব্দ চর্বণ থেমে গেছে। মুখের হাঁ-গুলো বড় হয়ে উঠেছে। সেই হাঁ-করা মুখগুলোর মধ্যে টপাটপ দুচারটে নাড়ু ছুড়ে দিতেই ওরা প্রতিবাদ করে, 'ধ্যেৎ'।

'বড় শেয়াল বুঝি নাড়ু খাতি ভালবাসে?' জিজ্ঞেস করলে এক ছোকরা।

'দ্যুৎ, নাড়ু খায় নাকি। ওরা গোস্ত খায়।'—জবাব দিলে আর একজন।

'আসুক না আজ গোস্ত খাতি। পাঁচন-পেটা করে ছাড়াবো না' —ভেঙচি কেটে উঠলে আর এক ছোকরা।

হো হো হেসে উঠল সবাই।

ছেলেটি লাফিয়ে উঠে শূন্যে তার পাঁচন আস্ফালন করে হঠাৎ যেন সুমুখে ভূত দেখেই পেছিয়ে এলো ভয়ে।

বিলের গরু-মোষও হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠে তুমুল লড়াই শুরু করে দিলে।

ছাগল, বাছুর আর গাই গরুর দল চীৎকার করে ছুটে এলো আমাদের দিকে।

আখতারের সেই একনলী বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি!

লম্বা শিঙওয়ালা ষাঁড়েরা এমন প্রবল বিক্রমে লড়াই করছে কার সাথে! ওদের ক্রুদ্ধ কোলাহলে দুপুর শেষের নিরালা বিল মুখর হয়ে উঠেছে।

ভাল করে কিছু বুঝতে না বুঝতেই কানে এলো কার গম্ভীর

গর্জন। গোঁয়োর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো বাঘিনী। আর একবার ক্রুদ্ধ গর্জনে মাটি কাঁপিয়ে তুলে আক্রমণের ভঙ্গীতে সে তেড়ে এলো কিছুটা দূর পর্যন্ত।

যুধ্যমান বলদের দল আগেই যুদ্ধ ত্যাগ করে পেছু হটে এসেছিল কয়েক পা। বাঘিনীকে তেড়ে আসতে দেখে ব্যূহ রচনা করে আবার ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে।

এতক্ষণে দেখতে পেলুম বাঘিনীর তুটি বাচ্চাকে। ষণ্ডকুল তাদের শিঙের গুঁতোয় আচ্ছা শায়েস্তা করে দিয়েছে ওই তুই শিক্ষানবীশ তরুণ শিকারীকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে ওদের মায়ের কাছে।

ওদেব জননী কিন্তু তাঁব এই অবাধ্য সন্তান তুটির অকালপক্কতায় মোটেই খুশি হতে পারেন নি। বেশ জোর তুটি চপেটাঘাত করলেন তিনি ওদের গালে পিঠে। একে তো শত্রু লাঞ্ছিত তায় আবার জননীর কঠিন তিরস্কার। কিশোর কুমারদ্বয় কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে ফেললে প্রথমটা। তাবপর গুঁড়ি মেরে ঢুকলো যেয়ে মায়ের পেটেব তলে। বাচ্চা তুটিকে এড়িয়ে বাঘিনী আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত।

বাচ্চা তুটি বোধ হয় জননীর আদেশক্রমে খুঁড়িয়ে চললো আস্তনার দিকে। ওরা তুজনায় গোঁয়োর জঙ্গলে ঢুকে পড়তেই একছুটে বেরিয়ে এলো বাঘিনীর তৃতীয় বাচ্চাটি। মার কাছেই আসছিল সে। বাঘিনী মুখ ফিরিয়ে ধমক দিলে বোধহয়। বাচ্চাটি আবার একছুটে পালিয়ে গেল।

বাঘিনী বলদবংশের এই ঔদ্ধত্যে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে বৈকি। অর্ধচন্দ্রাকাবের ব্যূহ বচনা কবে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক ডজন বলদ বা ষণ্ড। ব্যূহমুখে আবার চার পাঁচটি পুরুষ মোষ। লম্বা শিঙওয়ালা শত্রুরা শিঙ নেড়ে যেন বাঘিনীকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।

বাঘিনীও বোকা নয়। সুতরাং সাত পাঁচ ভাবতে হচ্ছে ওকে। আক্রমণ করা বিপজ্জনক। আবার ভক্ষ্য জীবকুলের হুঙ্কারে বা হুমকিতে পালিয়ে যাবে ভক্ষক! বদলকুলের চোখ রাঙানি দেখে পশ্চাদপসরণ করবে বাঘিনী! সুন্দরবনের মহামহিম মহারাণী সে, ছুনিয়ার পশুকুলে সে চির সম্মানিতা। কোন লাজে আজ লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে সে।

বাঘিনী গুঁড়ি মেরে বসলো। সম্ভবতঃ সে আর একটি কথা ভাবছে। গরু-ছাগলের দল এই গেঁয়োর কুঞ্জে আশ্রয় নিয়েছে কেন! ওদের রাখালেরা বাঘিনীকে ফাঁদে ফেলবার মতলব করে হয়তো ওখানেই লুকিয়ে আছে।

আমার নির্দেশ মতো রাখালেরা আগেই গাছে চড়ে বসেছিল। বাঘিনী ঘন ঘন এদিকে চোখ তুলে চাইছে দেখে ইঙ্গিতে আমি রাখালদেরকে হুঁসিয়ার হতে বল্লুম। কেউ যেন শব্দ না করে। কেউ যেন ঘন পাতার আড়াল থেকে বাঘিনীর চোখের সুমুখে আলগা হয়ে না পড়ে।

বাঘিনী আবার একবার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে লেজের ঝাপটে তার আক্রমণের অভাস দেয়। প্রতিপক্ষ এই গর্জনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বেশ বোঝা গেল স্নায়ুযুদ্ধে ওদের পরাজয় আসন্ন। গাছের তলে এসে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কেউ কেউ পুচ্ছ উঁচিয়ে প্রাণপণ দৌড় শুরু করলে। অন্যেরা এমন হুটোপুটি শুরু করে দিলে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ মনে হলোনা।

ময়না সঙ্গে থাকলে কেয়ার ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে বাঘিনীর দিকে এগিয়ে যেতুম। একনলী নিয়ে নিঃসঙ্গ অমন চেষ্টা করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। তাই অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া নান্য পন্থা।

বাঘিনী আবার গর্জন করে—আবার—আবার। আমাদের গাছতলা শূন্য হয়ে গেছে ততক্ষণে। যোদ্ধা বলদ-মোষের দল পেছু

হটে আসছে আমাদের দিকে। তবে ওরা তখনও ব্যূহ ভাঙেনি এই যা রক্ষে।

বাঘিনীও এগিয়ে এসেছে পায়ে পায়ে। বন্দুকের রেঞ্জ থেকে সে এখনও অনেকখানি দূরে।

কি সুশ্রী তরুণী মা। সম্ভবতঃ প্রথম মাতৃত্ব। গায়ের চামড়ার উপর দিনের পড়ন্ত রোদ যেন সোনার আলো ঠিকরে দিচ্ছে।

বলদকুল আর মোষেরা পেছু হটতে হটতে আমাদের গাছের তলে এসে হাজির হলো। বাঘিনী ফিরে চললো তার আস্তানায়।

বাঘিনীর শিশুরা ভোজের লোভে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আবার। শূন্য হাতে মাকে ফিরে আসতে দেখে সুড় সুড় করে ওরা সেঁধিয়ে পড়ল জঙ্গলে।

বাঘিনীও অদৃশ্য হলো অচিরে।

একটি মাত্র বলদকে আমার হেপাজতে রেখে রাখালদেরকে বল্লুম তাদের গোধন নিয়ে ঘুর পথে ফিরে যেতে। ওরা ভয় পায়। ওরা বরং এই গাছের ডালে বসে রাত কাটাবে আমার সঙ্গে। কিন্তু আমাকে একা ফেলে ওরা ঘরে যেতে নারাজ।

উপায়ান্তর না পেয়ে গাছের গায়ে একটি বলদকে বেঁধে রেখে গাঁয়ের পানে ফিরে চললুম আমরা। বাঘিনীর জঙ্গলের পাশ দিয়েই খাল পেরিয়ে গাঁয়ের পথ। রাখালেরা ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু যূথের উপর বাঘিনী আক্রমণ চালাতে সাহসী হবে বলে আমার মনে হল না। তা ছাড়া আমরা এতগুলি মানুষ আছি সঙ্গে। আর একনলী হলেও বন্দুক তো বটে। রাখালেরা যদি ভয় না পায় এবং যূথবদ্ধ ভাব বজায় রাখতে পারে তা হলে বাঘিনীকে হত্যা করা খুব কঠিন হবে না।

গোধন নিয়ে এগিয়ে চলি আমরা, খাল পেরিয়ে নিরাপদে গাঁয়ে এসে হাজির হলুম।

সন্ধ্যার আঁধার তার মিশকালো উত্তরীয় দিয়ে ঢেকে দিলে গোটা বিলটাকে।

গাঁয়ের মোড়ল এগিয়ে এলো আমাকে অভ্যর্থনা করতে। আখতার আর তমিজুদ্দিনের ছেলেও এসেছে। আমাকে কাছারিতে নিয়ে যাবার জন্যে ঘাটে বাঁধা রয়েছে বিশ দাঁড়ের ছিপ। কিন্তু এমন অবস্থায় কাছারিতে ফিরে যাওয়া চলেনা। খুলে বললুম সব কথা। এমন সুযোগ আর হয়তো আসবে না।

মাচান বাঁধা সম্ভব নয় রাতে। তার দরকারও নেই। কিন্তু দোনলা বন্দুক চাই একটা, আর চাই একজন শিকারী সঙ্গী। আশপাশের গাঁয়ে দু একজনের গাদা বন্দুক আছে বটে। তবে তা দিয়ে কাজ চলবে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করে ওরা। অগত্যা ছিপ নিয়ে ছুটলো আখতার।

রাত তখন দশটা। আখতাব ফিরে এলো। বন্দুক আনেনি তবে সঙ্গে এনেছে কালীকে। কাছারির বন্দুক বাবা সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বাঘিনীর তল্লাসীতে বন ঘেরাও করবার দরকার হলে যথেষ্ট সংখ্যক বন্দুকের অভাব তো আছেই।

কালীকে পেয়ে উৎসাহের প্রাবল্যে দোনলা ছাড়াই যেতে চাই আমি। কালী কিন্তু মাথা চুলকায়। বলে—'রোসো তো দাদাভাই, সর্দারদের বাড়িটা একবার চক্কর দিয়ে আসি'—কালী পা বাড়ায়।

সঙ্গে যেতে চাই আমরা সকলে। কালী কিন্তু আমাকেই শুধু সঙ্গে নিল শেষ পর্যন্ত।

সর্দারদের বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। তবে ওদের গুপ্তধনের পরিমাণ যে কত তা কেউ জানেনা। বছর সাতেক আগে এক ঝড় বাদলের রাতে ডাকাত পড়েছিল সর্দার বাড়িতে। দু তিনটে গাদা বন্দুকে গুলি চালিয়েছিল ওরা ডাকাত তাড়াবার জন্যে। জন তিরিশেক পাকা লাঠিয়ালও ছিল। কিন্তু ডাকাতদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা তবু সম্ভব হয়নি। ডাকাতেরা মাটিতে পোঁতা টাকার কলসী অবিশ্যি উদ্ধার করতে পারেনি। তবে গৃহকর্তার ঘরেব

মাটির দেওয়ালের ফাঁক থেকে যে পরিমাণ গিনির টাকা পেয়েছিল তার দামই ছিল পঞ্চাশ হাজারের মত।

সেই থেকে সর্দার বাড়ির চেহারা ফিরে গেল। মাটির দেওয়ালের বদলে হলো ইটের গাঁথনি। বাড়ি আর খামার ঘিরে উঠলো উঁচু ইঁটের পাঁচিল। অবিশ্যি বালি জমাটের বদলে ইঁটের গাঁথুনির উপর কাদা লেপে সর্দার বাড়িটাকে ডাকাতের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল যেন।

অনেক পরিবর্তনের সাথে আর একটি পরিবর্তন হয়েছে বলেই কালীর ধারণা। সাবেকী আমলের গাদা বন্দুক দুটি এখনও আছে। তবে তার সঙ্গে একটি দোনলা বন্দুক আর একটি রিভলভারও যোগ হয়েছে।

সর্দার বাড়ির এই দুটি নোতুন আগ্নেয়াস্ত্রের কথা অবিশ্যি আর কেউ জানেনা।

সর্দার বাড়ির সিংদরজায় হাজির হবার আগেই খামারের পাহারাদার হাঁক ছাড়লে, 'কারা যাতিছ কও'। 'ভীম অর্জুন দুভাই যাতিছে, সর্দারের কাছে খবর লও।'—কালী ওর গলাটা একটু চড়িয়েই বললে কথাটা।

পাহারাদার কালীর গলা চেনে। তাই গলা নামিয়ে আমতা আমতা করে, 'মাঝ রাত কেন ওস্তাদ!'

'কাছারির হুকুমে জরিমানা আদায় করতি আইছি। খালি হাতে ফিরলি রক্ষে থাকবে না। তোর সর্দারের ঐ নতুন দোনলা আর রিভলভারের জোরে কি আর জমিদাররে ঠেকাতি পারবি!'

একে স্বয়ং কালী কপালী হাজির, তারপরে আবার কালীর মুখে এমনি এক উদ্ভট খবর। বুড়ো সর্দার লুঙি সামলাতে সামলাতে ছুটে এলো বটে তবে সিং দরজা খোলা হলো না। মোটা মোটা লোহার শিক বসানো দরজায়। পিছনে আর এক প্রস্থ

কাঠের কপাট। জানালার মত এই কপাট খুলেই কথাবার্তা চালানো যায়। দরজা খুলবার দরকার পড়ে না।

আমার পরিচয় পেয়ে বুড়ো সর্দার মিনিত করে, 'আল্‌লার দোহাই হুজুর, রাতি দরজা খুলতি হুকুম করো না।'

দোনলা বন্দুকের অস্তিত্ব বুড়ো স্বীকার করতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত কালী মারমুখো হয়ে উঠতেই ওমর সর্দার ছুটলো অন্দর মহলে। সম্ভবতঃ পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে সলা পরমার্শ করে ফিরে এলো বুড়ো।

হ্যাঁ টোটা বন্দুক সে দেবে। তবে কালী সর্দার কথা দিক যে ওমর সেখের বাড়ির উপর নজর নেই তার।

কালী হাসে, 'বাঘিনীরে ছেড়ে তোমার মত বুড়ো হাড়ের উপর নজর দেবো কি লাগি কও।'

বুড়ো ওমর হি হি করে হাসতে থাকে।

বন্দুক পেলুম—দামী দোনলা বন্দুক, বন্দুকের সাথে বুলেটও। মনটা নেচে ওঠে আনন্দে পেখম মেলে ধরা ময়ূরের মত।

বুড়ো ওমরকে বলি, 'এবার যদি কালী সর্দার তার কথা না রাখে।'

একগাল হেসে সে জবাব দেয়, 'পৃথিবীটা উল্টো হতি পারে হুজুর, কিন্তু কালী সর্দারের কথা উলটোয় না। হাজার হলিও বিশ কোশ এলাকায় সর্দারি করে কালী।' তারপর হাতছানি দিয়ে আমাকে কাছে ডেকে বুড়ো সর্দার ফিস ফিস করে বলে, 'আমার বাড়ি একবার ডাকাত পড়িছিল কত্তা। অন্দরের মেয়েরা তো রব দিয়ে কাঁদতি লাগল। তখন ওদের সর্দার হেঁকে কয়ে দিল যেন অন্দরে কেউ না যায়। মা বোনদের উপর জুলুম করলি মাথা থাকবে না তার ধড়ে।'

একটু থেমে বুড়ো আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওডা ঐ কালী সর্দার কত্তা।'

দিনের বেলায় বাঘিনীর চার রেখেছি যেখানে বাকী রাতটুকুর জন্যে আমরা আস্তানা গাড়বো সেই গেঁয়োর কুঞ্জে।

বাঘিনীর নজর এড়াবার জন্যেই ঘোড়ায় চেপে অনেকখানি পথ ঘুরে আসতে হলো। আকাশের চাঁদ উঠি উঠি করেও যেন উঠছে না। নববধূর বাসরে যাবার মতই সলজ্জ সঙ্কুচিত পদক্ষেপ।

আস্তানার কাছাকাছি এসে ঘোড়া তিনটিকে ছেড়ে দিলুম আমরা। আমরা মানে, আমার সঙ্গে এসেছে কালী আর তমিজুদ্দিনের ছেলে ইউসুফ।

কিছুক্ষণের জন্যে ওৎ পেতে রইলুম।

গেঁয়োর কুঞ্জে তখন গাঢ় অন্ধকার। বলদকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা। বলদের ভাগ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হয়ে আর এগিয়ে যাওয়াও চলে না। কি জানি, বাঘিনী হয়তো কাছাকাছি কোথাও এসেছে। শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে হয়তো সে গোটা পরিবেশটাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে।

আবার বাঘিনী তাকে হয়তো ইতিমধ্যেই টেনে নিয়ে গেছে— তাও হতে পারে। বলদ যাতে দড়ি ছিঁড়ে না পালাতে পারে সেই জন্যেই তাকে বেঁধে রেখেছিলুম শক্ত দড়িতে। সুতরাং হত্যা করেও ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া বাঘিনীর পক্ষে সহজ ছিল না অবিশ্যি।

চাঁদ উঠলো অবশেষে। কেয়াব ঝোপ, কাঁটার ঝাড় আর গেঁয়োর কুঞ্জবন উঠলো হেসে। সহস্র চক্ষু মেলে মেলে ওরা যেন চেয়ে দেখছে চারদিকে। আমরাও চেয়ে দেখি।

হ্যাঁ, ঐ তো সেই বলদ নিশ্চিত মনে জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে।

হামাগুড়ি দিয়ে এসে হাজির হয়েছি গাছের তলে। মাচান বাঁধা সম্ভব হবে না জেনেই রাতের জন্যে গাছ বাছাই করে রেখেছিলুম— তিন জনের তিনটি আস্তানা। আকাশের ঐ একফালি চাঁদের মতই অর্ধবৃত্তাকারে আসন নিয়েছি আমরা দশ বারো হাত দূরে দূরে।

মুখের উপর থেকে বোরখা খসিয়ে ডাগর চোখে তাকিয়ে আছে

চাঁদ পৃথিবীর দিকে। আখতারের বাড়িতে বিবিজানদের কথা মনে পড়ে গেল।

গেঁয়ো গাছের ঘন পল্লবে চাঁদের আলো মাথা ঠুকে মরছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় যখন নাচন লাগে পাতায়, চাঁদের আলো তখন মাথা গলিয়ে নেমে আসে কুঞ্জবনের মাটিতে।

তেপান্তরের বিলের উপর যেন আলোর বন্যা। মনের মধ্যেও আমার তেমনি আনন্দ উপচে উঠছে যেন যৌবন অনন্যা। হঠাৎ কি জানি কি হলো মনের উপর দাগ কেটে দিলে এক অলক্ষুণে ছায়া। কি যেন অশুভ কিছু অপেক্ষায় আছে তারই এক অনিবার্য ইঙ্গিত।

শিকারীরা একে বলেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। হয়তো বা তাই। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে শিকারীকে রক্ষা করেছে বা আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে, এমন নজীরও আছে অসংখ্য।

ভাল করে যাচাই করে নিলুম নিজের অবস্থিতিকে। মাটি থেকে ছ' সাত হাত উঁচুতে আছি। বাঘিনী যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণ ঝাঁপ দেয়। যাকগে, আর কিছুটা উঁচুতে চড়ে বসিনা কেন।

গুলির শব্দ, বাঘিনীর পিলে চমকানো হাঁক—ব্যস্ততার মুখে যদি গাছ থেকে পড়ে যাই। মাচান নেই। ডালের উপর থেকে সেই ভয়ঙ্কর ডামাডোলের মধ্যে পা ফসকে পড়ে যাওয়া তেমন কিছু বিচিত্র নয়। ভাল করে এঁটে সেঁটে বসে পড়লুম।

মন থেকে তবুও সেই অশুভ ছায়াটাকে মুছে ফেলতে পারিনা কিছুতে। দূর হোকগে যাক, বন্দুক নিয়ে বসে এ হেন কাপুরুষোচিত চিন্তা। আগ্নেয়াস্ত্র যে আমাকে করেছে অপরাজেয়, আমি যে অরণ্য রাজ্যে ত্রাস।

চাঁদ ডুবে গেল, বুঝি কালো মেঘের আড়ালে। গাছের তলে এখন গাঢ় অন্ধকার। চারের বলদকেও দেখতে পাচ্ছিনা আর। গাছের ডালে নিঃশব্দ বসে আছি আমরা তিন নিশাচর।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ এক সময় বলদের ছুটোপুটি শুনে সজাগ হয়ে উঠি। না—বাঘের আবির্ভাব হলে অন্ধকারেও তা অভ্রান্ত ভাবেই ঠাহর করা যেতো। বিশেষ করে আজ আমরা চারের অনেক কাছাকাছি।

বলদ একবার ক্ষীণ কণ্ঠে ডেকে উঠলে মাত্র। বাঘিনীর সাড়া পেয়ে ভয়ে ওর গলা কাঠ হয়ে গেছে বুঝি ?

আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। কান খাড়া করে আছি। এই বুঝি একটা ছোট্ট চাপা গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে, এই বুঝি এক জোড়া জ্বলন্ত আগুনের টুকরো থেকে আলো ঠিকরে বেরুবে। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে পল গুণছি বসে। মাথার টুপিতে ঝুপ করে একটা কিছু পড়লো। টুপি বেয়ে সড় সড় করে চোখের সুমুখে নামছে যেন বাঘিনীর ডোরাকাটা লেজ। আবছা আলোতে ঝিকমিক করছে ওর গায়ের রঙ। আমার কোলের উপর নেমে পড়তে চায় যে। বন্দুক তুলতে যেয়ে নলের ডগাটা ওর গায়ে লাগলো টুক করে।

ফোঁ-ও-স—হাঁ করে গিলে খেতে চায় আমাকে। বিদ্যুৎগতিতে ওর গলা টিপে ধরি আমি দুহাতের শক্ত মুঠিতে। দেহের একটা মোচড় দিয়ে দুরন্ত অজগর তখন মুক্ত করে নিতে চায় নিজেকে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে গাছের ডাল থেকে ছিটকে পড়লাম আমি।

'দাদাভাই, আলো জ্বালো—অজগর'—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সর্পরাজের গলা টিপে ধরেই মটিতে পড়লুম আমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে।

মৃত্যুকে রুখে আছি আমি তার গলা টিপে ধরে। দেহমনের সকল সাহস, শক্তি আর জীবনের উন্মাদনা একত্রিত হয়ে ভর করেছে আমার হাতের দুটি মুঠিতে। লোহার বেড়ির মরণ আঁকড়ি বটে, তবে কাঁকড়ার কামড় সে নয়। তাই গাছের উঁচু ডাল থেকে মাটিতে পা দেবার আগে হাতের মুঠি পিছলে এলো কিছুটা।

আপাত দৃষ্টিতে অজগরের দেহ যতখানি মসৃণ বলে মনে হয় ঠিক

ততখানি পিচ্ছিল হলে হাত ফসকে যেতো হয়তো। জীবনে এই আমি প্রথম অনুভব করলুম যে ছাই মাখিয়ে আঁশ ছাড়ানো মাছের মতই রুক্ষ কর্কশ ওর দেহ।

তা ছাড়া ডাল থেকে ছিটকে পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ওর দেহটাকে মুড়ে নিয়েছিলুম বলেই হাতের মুঠি পিছলে আসবার সম্ভাবনাও কমে এসেছিল অনেকখানি।

ভারসাম্যের অভাবে সর্পরাজও নিজেকে সামলাতে পারলেনা। সড় সড় শব্দে সেও নেমে আসছে মাটিতে। এক্ষুণি লেজের প্যাঁচে জড়িয়ে দেহের হাড়গোড় ভেঙে দ বানিয়ে দেবে আমাকে। গাছের গায়ে আছাড় দিতে পারলে তবেই রক্ষে। চেষ্টা করলুম, কিন্তু সাধ্য কই আমার! সর্পরাজ একটু ওলট পালট খেলে মাত্র। কিন্তু পব মুহূর্তেই দেহটাকে কুঁকড়ে নিয়ে আমাব মাথার উপব দিয়ে এক পাক ঘুরে লাগালো এক প্যাঁচ।

অন্ধকারেও বেশ অনুভব করতে পাবলুম যে অজগর আমাকে লেজের প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলছে। আর একটি প্যাঁচ। ব্যস, বিধাতাবও সাধ্য নেই যে আমাকে রক্ষা কবেন।

পলকপাতে পাক ঘুরে নাগপাশের বন্ধন থেকে শরীবটাকে খুলে নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। আমার বুকের উপর অজগর তার মন খানেকের মত ভারী দেহটাকে মোচড় দিচ্ছে বারে বারে প্যাঁচ লাগাবার চেষ্টায়।

কালী আর ইউসুফের টর্চের আলো যখন গেঁয়োব কুঞ্জবনকে আলোকিত করে তুললো তখন আমি শত্রুর বিশাল দেহের তলায় চাপা পড়ে আছি। দুই পায়ের লাথির জোরে আমি ওকে বারবার আমার দেহের উপর থেকে হটিয়ে দিচ্ছিলুম।

ইউসুফকে ঠিক মত আলো ধরতে বলে কালী ওর লেজের উপর হানলে ক্ষুরধার এক বর্শা! অজগরের দেহ ভেদ করে বর্শার ফলা মাটিতে সেঁধিয়ে গেল এক হাত প্রমাণ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই

লেজের এক ঝাপটে কালী আর ইউসুফ হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে। সর্পরাজের দেহে তখনও বিঁধে রয়েছে কালীর হাতের সেই বর্শা।

এবার ছুটে এসে বর্শাটাকে পায়ে চেপে ধরে কালী ওর খাঁড়া তুলে নিয়ে সাপের দেহে বসালো এক কোপ। নাগরাজের দেহের অর্ধ অংশ ছিটকে বেরিয়ে গেল দেহ থেকে।

আমার হাতের মুঠির নিচে শক্ত মুঠিতে সাপের গলাটাকে টিপে ধরে কালী বলে, 'এবার তোমার ছুটি দাদাভাই। বাপরে, এ যে বাসুকি রাজা নিজেই এসে হাজির।'

ছাড়া পেলুম, ছুটি নয়। কোমর থেকে খুলে নিলুম নিজের পাঁচ ব্যাটারি টর্চটা, খুঁজে নিলুম নিজের হারিয়ে যাওয়া বন্দুক।

কালীর সঙ্গে অজগরের লড়াই চলেছে ওদিকে। ভীমসেন আর বক রাক্ষসের মল্লযুদ্ধ যেন। কালী ওকে আছাড় মারতে চায় গাছের গুঁড়িতে। সর্পরাজের দশ হাতি দেহের অর্ধাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন। কিন্তু সেই দেহ খণ্ডটির ওজনই হবে আধ মনের মত। তা হোক। কালীর শরীরেও আছে কুম্ভকর্ণের শক্তি। আছাড় দেওয়া তবুও সম্ভব হলো না। বরং কালীকে ওর দেহের প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে নাগরাজ। আর অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সাথে কালীও নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে বারে বারে।

এ হেন অবস্থা অসহ্য। কালীকে বললুম মাটিতে শুয়ে পড়তে। তাহলে হয়তো গুলি চালাবার সুযোগ মিলতে পাবে।

কালীর রাগ হয়। শুধু বাঁ হাতেই সাপের গলা টিপে ধরে ডান হাত বাড়িয়ে কোষমুক্ত করে নেয় ওর লম্বা ছোরাখানি। তারপর ক্ষিপ্র হস্তে সেই ছোরাখানিকে সাপের গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে এলো কিছুদূর পর্যন্ত।

এই অবসরে কালীর হাত থেকে অজগরও মুক্ত করে নিয়েছে

নিজেকে। মরণ যন্ত্রণায় এবার সে গর্জন করে উঠলে, 'ফোঁস-ফোঁস।' কি বিকট শব্দ! যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় বইছে কিছু দূরে।

উদ্যতফণা সর্পরাজ কালীকে হাঁ করে গিলতে চায়। নিরস্ত্র কালী হো হো করে হেসে ওঠে—সে হাসিতে বুঝি যমপুরের ঘাতকেরাও কেঁপে ওঠে।

ইউসুফ কালীর খাঁড়াটাকে ছুঁড়ে দিতেই কালীও সেটিকে লুফে নিলে। অবস্থা বেগতিক বুঝেই বোধ হয় নাগরাজও ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল কালীর উপরে। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলো না। আমার দোনলা থেকে আগুন ছুটলো ততক্ষণে।

ছিন্নশির শত্রু লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

আশ্চর্য, এত কাণ্ডের পরেও সেই মুণ্ডহীন দেহ দিয়েই সে একটা গাছের গায়ে প্যাঁচ লাগিয়ে তবেই স্থির হলো।

মনে পড়লো এবার আমার চারের বলদের কথা।

আলো ধরে দেখি, সে এক উৎকট চেহারা। বলদের চোখ দুটো তাদের কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। জিভ ঝুলে পড়েছে মুখের বাইরে। কয়েক ঝলক রক্তও গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। মুগুর পিটে কেউ যেন চূর্ণ করে দিয়েছে তার বুকের পাঁজরা কাঠিগুলো।

মনটাতে মোচড় দিতে থাকে। আমার যুদ্ধ জয়ের আনন্দও ম্লান হয়ে আসে যেন।

শ্রান্ত দেহ নিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছিলুম।

মেঘ কেটে গেছে। আকাশের চাঁদ যেন হেসে মরছে তার বে-আব্রু মুখে। এখনও আধঘণ্টা রাত এখানে বসেই কাটুক না কেন।

বাঘিনীর আবির্ভাব আর আশা করা চলে না কোন মতে। সে আশায় ছাই পড়েছে আজকের মতো।

তবে একেবারেই নিষ্ফল বলা চলেনা এই রাতটিকে।

তন্দ্রা আসছিল চোখ জুড়ে। শেয়ালীর ডাকে সজাগ হয়ে

উঠে বসলুম। উঃ! কি এক অসহ্য বেদনায় আমার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন আর্তনাদ করে উঠল। দেহের পেশী আর বুকের পাঁজরে অসহ্য ব্যথা। এ কি তবে! না—অজগর তো দংশন করবার সুযোগ পায়নি আমাকে। তার কণ্ঠের হলাহল সে মাটিতে বমন করে দিয়েছে।

কালী আমার শরীরটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে। না—দংশনের ক্ষত নেই কোথাও। বুকের উপর কমসে কম মণ দেড়েক ওজন চাপিয়ে ধস্তাধস্তি করেছি আমি বেশ কয়েক মিনিট ধরে। তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হলো এতক্ষণে।

অথচ লড়াইয়ের সেই উত্তেজনার মুহূর্তে শত্রুর দেহকে মোটেও গুরুভার মনে হয়নি আমার।

কেয়ার ঝোপের আড়াল থেকে শেয়ালী ডেকে উঠল আবার। ডাক নয়, সে যেন মড়াকান্না।

রাগ হলো। ইচ্ছে হচ্ছিল, ওকে বলে আসি যে আমি মরিনি। কিন্তু মন যদি বা সচল হলো দেহটা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করতেও যেন নারাজ।

গাঁয়ের মোরগ-মুরগী মিলে ওদিকে ভোরের ঘড়িতে আওয়াজ তুললে।

কালী বলে, 'আমার কাঁধে চড়ে বসো দাদাভাই। সোনাগাজির ঐ বেতো ঘোড়ার চাইতে অনেক আগে গাঁয়ে পৌঁছে যাব আমরা।'

হাসি পেলো কালীর কথায়। 'আমি কি এখনও সেই কচি খোকা আছি নাকি যে ঝাঁপ দিয়ে তোর কাঁধে চড়ে বসবো।'

ইউসুফ বলে, 'শুয়ে পড়ুন হুজুর, আমি ঝাড়িয়ে দিচ্ছি।'

ইউসুফের ঝাড়ানো আর হলো না। দু তিন জন ঘোড় সওয়ার প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ব্যাপার কি? ওমর সেখের পৌত্রকেই দেখছি ওদের পুরোভাগে, আর রূপো বরকন্দাজ তার সাথে। হন্তদন্ত হয়ে আসছে ওরা।

বড্ড জরুরী ব্যাপারই বটে। এখান থেকে যোজন খানেক দূরের এক খণ্ড জঙ্গলে বাঘিনীকে ঘেরাও করেছেন বাবা। আরো বন্দুক চাই। তাই এই রাত তুপুরেই ঘোড়সওয়ার ছুটেছে বন্দুক সংগ্রহের চেষ্টায়। বন্দুকের সঙ্গে শিক্ষিত শিকারীও চাই।

রূপোর কাছে শুনলুম গোয়ালের গরু মেরে তাকে টেনে নিয়ে গেছে বাঘিনী। রাত তখন বারোটা।

খবর পেয়ে বাবা এসেছেন কাছারি থেকে। রাত তুটো থেকে তল্লাসী চালিয়ে বাঘিনীর আস্তানার সন্ধান মিলেছে প্রায় শেষ রাতে।

তারপরেই আবার ঘোড়সওয়ার ছুটেছে বন্দুক আর শিকারীর সন্ধানে।

অবিশ্যি খোকাবাবুর আগমন বার্তা হুজুরের কানে পৌঁছেচে কিনা সেকথা রূপো জানে না।

উত্তেজনা বোধ করি সর্ব রোগের মহৌষধ। খবর শুনেই আমার অনড় দেহটা তার অনিচ্ছা আর আলসেমি ঝেড়ে ফেলে দিলে এক মুহূর্তে।

গাঁ থেকে পাওয়া গেলো মোটে তুটি গাদা বন্দুক। আখতার তার একনলী নিয়েই ছুটলো। ওমর সেখের দোনলা বন্দুক রইল আমার হাতে, আর আমার বাহন হলো আখতারের সেই দৌড়বাজ ঘোড়া।

সবার শেষে যাত্রা করেছিলুম আমি, হাজির হলুম কিন্তু সবার সঙ্গেই।

জঙ্গলের চেহারা দেখে মনের উৎসাহ নিভে এলো অনেকখানি। এ যে রীতিমত একটা তুর্ভেদ্য বন।

স্নুন্দরবন তো নদীর ওপারে। এপারেও যে তার অস্তিত্ব একদিন ছিল, তারই সাক্ষী হয়ে আছে বুঝি এই বন।

নদী যেমন তার দেহটাকে লম্বা করে বঙ্গোপসাগরের দিকে

ছুটেছে, এপারের এই জঙ্গলও তেমনি তার দেহটাকে মাইলটাক পথ টেনে নিয়ে চলেছে ওপারের টানে। আধ মাইলের মত জল পেরিয়ে যাবার সাধ্য নেই বলে বারো হাত উঁচু বাঁধ ডিঙিয়ে নদীর পারের ঘন কেওড়ার জঙ্গলের হাত ধরেছে সে।

কাঁটা গাছে আর লম্ব লতার জালে বন দুর্ভেদ্য। তা ছাড়া গেঁয়ো-গরাণ আর নানা জাতের গাছেরা এমন ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে যে হামাগুঁড়ি দিয়েও ঐ জঙ্গলের মধ্যে মানুষের এগিয়ে চলা সম্ভব নয়।

তাড়া খেয়ে বাঘিনী বাঁধ টপকে কেওড়ার জঙ্গলের দিকেই আসবে একথা অনুমান করা যায়। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

অতএব, বিলের দিক থেকে বাঁধের মুখে ওকে তাড়িয়ে আনবার চেষ্টায় ব্যূহ সজ্জা শুরু হলো। বাঁধের উপর একশো হাত দূরে দূরে শিকারী বসাতে হলে অন্ততঃ সাতটি বন্দুকের দরকার। তা ছাড়া তাড়িয়ে আনবার জন্যেও তো কমপক্ষে আরো ক'টি বন্দুকের প্রয়োজন পড়বে। বন্দুক আর শিকারীর অভাবে শেষ পর্যন্ত বুঝিবা সব শ্রমই পণ্ড হবে আজ।

হাল ছাড়বার মানুষ নন তবু এই অভিযানের নেতা। বাঁধের উপর চারজন শিকারীকে রেখে দেওয়া হলো। নেতার নির্দেশমত বাঁধের ওপারের কেওড়ার গাছে চড়ে বসলে ওরা।

বনের মধ্যে ঢুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বলে বনের দুপাশ থেকে হৈ হুল্লোড় করে বন পিটিয়ে চলবে বাকী লোকজন।

মাঝে মাঝে সুবিধা বুঝে যতখানি সম্ভব বনের অন্দরে ঢুকে পড়ে হৈ হুল্লোড় করবার জন্যে কুড়ি জন করে লোক নিয়ে দুপাশে দুটি উপদলও রইল। এই দুটি উপদলের রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলো দুজন পাকা শিকারীর উপর।

অভিযান আরম্ভ হলে বনের বাইরে প্রধান দল অপেক্ষা করে থাকবে উপদলের প্রত্যাবর্তনের আশায়। উপদল দুটি নিজ নিজ দলের সঙ্গে মিলিত হলে নেতার বিউগিলের সঙ্কেতে আবার চলা শুরু হবে দুপাশ থেকেই।

বনের মধ্যে চারজনকে আগেভাগেই পাঠানো হয়েছিল বনেব অন্দর সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের জন্যে।

ওরা ফিরে এসে খবর জানালো—চমকপ্রদ খবর।

গোমাংস ভোজন শেষ করে বাঘিনী আর তার বাচ্চারা এই বনখণ্ডেই বহাল তবিয়তে বাস করছে।

বনেব অন্দর মহলের চেহারাটা বড় কুটিল, অগুণতি ঝোপ ঝাড়ে চলার পথও বড়ই জটিল।

গাছ থেকে গাছে চড়ে এগিয়ে চলা বরং সহজ। তাই গাছ বেয়ে চলাব সময় ওরা একটা গাছের ডালে একখানি নোতুন গামছা আব দুটো সড়কি দেখতে পেয়ে জিনিসগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

এই জঙ্গলে বাঘেব সাথে মানুষেব বাস—ওরা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে সেই কথা।

রহমানেব কথা মনে পড়লো। কিন্তু বাবার সামনে মুখ ফুটে বলতে পাবলুম না সে কথা। সবাই জানে সরকাবী কূপে কাজ নিয়েছে রহমান। সেখানেই সে থাকে। মাসে মাসে আবাব টাকাও পাঠাচ্ছে বাড়িতে।

বিউগিলের সঙ্কেত শুনে বন পেটাতে শুরু করল ওরা। দুপাশ থেকে দুটি দলই এগিয়ে চলেছে তাদের বেসুরো বাদ্যভাণ্ডের প্রচণ্ড কলরোল তুলে। পিতা পুত্র দুজনে আমরা এই দুই দলেব নেতৃত্ব নিয়েছি—বাম পার্শ্ব রক্ষার দায়িত্ব আমার।

এই দায়িত্ব বড় কম নয়।

যে কোন মুহূর্তে বাঘিনী ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে।

'আবাদী মানুষ অনেক বেশি সাহসী সত্যি! কিন্তু রাক্ষসীর

প্রলয়ঙ্করী মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাতের লক্ষ্য ঠিক রাখাও সহজ নয়।

বরং ওর রণহুঙ্কারে মানুষের স্নায়ুযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

যাদের স্নায়ুযন্ত্রটি সেই চরম মুহূর্তেও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে তাঁদের দেহে সম্ভবতঃ দানবীয় শক্তি এসে ভর করে। কোণঠাসা হলে বাঘিনী কত ভয়ঙ্করী হয়ে উঠতে পারে তার নজীর তো বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না।

আখতারের ঘোড়াটি চমৎকার।

দু তিনশ মানুষের এই দলটিকে পাহারা দেবার জন্যে অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি করতে হচ্ছে আমাকে। অশ্বরাজ যেন তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তার কর্তব্য সম্বন্ধে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল।

কি জানি ওর ভূতপূর্ব মনিবদের কেউ ওকে যুদ্ধ বা শিকারের কাজে শিক্ষা দিয়েছিল কিনা।

বনের ওপাশের বেষ্টনীতেও বাবা ঘোড়ার পিঠে চেপেই তদারকি করছেন। কিন্তু বাবার বাহনটি এ বিষয়ে দস্তুরমত পাকা।

বনের অন্দরমহলে ঢুকে পড়বার সুযোগ আছে দেখে আমি বিউগিল বাজিয়ে দুপাশের দুটি দলকেই থেমে যেতে নির্দেশ দিলুম। আগেকার ব্যবস্থামতো হাসানের পাহারায় রাখা উপদলটি বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রধান দল নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। বিপুল বাদ্যভাণ্ড তাদের বেসুরো শব্দে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

কিছু পরেই উপদলটিকে নিয়ে ফিরে এলো হাসান শিকারী। সংকেত পেয়ে দলের অগ্রগতি শুরু হলো আবার।

বেলা প্রায় একটা বাজে।

ভেড়ির বাঁধের কাছে এসে পড়েছি প্রায়। বিউগিল বাজিয়ে গাছের উপরকার শিকারী আর তাদের সাহায্যকারীদের সতর্ক করে দিয়ে আমি ঘোড়া চালিয়ে ছুটে এলুম বাঁধের গায়ে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে চড়ে বসলুম গাছে।

বন্দুকের অভাব ছিল বলেই পঞ্চাশ হাত দূরে দূরে গাছের উপর পাহারাদার রাখা হয়েছিল আগে থেকেই। ইংরেজীতে শিকারের ভাষায় এদের বলা হয় 'স্টপ'। এরা শিকারী নয়, এমন কি অস্ত্রধারী হবারও প্রয়োজন নেই এদের। তাড়া খেয়ে শিকার যদি ঐ পথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে স্টপ তখন গাছের ডাল নেড়ে, ঢিল ছুঁড়ে বা চেঁচামেচি করে শিকারকে শিকারীর দিকে ভিড়িয়ে দেবে।

দুপাশ থেকে দল দুটি তো এসে বাঁধের গায়ে হাজির হলো। কিন্তু যাদের জন্যে এত কাণ্ড তাদের টিকিটাও দেখা গেল না।

শ্রান্ত মানুষের দল বাঁধের নিচে গাছতলায় এসে বসলো বিশ্রাম করতে।

আশ্চর্য, বাঘিনী আর তার বাচ্চারা তবে কি আগেই ভেড়ির বাঁধ পেরিয়ে নদীর পারের কেওড়ার জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিয়েছে!

নদীর পারের কেওড়ার জঙ্গল মাইলের পর মাইল, যোজনের পর যোজন একই ভাবে চলেছে। এই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে দশবিশ মাইল পথ সে দিব্যি চলে যেতে পারে। তাহলে তাকে আর সন্ধান করা সম্ভব হবেনা কোনমতে।

সবাই বলে সেইটেই সম্ভব। নইলে পাঁচ-ছ'শ মানুষের হৈ হুল্লোড় আর এই বাজনার শব্দে জঙ্গলের মধ্যে চুপটি করে বসে থাকা তারপক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

বাবার মনে কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে বাঘিনী গা ঢাকা দিয়ে আছে ঐ জঙ্গলেই। অতএব আর একবার বন পিটিয়ে দেখা যাক না কেন।

এবার বাঁধের দিক থেকেই পিটুনি শুরু হলো অর্থাৎ আগের বারের ঠিক উল্টোটা।

অনেক বিচক্ষণতা, প্রচুর শ্রম—পুরোদস্তুর তল্লাসী। সব ব্যর্থ হলো। সূর্য তখন প্রায় পাটে বসেছে। আবাদের মানুষেরা

এবার বিদায় নেবে। মাথার ঘাম মুছতে মুছতে মেঠো ঘরে ফিরে যাবে ওরা—একে একে বিদায় নিয়ে গেল সবাই।

এতক্ষণে পিতৃ-হৃদয় সজাগ হলো আমার মুখের পানে চেয়ে।

এইটুকু পরিশ্রমে আমার চোখের কোণে কালি পড়েছে; শুকনো আমসীর মত বিবর্ণ শুষ্ক হয়েছে মুখ!

কালী তখন গত রাতের সেই ঘটনা শোনায়। বাবার ঘাম-ঝরা মুখের উপর আনন্দ আর দুশ্চিন্তা দুয়েরই চিহ্ন ফুটে ওঠে। কাছে টেনে নিয়ে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'তোর যে জ্বর এসেছে দেখছি। বড্ড বেশি পরিশ্রম করেছিস্। তবে ওর জন্যে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। ব্যাটা ছেলে লড়াই না করলে বাঁচতে পারেনা। অন্ততঃ বেঁচে আছি বলে মনে হয়না।'

'তা বলে তোর মা যেন এসব কথা না শোনেন। বারণ করে দিস ওদের সবাইকে—' একটু ভেবে নিয়েই শেষ কথা কটি যোগ করলেন বাবা।

বাবাকে বললুম, 'লোকালয়ের কাছে এত বড় একটা জঙ্গল থাকা ঠিক নয়। এটাকে কেটে দিলেই তো হয়।'

'না হয়না। এই জঙ্গলটাই আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের উপর আর একজন আছেন যিনি মানুষের মধ্যেই বাস করেন, মানুষের আর্ত ডাকে সাড়া দেন—' বাবা তাঁর ছোটবেলাকার এক কাহিনী শোনালেন আমাকে।

তেপান্তরের এই বিলজোড়া জঙ্গল সাফ করে তখন আবাদ হচ্ছে। চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলের উপর সকল দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত। জঙ্গলের মধ্যে দোতলা সমান উঁচুতে কাঠের দুখানি ঘর। এক ঘরে থাকতেন বাবা। অন্য ঘর খানিতে থাকতো মাইনে করা দুজন পাহারাদার শিকারী। সব জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। মাত্র এইটুকুই তখনও বাকি।

জ্যোৎস্না রাত—রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে বারান্দায়

এসে দাঁড়ালেন বাবা। আলোর ছোঁয়া লেগে বন যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সে যেন ফিস ফিস করে বলে চলেছে তার গোপন অন্তরের কত শত কথা। বেশ তন্ময় হয়ে বাবা দেখছিলেন ওর রূপ, শুনছিলেন ওব ব্যথা-বেদনার কাহিনী। হঠাৎ নিচের আঙিনায় খুট করে একটা ছোট্ট শব্দ হতেই বাবার নজর পড়লো সেইদিকে। কাঠের সিঁড়ির সুমুখে আঙিনায় দাঁড়িয়ে বিশাল-দেহ বাঘ। সিঁড়িটা সরিয়ে নেওয়া হয়নি সেদিন নিত্যকারের মত।

'বাঁচাও-বাঁচাও ভগবান'—ভয় পেয়ে গৃহদেবতা কৃষ্ণকে স্মরণ কবলেন বাবা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে ছুটে তাঁর নিজের ঘরে ঢুকবার আগেই বাঘটা সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠে ধবে ফেলবে ওঁকে।

কে যেন কানে কানে বললে, 'সিঁড়িটাকে গায়ের জোরে নিচে ফেলে দে।'

বাঘটা লাফিয়ে উঠল সিঁড়ির উপবে। বাবাও বিদ্যুৎবেগে সিঁড়িটাকে উলটে দিলেন। সিঁড়ি মাটিতে পড়লো সশব্দে। বাঘ চাপা পড়লো সিঁড়ির তলে।

তারপর এক ভয়ঙ্কর গর্জন করে কাঠের বেড়া লাফিয়ে পালিয়ে গেল বাঘ।

কে যেন আবাব বললে, 'তোর জীবন বাঁচালুম। বিনিময়ে ঐ জঙ্গলটুকু ভিক্ষে দে আমাকে।'

হয়তো এটুকু মনেব বিকার মাত্র। এই ভেবে, পবেব দিনেই আবার জঙ্গল সাফ করবার হুকুম দিলেন বাবা। কিন্তু কাজ শুরু হতে না হতেই ঘটলো এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।

পাহারাদার শিকারী দুজনের একজনকে বাঘে নিয়ে গেল, আব একজন জখম হলো গুরুতব। ঘোড়া থেকে বাবা ছিটকে পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে। আক্রমণকারী বাবাকেও জখম করতে পারতো ইচ্ছে করলে। কিন্তু শুধু একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখলে

মাত্র। ছোট্ট একটি গর্জন। তারপর পাহারাদার শিকারীদের একজনকে মুখে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

তাড়াতাড়ি বন্দুক উচিয়ে ফায়ার করলেন বাবা। ক্লিক-ক্লিক—ট্রিগারের শব্দই হলো শুধু। সর্বনাশ! বন্দুকে আদৌ গুলি ভরা হয়নি যে। গুলি—বুলেট বেল্ট সব ফেলে, মনের ভুলে খালি বন্দুক নিয়েই রওনা হয়েছিলেন বাবা।

এমন ভুলও হয়।

এক্ষুণি বাঘের তল্লাসী করা দরকার। শিকারী বা কাঠুরে কেউ রাজী হলো না কিন্তু। সবাই ভয়ে আধমরা।

কোনমতে কাঠুরেদেরকে রাজী করিয়ে আবার বন সাফ করবার উদ্যোগ করছেন, কানে এলো কার কঠিন কণ্ঠ, 'খবরদার, হুকুম তোর ফিরিয়ে নে।'

শিকারী আর কাঠুরেদের মনে কুসংস্কার আছে—থাকাই স্বাভাবিক।

শিকারীরা যাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেন, তা যে ঠিক কি বস্তু ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবেনা হয়তো। তবে যুক্তি গ্রাহ্য নয় বলেই যাঁরা এটাকে নাকচ করে দিতে চান, তাঁরা আর যাই হোন না কেন শিকারী নন নিশ্চয়'।

যোজনের পর যোজন সাফ করিয়ে যিনি এইটুকু শুধু রেহাই দিলেন, তিনি বললেন তাঁর কথা। এ কথাটা কেউ কোনদিন শোনেনি এর আগে।

অতীত থাক। আগের কথায় ফিরে আসি আবার।

ইউসুফ আর তুজন শিকারীকে আমার কাছে রেখে বাবা তাঁর লোকজন নিয়ে যাত্রা করলেন অন্য কাছারির উদ্দেশে। আধঘণ্টার মধ্যেই ছিপ আসবে ঘাটে। সেই ছিপে উঠে আমি যাব বড় কাছারিতে। ওখানে চিকিৎসা আর বিশ্রাম তুই মিলবে--তাই অমন ব্যবস্থা।

যাবার আগে বাবা আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যে বাঘিনী ঐ বনের মধ্যেই আছে এখনও। সন্ধ্যের পরে বেরুতেও পারে সে। অতএব ছিপ না আসা পর্যন্ত গাফিলতি করা উচিত হবে না আমাদের।

অবকাশ পেয়ে ইউসুফ এবার তার ঝাড় ফুঁক শুরু করল।

আকাশের অন্ধকার নামছে মাটিতে—গোধূলি লগ্ন বুঝি আসন্ন। তবু অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তখনও।

ভেড়ির উপর দাঁড়িয়ে একজন শিকারী পাহারা দিচ্ছে, আর একজন নদীর উপর নজর রেখেছে ছিপের আগমন প্রতীক্ষায়।

অদূরে জঙ্গলের কোণে গাছের মাথাগুলো একটু বেশি জোরে দোল খাচ্ছে যেন—ভেড়ির উপর দাঁড়িয়ে নজর পড়ল শিকারীর। ব্যাপারটা কি বুঝবার জন্যেই হাসান ওর বন্দুক নিয়ে ছুটলো। হাসানেরও সন্দেহ হয়েছিল বোধ হয়। তাই সে মিনিট-কয়েক ধরে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে চললো শেষ পর্যন্ত।

অদূরে জঙ্গল আর ভেড়ির বাঁধের মধ্যে একশো গজের মত খোলা জায়গা। আর বাঁধের উচ্চতাও সেখানে বড় জোর হাত পাঁচেকের মতো।

হাসানকে বনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বন্দুক নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

বনের কিনারায় এসে থমকে দাঁড়ায় হাসান। তারপর ফিরে আসবার জন্যে সে সবে মুখ ঘুরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ ওর বাম পায়ের উরুতে এসে বিঁধলো একটা সড়কি। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েই হাসান চেঁচিয়ে উঠল, 'বড় শেয়াল বড় শেয়াল'।

হুড়মুড় করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো বাঘিনী আর তার বাচ্চারা। এক, দুই-তিনটে বাচ্চা।

এক ছুটে খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে এক লাফে ভেড়ির বাঁধের

উপর উঠে দাঁড়ালো বাঘিনী। একের পর এক লাফিয়ে উঠে পড়লো দুটি বাচ্চা।

ঝুপ-ঝুপ-ঝুপ। বাঁধের ওপারের কেওড়ার জঙ্গলে লাফিয়ে পড়ল ওরা তিন মায়ে পোয়ে।

তৃতীয় বাচ্চাটিও ততক্ষণে লাফিয়ে উঠেছে বাঁধের মাথায়। কিন্তু তখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেনি সে। পলকপাতে সেও হারিয়ে যাবে কেওড়ার জঙ্গলে।

দুড়ুম-দুড়ুম। ব্যাঘ্র শাবক বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়লো বাঁধের নিচে।

দুড়ুম দুড়ুম—হাসানের বন্দুকও গর্জন করে ওঠে। তারপরে এক দৌড়ে হাসান এসে দাঁড়ায় আমার পাশে।

সন্তানের শোকে প্রতিহিংসাপরায়ণা বাঘিনী হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে এক্ষুণি। বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে তাই প্রতীক্ষা করি।

ইউসুফ আর ভেড়ির উপরের পাহারাদার সেই শিকারীও ছুটে এসেছিল আমার পিছু পিছু।

হাসানের পায়ের আঘাত গুরুতর নয়। তবু সড়কির আঁচড় তো বটে। এক ইঞ্চি ব্যাসের একটি অগভীর গর্ত সৃষ্টি করেছে। অনেকখানি দূর থেকে নিক্ষিপ্ত, তাই ওর গতিতে জোর ছিল না। মাটিতে পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই হাসানের পায়ের উপর আঘাত করেছে মাত্র।

হাসানের অনুমান যে ঐ সড়কির মালিক রহমান ছাড়া আর কেউ নয়। অনুমানের উপরেই সে গুলি ছুঁড়েছে তাই। আক্রমণকারী হতে আহত না হোক, এগিয়ে আসতে সাহস পাবেনা অন্ততঃ।

আমিও বুঝি, রহমান ছাড়া আর কেউ নয় সে।

অবাক হয়ে আজও তাই ভাবি, এও কি সম্ভব!

অসম্ভব যে, সে কথাও বলবো না।

প্রবল জ্বর নিয়ে যখন কাছারিতে শুয়ে আছি তখন রাখাল

ছেলেরা এসে খবর দিলে, 'শেয়াল-কুকুরের সাদি হয়েছে, রাজাভাই। ওদের ছেলেপুলে হয়েছে।'

সত্যি খবর। বাবা নিজেও নাকি কৌতূহলবশে দেখতে যাচ্ছেন ব্যাপারটা।

বাবার মত অমন গম্ভীর রাশভারি মানুষের মনেও এই সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছে শুনে ব্যাপার খুব রহস্যজনক মনে হলো। জিদ ধরলুম আমিও যাব বাবার সঙ্গে।

গেছিলুম শেষ পর্যন্ত। চার পাঁচ দিন আগে যেখানে অজগরেব সাথে লড়াই করেছিলুম তারই কিছুটা দূরে কুকুর স্বামীর শবদেহ পাহারা দিয়ে বসে আছে তার শেয়ালী স্ত্রী। অতন্দ্র পাহারা দিয়ে বসে আছে শেয়ালী দিন রাতের চব্বিশ প্রহর ধরে। তিন চারটে কচি-কাঁচা কোলে, অদ্ভুত চেহারা শিশুদের। শেয়াল-কুকুরের সুস্পষ্ট মিশ্রণের প্রতীক ওরা—আজব বটে।

শিশুগুলিকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওদের শোকাতুরা শেয়ালী জননীকে সর্বস্বান্ত করতে সায় দিল না মন।

মনে পড়লো, অজগরকে হত্যা করে যুদ্ধক্লান্ত দেহ এলিয়ে এই শেয়ালীর মড়াকান্নাই শুনেছিলুম।

হ্যাঁ, আমার অনুমানই সত্যি। সেই দেঁড়মণ ওজনের দুরন্ত অজগর প্রথমে এই কুকুরটিকে হত্যা করেছিল তার লেজের প্যাঁচে জড়িয়ে। দ্বিতীয় শিকার, সেই চারের বলদ আমার।

শেয়ালীর শিশুগুলি কাঁদছিল কেঁউ কেঁউ করে। দীর্ঘ উপবাসে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে গাঁ থেকে দুধ আনতে পাঠালুম ইউসুফকে।

বেদে-বেদেনীর দল তাঁবু ফেলেছে অদূরে। খবর পেয়ে ওরা এসেছিল আমাকে একজোড়া মুরগী উপহার দিতে। অজগরের মাংসে ওদের হপ্তা চলে যাবে। তাই উচ্ছ্বসিত প্রাণের আনন্দ উপহার।

জোড়ার একটি মুরগীকে জবাই করে শেয়ালীর সুমুখে দিল ইউসুফ্। বাচ্চাগুলি তখন মনের আনন্দে দুধ খাচ্ছে চুক্ চুক্ করে।

কুকুরের গলিত শবদেহটিকে সরিয়ে নিল বেদেরা। একপাল শকুনি ধর্ণা দিয়ে বসেছিল মাংসেব লোভে। শেয়ালীব তাড়া খেয়ে ওরা পালিয়ে গেল কিছুটা দূরে।

এতক্ষণে শেয়ালী মুবগীটাকে মুখে তুলে নিয়ে সেঁধিয়ে গেল তার কেয়াঝোপের আস্তানায়। শিশুরাও মার পেছু নিলে।

আমার পালকীর বেহারারাও গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠলো, 'হেঁইও, জোয়ান-হেঁইও।'

॥ পাঁচ ॥

বোশেখের রোদ্দুর বিলের বুকের রস নিঙড়ে নিয়েছিল নিঃশেষ করে। শেষ বোশেখেই সে লক্ষ মুখে হাঁ মেলে ধরলে আকাশের জলের আশায়।

জল নামলো জ্যৈষ্ঠ শেষে কি প্রথম আষাঢ়ে।

বর্ষা বিদায় নিল তো এলো শরৎ।

শরৎ শেষে এলো সোনালী ফসলের হেমন্ত।

মাঠের ধান ঘরে উঠতে শুরু করেছে। মানুষের ঘরে নোতুন ফসলের উৎসব, নবান্ন ভোজের পালা।

অকালে চাষীর ঘরে উপোসে কাল কেটেছে হয়তো। তবে বাঘিনী বোধ করি উপোসী ছিলনা কোনদিনও। তার বাচ্চারাও দিব্যি দুধে ভাতে ছিল।

দশখানা গাঁ জুড়ে অবলীলাক্রমে সে এখন চরে বেড়ায় রাতের বেলায়—দরকার মত দিনের বেলাতেও।

গেরস্ত বাড়িতে গোয়ালভরা গরু। ঘাসের মাঠে বা বাড়ির খামারে রাখালের প্রহরাকে দিব্যি বুড়ো আঙুল দেখায় সে। ধরা পড়লে চোখ রাঙাতেও কসুর করেনা।

এদিকে কাছারিও নিষ্ক্রিয় বসে ছিলনা। শিকারী পোস্তের সংখ্যা এখন দ্বিগুণ হয়েছে। তারা দেশ জুড়ে তল্লাসী চালায়, মাচান বাঁধে, চার দেয় আর ঘোড়া হাঁকিয়ে বা ছিপ ছুটিয়ে জল-স্থল সবগরম করে তোলে রীতিমত।

রেহাই নেই তবুও।

প্রজারা এসে ধর্ণা দেয় সদরে, আর্জি পেশ করে, অভিযোগ জানায় আর হালের গরু-মোষের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পেয়ে খুশি মনে ঘরে ফেরে আবার।

'মানুষখেকো নয় বেটি'—ওরা ভয় করেনা বাঘিনীকে।

বছর ঘুরে বছর এসেছে।

আমিও ফিরে এসেছি ইঁট কাঠের বন্দীশালা থেকে খোলা প্রকৃতির কোলে, বইয়ের বেড়া ডিঙিয়ে বিধাতার পাঠশালায়।

খুঁটিনাটি সহস্র সংবাদের সমষ্টিফল থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাঘিনী আজ বেহায়া হয়ে উঠেছে। বোরখার আড়াল-টুকুও আর সইছেনা তার।

সে এখন দুর্বার, দরকার হলে মারমুখী হতে পেছপা নয় সে মোটেও।

ওর অবশিষ্ট একজোড়া বাচ্চাও এখন দস্তুরমত শক্তিধর। মায়ের তুলনায় তারা আরও বেশি বেপরোয়া।

এক ডজন ওস্তাদ শিকারীর প্রায় এক বছরের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে আজও বহাল তবিয়তেই চরে বেড়াচ্ছে · লজ্জার কথা বলেই মনে হবে হয়তো। মাসের পর মাস এই অবাঞ্ছিত পোষ্যবর্গের মাইনে গুণতে গুণতে কাছারিও নাজেহাল, নায়েব মশায়ও বেসামাল।

রাগের মাথায় তিনি হাত পা ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকেন, 'গৌরীসেনের টাকা পাওনি বাপধনেরা। এইবার—এই শেষবারের মত মাইনে দিচ্ছি। সদরে যেয়ে হুজুরের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে এসো।'

আমার উপর চোখ পড়তেই হাউ মাউ করে কান্না শুরু করেন নায়েব মশায়।

'শয়তানী—ঐ শয়তানী আমার চাকরী খেতে বসেছে বাবা। আমার এই বুড়ো হাড়ে ওর পেট ভরবেনা, তবু ঐ শয়তানী আমারে রেহাই দেবে না। আমারে বাঁচাও বাবা—বুড়ো বয়সে চাকরি গেলে'—নায়েব মশায় এবার গলা ছেড়ে কাঁদেন।

শিকারীদেরকে জিজ্ঞেস করলুম কেন এই ব্যর্থতা। অনভিজ্ঞতা, অনিচ্ছা, গাফিলতি, ভয়—না বাগে পেয়ে আরও বেশি অর্থ আদায়ের অপচেষ্টা?

ওরা অসহায়ের মত উত্তর দেয়—ছোট্ট একটি বিনীত উত্তর, 'হুজুর, ওটা বাঘিনী নয়, শয়তানী।' বনবিবির যাতুতে শিকারীর চোখের সুমুখে সে হাওয়ায় উবে যায়। বন্দুকের ঘোড়াকল টানলেও নলের গুলি নড়েনি—এমন ব্যাপারও ঘটেছে। নইলে তমিজুদ্দিন ওকে বিশ হাতের মধ্যেই পেয়েছিল একবার।

কুসংস্কার ওদের আছে। তাবলে সেই কুসংস্কারের কাছে শিকারীদের এই অসহায় আত্মসমর্পণ যে অসহনীয়।

এই সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা চলতে পারে। কিন্তু যারা বাঘিনীকে অবধ্য ঠাউরে নিয়েছে তাদেরকে এই জেহাদেব লড়ুয়ে করা চলেনা কোনমতে।

লড়াইয়ের আগেই ওরা পরাজিত।

আমার ধারণায় স্নায়ু হলো শিকারীর সব চাইতে বড় সম্পদ। শিকার এই স্নায়ুযুদ্ধ বৈ কিছু নয়।

মানুষ কি বাঘ—কেউ হলপ করে বলতে পারে না যে তার স্নায়ু যন্ত্রটি ইস্পাতেব তৈরী। যান্ত্রিক গোলযোগ কোন দিনও মেরামতেব ডাক পড়েনি তার।

রক্তমাংসের দেহে স্নায়ু যন্ত্রের স্পন্দন আছেই। আকস্মিক আঘাতে সে বিগড়ে যায় ঠিকই। ভেতরকারের মিস্ত্রী মশায় যদি একটু সজাগ থাকেন তাহলে গোটা মানুষটার মধ্যে হেরফেব হয়না কোন বড় রকমের। অন্ততঃ বাইরের চোখে ধবা পড়েনা সেই তুর্বল মুহূর্তটি।

ভেবে চিন্তে নয়, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বিদায় দিলুম ওদের ক'জনাকে।

নিরুপায় হয়েই তেমনি আবার স্মবণ করতে হলো ময়নাকে। ময়নাকে সঙ্গে নিয়েই শুরু হলো আবার প্রাণান্তকর সেই চেষ্টা।

কি জানি কেন, ময়না বা কালী সঙ্গে থাকলে যমের সঙ্গে যুঝতেও

বুঝি পেছপা নই আমি। বরং, মনে মনে বোধ হয় যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর ঠিকানা খুঁজে মরি।

সেদিন আমরা ফিরে আসছিলুম সাত আট মাইল দূরের এক গাঁ থেকে।

গত রাত্রে এক চাষার গোয়ালের গরু মেরেছে বাঘিনী। শিকারের অবশেষ কিছু ছিল না, থাকবার কথাও নয়।

আমাদের হিসেব মত আজ রাতে অন্ততঃ মাইল পাঁচেক পথ এগিয়ে এসে শিকার ধরবে বাঘিনী, বড় কাছারির কাছে-পিঠের কোন গাঁয়ে।

ভেড়ির পথ বেয়েই ফিরে আসছিলুম আমরা। দেখা হয়ে গেল খেয়ার মাঝি অর্জুনের সাথে।

বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে অর্জুন। নইলে একদিন নাকি সেও ছিল সব্যসাচী। কালী কপালীর ওস্তাদ সে তীর ধনুকে।

অর্জুনের অনুরোধে ডাব খেতে বসলুম ওর খেয়াঘাটের আস্তানায়।

ওদিকে আকাশের গায়ে তখন কালো মেঘের আনাগোনা। ভর দুপুরেও তাই মুখ কালো করে আছে তেপান্তরের বিল আর নদীর পারের কেওড়ার জঙ্গল। গোমড়া মুখে গম্ভীর হয়ে আছে গোটা প্রকৃতি।

অর্জুন বললে, 'কাল বোশেখীর ঝড় উঠবে আর এক ঘড়ি পরে'।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলুম তাই। ছেঁড়া-খোঁড়া কালো মেঘের নীচে সার বেঁধে চলেছে এক ঝাক সাদা বক। আর বক মধ্যে হংস যথা—উড়ে চলেছে একজোড়া গ্যাড়াপোল পাখি। নরম মাখনের মত ওর মাংস! জিভের জল ঝরায়।

অতএব মুখের খাবার মুখেই রইল, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলুম তক্ষুনি, ছুটলুম পাখির পিছনে।

বাঘিনীর কথা মুছে গেল বুঝি মন থেকে।

চোখ দুটো ঐ উড়ন্ত পাখির সঙ্গে উড়ে চলে— মনও।

আকাশের তারা গুণতে গুণতে কোন এক জ্যোতির্বিদ নাকি খানায় পড়েছিলেন। আমার সে ভয় নেই অবিশ্যি। আমার বাহনটি তো চোখ মেলেই চলেছে।

অনেক উঁচুতে উড়ে চলেছে ওরা—বন্দুকের পাল্লার বাইরে। তবে একনাগাড়ে বড়জোর এক ঘণ্টা উড়ে শেষ পর্যন্ত নিচুতে নামবে ওরা। এইটেই ওদের স্বভাব।

তারই প্রতীক্ষায় আছি আমি।

বিলের শেষে গাঁয়ের সীমানায় আর নয় কোন খণ্ড জঙ্গলের লম্বা গাছের মাথায় বিশ্রাম করতে বসবে ওরা, সেই তো আমার শুভলগ্ন।

ময়না আর আমি দুজনেই প্রায় পাশাপাশি চলেছি। জমির বরকন্দাজ আসছে তার বেতো ঘোড়ার পিঠে চেপে। হয়তো সে অনেকখানি পিছনে পড়ে আছে।

একটা খণ্ড জঙ্গলের মাথার উপর চক্রাকারে বার কয়েক পরিক্রমা করে পাখি দুটো অনেকখানি নিচুতে নেমে এলো, তবে তখনও আমার নাগালের বাইরে।

ওরা বিশ্রাম করতে বসলো না বরং ডানার ঝাপটে বাতাস কেটে উড়ে চললো সোঁ সোঁ করে।

আমারও ঘোড়া ছুটাই।

পলকের জন্যে পিছন ফিরে দেখে নিলুম জমিরও আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে। উড়ন্ত পাখির সঙ্গে তাল রাখতে যেয়ে বাহনটিকে বুটের গুঁতো দিয়েছি সবে, পিছন থেকে ডাক এলো কানে। জমিরের গলা—আর্ত কণ্ঠের প্রাণপণ একটা ডাক, 'হুজুর'।

বুকের ভেতরটা ছ্যাক করে ওঠে। ময়নার আগেই ঘোড়া সামলে নিলুম আমি। মুখ ফিরিয়ে দেখি লেজ উঁচিয়ে উভরড়ে ছুটে

মরছে জমিরের সেই বেতো ঘোড়া। মাঝে মাঝে আবার পেছনের পা দুটি শূন্যে আস্ফালন করে গলা ছেড়ে গাইছে চিঁ হিঁ হিঁ।

ওর পিঠের সওয়ার?

কেয়ার ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলুম। সুকুমার কান্তি শার্দুল শাবক তার শিকারকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। তখনও শিকারের সঙ্গে শিকারীর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে বটে, তবে শিকারীকে তার জন্যে খুব বেশি চিন্তিত মনে হলো না।

বন্দুকের গুলি বদলে নিতে দু' এক মিনিট সময় লেগে গেল। চেয়ে দেখি শিকারীও তাকিয়ে দেখছে আমাকে।

ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম।

চকিত বেগে শার্দুল-শাবকও তার শিকার ছেড়ে ছুটলো, জঙ্গলের আড়ালে গা ঢাকা দিতে চায় সে।

দুরন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা—বাঘের সঙ্গে আমার বাহনের।

হেরে যাই বুঝি। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঢুকে পড়বে সে ঐ সুমুখের খণ্ড জঙ্গলে—ওর দুর্ভেদ্য দুর্গে। বন্দুকের পাল্লাব মধ্যেও পড়ে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া এ হেন দুবন্ত দৌড়ের মুখে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে গুলি। বিশেষ করে আমাব লক্ষ্যবস্তুটিও যে নির্মম গতিশীল।

কিন্তু উপায় কি। শেষ মুহূর্ত এলো যে।

ট্রিগার টানতে হলো ভাই—দুড়ুম দুড়ুম।

মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লো বাঘ।

পিছন থেকে এমনি এলোপাথাড়ি ভাবে গুলি চালিয়ে ওকে ধরাশায়ী করা সম্ভব নয় বলেই ধরে নিয়েছি আমি।

তবু যে দুটো নল খালি করেই গুলি চালিয়েছি সে শুধু ওর গতিবেগকে স্তিমিত করবার জন্যে।

কি অমিত প্রাণ ঐটুকু বাচ্চার। একজোড়া গুলির মার হজম করেও দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে সে।

মাথাটাকে লক্ষ্য করতে পারলুম না বলেই ওর বুকের উপর বিঁধলো আমার আর একজোড়া গুলি।

'সেলাম ওস্তাদ, সেলাম',—তাকিয়ে দেখি ময়না ওর উদ্যত বন্দুক নামিয়ে নিচ্ছে।

শিকার ছেড়ে ছুটে আসতে হলো জমিরের কাছে। বাঘের আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত সে। সর্বাঙ্গে তার রক্ত শতধারা।

আমার প্রাথমিক চিকিৎসার চর্মাধারটি ওরই হেপাজতে ছিল। আমার শিক্ষামত সে কাজটা সে নিজেই সেরে নিচ্ছে তখন।

রক্তক্ষরণের ফলে অবসন্ন তার দেহ। মৃত্যুভয়ে জমির হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে, বারবার করে মনে করিয়ে দেয় আমাকে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, হুজুর—কেউ বাঁচে না'।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—কথাটা যে নির্ঘাত তা আমরাও জানি। তাই তাড়াতাড়ি জমিরকে নিয়ে নিকটের কোন গাঁয়ে পৌঁছুতে হবে এক্ষুণি।

জমিরকে আমার ঘোড়ার উপরে চাপিয়ে নিলুম। ময়না ওর ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নেবে মৃত শিকারকে।

ময়নার বাহনটি কিন্তু বাঘ দেখে যেন আঁৎকে উঠলে একেবারে। হোক সে মরা, হোক সে নাবালক, বাঘের বাচ্ছা তো সে হাজার হলেও।

বেপরোয়া হাত পা ছুঁড়ে আর হ্রেষাধ্বনিতে সে তার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলে।

অগত্যা আমার শিকার আমি চাপিয়ে নিলুম আমারই ঘোড়ার পিঠে।

আমার ঘোড়া মানে আকতারের সেই দুর্বিনীত অশ্বরাজ। আকতার ওর মালিক মাত্র—সওয়ার হবার সৌভাগ্য হয়নি কোন দিন ওর।

চমৎকার ঘোড়া। অবাক হয়ে গেছিলুম সেদিন ওর শিক্ষা, বুদ্ধি, বোধশক্তি আর যুদ্ধকৌশল দেখে।

বন্দুকে গুলি ভরবার সেই মুহূর্তে তুরন্ত দৌড় সে সংযত করে নিল এক ইঙ্গিতে। বন্দুক ভরা হলো—ছোট্ট একটা খুট্ শব্দ। তীরের গতিতে সে যেন আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধে।

কিছুটা কোণাকুণি ছুটে এসে চমৎকার ভাবে সে তার গতিবেগ সামলে নিল বলেই শিকারের বলিষ্ঠ পঞ্জর ভেদ করে গেল আমার গুলি।

আমার ইঙ্গিত মত কাজ করেছে সে। প্রথমবারে তো ওর মাথার উপর দিয়েই গুলি ছুঁড়েছি আমি। মাথার উপরে বন্দুকের নল দিয়ে টোকা দিয়েছি। তক্ষুনি সে মাথা-নিচু করে নিয়েছে। গুলি ছুটেছে তারপর। অথচ গুলির শব্দে সে ভয় পায়নি এতটুকুও।

আখতারের ঐ ঘোড়ার পিঠে ছিলুম বলেই সেদিন সম্ভব হলো সেই অসম্ভব।

আবাদী এলাকার সবখানেই সেদিন স্বস্তির নিশ্বাস। সান্ধ্য-প্রদীপ যেন আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠলো মানুষের মনের আঁধারকে আলো করে!

শুধু জমিরের ঘরেই জমাট বেঁধে রইল কালো কান্না।

কাছারির একটা ছোট্ট ঘরেই রাখা হলো জমিরকে। আমাদের ডাক্তার বাবুর কাছে যেটুকু বিদ্যে শিখেছিলুম প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে সেটুকুই যথেষ্ট।

ক্ষতগুলিকে বেশ ভালভাবেই ধুয়ে নিলুম। তারপর মার্কারি আয়োডাইড সলিউশন জলে গুলে নিলুম, প্রতি কোয়ার্ট জলে একটি ট্যাবলয়েড। পরিষ্কার বোরিক কটনের প্যাড তৈরী করে মার্কারি সলিউশনে ভিজিয়ে নিয়ে ঘা এর উপর দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলুম। গভীর ক্ষতগুলিকে ব্যাণ্ডেজ না করে সলিউশনে ভেজানো পটি দিয়ে ঢেকে দিলুম শুধু।

স্পিরিট ঘায়ের পক্ষে ভাল নয় ঠিকই। তবু স্নায়ুগুলিকে সতেজ বা স্বাভাবিক রাখতে অমন ভাল ওষুধ কিছু আর ছিল না তখনকার দিনে।

বাবার শাসন মত সব সময়েই এগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট একটি চামড়ার বাক্সে থাকতো ব্যাণ্ডেজ গজ, বোরিক পাউডার, তুলো, আয়ডোফর্ম, টিনচার আয়োডিন, মার্কারি সলিউশন, পরিষ্কার জল আর কাঁচের সিরিঞ্জ ও কাঁচি।

রাগ হতো এক এক দিন। মাস কয়েক পর পর ওষুধপত্রগুলি বদলে নিতে হতো। অকারণ ঝামেলা, অকারণ বোঝা বহে বেড়ানো।

তারপর হঠাৎ একদিন যখন দরকার পড়লো সেদিন বুঝলুম, বন্দুক যেমন সঙ্গী করেছি তেমনি আত্মরক্ষার জন্যেই সঙ্গী করেছি এই প্রাথমিক চিকিৎসার চর্মাধারটিকে।

এ যাত্রা জমির সেখ তাই রক্ষা পেলেও পেতে পারে।

মাংসাশী জীবের নখের আঁচড়ে যে বিষ, কালকেউটের বিষের চাইতে সে কিছু কম নয়। দুয়েই ওরা সমান অনিবার্য। তবে সময়ের প্রশ্ন একটা আছে বৈকি।

সারা রাত্রি জমিরের পাশেই বসে কাটাচ্ছি। নায়েব মশায় ওঁর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স থেকে কি যেন একটা ওষুধ দিয়েছেন।

জমির সেখ ঘুমুচ্ছে না বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে তা বুঝবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে সে যন্ত্রণায়। মনটা আমার মুষড়ে পড়ে। দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেন জমিরের সেই আর্তনাদ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

রাত দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে। বারান্দায় জেগে বসে আছে ময়না আর রূপো বরকন্দাজ। আঙিনায় পাহারা দিচ্ছে অন্য কে একজন।

আমার চোখের পাতায় নেমেছে ঘুমের ভার। হঠাৎ চমকে উঠি, ঘুম ছুটে যায়। একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনলুম যেন।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছি।

আঙিনায় যে পাইকটি পাহারা দিচ্ছিল—ছুটে এসে উঠে পড়েছে সে বারান্দায়। ময়না তাকে ধমক দিচ্ছে, 'শয়তানীডা এখনও অনেক দূরে মিঞা। এতেই চোখে ছানবড়া দেখতিছ! ওডা তো আসতিছে কাছারি। তখন কি করবানে!'

ময়নাকে জিজ্ঞেস করি, সে কেন এমন অনুমান করলে।

ময়না শুধু মুচকি হাসে।

শয়তানী হলেও সে সন্তানের মা। 'বাচ্চার শোকে মার পরাণ বিদরে'।

খুবই সোজা কথা। অবাধ্য আর অতিমাত্রায় উদ্ধত এই ছোকরা। মানেনি মায়ের মানা। প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে তাই: 'পেটের বাচ্চা—সে যদিবা বদ হয়, মা কি তার সৎমা হয়?'

আরও একটি বাচ্চা তার কোলে—সেটি তার সবেধন নীলমণি কন্যা। কন্যার কথা চিন্তা করে বাঘিনী হয়তো কাছারির উপর চড়াও হতে সাহস পাবে না। তা ছাড়া মানুষের সম্পর্কে সে এখন অনেক বেশি সেয়ানা। ছেলের মায়া মাকে টেনে নিয়ে আসছে—বাঘিনী মা কাছারির কাছাকাছি কোথাও আসবে ময়না তার মত প্রকাশ করে।

জমিরকে ছেড়ে উঠতে পারলুম না আমি। ময়না একাই যাচ্ছে দেখে পাঠক সিংকেও পাঠালুম ওর সঙ্গে।

বাঘিনীর কথা কিন্তু মনে স্থান পেলনা। ভাবছিলুম ওর বাচ্চাটির কথা।

বারান্দার উপর এমনভাবে ওকে রাখা হয়েছে যেন সে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যেই লাফ দেবে এবার। পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়েছে ওর দেহের উপর। কচি চামড়ার উপরে সদ্য

টানা তুলির রঙ এখনও কাঁচা। আলোর প্রতিফলনে মোহময় তার রঙবাহার।

উঃ! কি দুঃসাহসী এই ছোকরা। এখনও সে কুমার কিশোর, এখনও সে নিতান্ত শিক্ষানবীশ। কিন্তু কৌশল আর বুদ্ধির যে নজীর সে রেখে গেছে তারও তুলনা মেলা ভার।

জমিরের মুখেই শুনেছিলুম সেই অদেখা ঘটনার বিবরণ।

ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠেছিল সে। জমিরের ঘোড়া এই অভিনব সওয়ারের স্পর্শ পেয়েই পেছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তক্ষুনি। ফলে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়লো শিকার ও শিকারী দুজনাই।

মায়ের কাছে পাঠ নিয়েছে সে। চমৎকার প্রয়োগ করেছে তার অধিগত বিদ্যা।

শুধু একটি মাত্র ভুল—সেই ভুলেরই মাশুল দিয়েছে সে। কিন্তু মুখে ওর অনুতাপের চিহ্ন মাত্র নেই।

বেশ বাড়বাড়ন্ত চেহারা—দেহ ভঙ্গীমায় তখনও পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে তার উদ্ধত আত্মপ্রকাশ।

দুচোখ ভরে দেখেছিলুম ওকে—রূপময় বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনার একটা মুখর চিত্রলিপি।

বাঘিনীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না আজ দু তিন দিন। একটা গরু-বাছুর, একটা ছাগল পর্যন্ত খোয়া যায়নি কারো।

পূর্ণিমা এসেছে—জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন। উথলে উঠেছে নদীর যৌবন-জোয়ার। বাঁধ সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে সবাই।

আবাদী মানুষের প্রাণের আনন্দও যেন উপচে উঠতে চাইছে বুকের পাঁজরার বন্ধন ভেঙে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও তাই ওরা এসে জড়ো হয়েছে সন্ধ্যার পরেই।

কাছারির আঙিনায় চলেছে যাত্রাগান —বনবিবির পালা।

ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বনবিবির বাকযুদ্ধ উপভোগ করছে সবাই। হেসে মরছি আমিও।

ব্যাঘ্রদেব দক্ষিণ রায় বলছেন,

'বজ্র হেনে আমার বাহন
মারল রাজার পুত।
ওরে হোঁদল, ওরে কোঁদল
কইলি কি অদ্‌ভূত!'

হোঁদল-কোঁদল হচ্ছে রাজার মন্ত্রী এবং সেনাপতি। রাজার বিস্ময় ভাব দূর করবার জন্যে তখন হোঁদল-কোঁদল একসঙ্গেই নিবেদন করে

'শোনগো রাজা শোনো—
ইথে সন্দো তো নাই কোনো।
এই নিবেদন করিয়া কই তোমার ছিচরণে।
রক্ষে করো প্রজা তোমার
বিচার করি মনে।'

কিন্তু দেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রজাকুলও তো নিতান্ত নিরীহ নয়। চতুষ্পদী বংশে তারাই তো অবিসংবাদিত রাজা। নখর তাদের ডাক্তারবাবুর ছুরির চাইতেও ধারালো, দন্ত তাদের মহিষাসুরের কৃপাণের মতই কার্যকরী, বিদ্যুতের চমক ওদের গতিতে আর বামন অবতারের অপেক্ষাও ওরা মায়াবী।

এহেন এক প্রজার উপর চড়াও হবার মত স্পর্ধা কোথায় পেলে ঐ পুচকে মানুষ। এযে দেখি কুম্ভকর্ণের আকাশ-পাতাল জোড়া হা এর সুমুখে দাঁড়িয়ে তার বুকে অস্ত্র হানছে তারই ভক্ষ্য নর-বানর।

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে হোঁদল তো কেঁপেই অস্থির।

সেনাপতি কোঁদলের অমন কাঁপুনি শোভা পায় না। তবুও সে ভয়ে ভয়ে বললে,

'কইতে লাগে ডর

বাজা, তুই আগে অভয কব।'

বাজা অভয় দিলেন তো কোঁদল গলা খাটো কবে বলে,

'কব কি আব, কইতে মবম পোড়ে—

মানষিব সহায় ঠাকুবাণী

চালছে দাবাব বোড়ে।'

সে কি কথা। বনবিবিব এই অন্যায আচবণ তো ববদাস্ত কবা চলে না। বনেব তিনি বাণী, বাহন তাঁব বাঘিনী। অথচ আপন প্রজাব বক্ষণাবেক্ষণেব পবিবর্তে মানুষেব প্রতি তাঁব এই অকাবণ বাৎসল্য কেন!

বনেব বাজা দক্ষিণ বাযেব ঘবণী নন বনেব বাণী বনবিবি। তাহলে এই সমস্যাব একটা সমাধান সম্ভব হতো সহজে।

অতএব বিবিব নিকট হোদলকে দূতরূপে প্রেবণ কবাই স্থিব হলো শেষ পর্যন্ত।

বনবিবিও ছেড়ে কথা কইবাব লোক নন। তিনি তো আব বায মহাশয়েব ঘবণী নন যে খেতে পবতে দেবাব খোঁটা খেতে হবে বলে তিনি পেছপা হবেন।

হোঁদল তাই ফিরে এলো বড দুঃসংবাদ নিযে। বনবিবি সাফ জবাব দিয়েছেন,

'আপন প্রজা বাখবে বাজা

বাজাব ধবম তাই।

লোকালযে বসে বাঘিনী

সবম কি তাব নাই।

আমাব ন্যাটাব ধর্মে মতি

সহায় আমি তাব।

তোদেব বাজাব মিছে বডাই।

চোখ বাঙানি সার।'

হোঁদলের দূতিয়ালীর ফল শুনে দক্ষিণ রায় তো তেলে বেগুন, রেগেই আগুন। মাথার উপরে গদা ঘুরিয়ে আর মালঝাঁপের মহড়া দিয়ে তিনি হাঁক ছাড়লেন,

'আমার ঘোড়া
বৃহৎ লাঙ্গুল
সাজিয়ে তারে আন।
দেখবো আজি
মানুষ ব্যাটা
কেমনে বাঁচায় পেরাণ।'

হোঁদল তখন তার যুদ্ধমত্ত রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়,

'মানুষ ব্যাটার হাতে আছে
বিষম অগ্নিবান—
(ও সে) তাইতো বলীয়ান।'

হোঁদল অমনি চটপট চোখ ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে,

'অগ্নিবাণে ভয় বাসিনা
রাজার হুকুম পেলে,
মায়াবিনী ঐ বনবিবি যে
মায়ায় ঢাকে ছেলে।'

সুতরাং ক্ষুদ্র মনুষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার চাইতে বনবিবির শাস্তি বিধানই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু নারী অঙ্গে অস্ত্রঘাত! বিশেষ করে ওড়নার আড়ালে বনবিবির মুখখানিকে বড় সুন্দর মনে হয় যে। দেহে তাঁর নবীন বসন্ত, চোখে তাঁর হরিণীর মায়া, বুকে তাঁর বসন্ত-ফোটা ফুলের মধু। দেবতা দক্ষিণরায়ের মনটা যেন কেমন করতে থাকে।

অতএব বিচক্ষণ হোঁদল বুদ্ধি বাৎলে দেয়। মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করাই শ্রেয়। মানুষ পুত্রের রক্ষণে বনবিবি যদি যুদ্ধে অবতীর্ণা হন তাহলে তাঁকে বন্দিনী করে বনদেব দক্ষিণরায়ের গৃহিণী

পদে বরণ করা শাস্ত্রসম্মত। এতে ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হবে না। বনবিবিও প্রকৃতপক্ষে বনের রাণী বলেই সম্মানিতা হবেন।

প্রস্তাবটি দক্ষিণরায়েব ভালোই লাগলো। হোঁদল কোঁদলকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়ে রায় মহাশয় তাঁর বাহন বৃহৎলাঙ্গুল ব্যাঘ্রের জন্য হাঁক ছাড়লেন।

বৃহৎলাঙ্গুলও তার প্রভুব আহ্বানে ছুটে এলো হাতে পায়ে হেঁটে। সভায় এসে গলা ফাটিয়ে গর্জন করে উঠলো, 'হালুম-হুলুম'।

নেপথ্যে একজন মাটির কলসীর মুখে মুখ রেখে বৃহৎলাঙ্গুলেব হালুম-হুলুম হাঁক তুটিতে ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করল।

বহু শ্রোতার হৃৎপিণ্ডে বেশ একটু কাঁপুনি লেগেছিল এই শব্দ চাতুর্যে। সেই কম্পনের বেগ স্তিমিত হবার আগেই বাতাসে আছাড় খেয়ে পড়লো আব এক তুরন্ত শব্দ তবঙ্গ।

'আ-উন'—আবো গম্ভীব, আবো ভাবিক্কি ওজন সেই শব্দেব। ধ্বনির চাইতে প্রাণঘাতী ওর প্রতিধ্বনি। অদূরে কেওড়ার জঙ্গলে সহস্র কণ্ঠে বাজে 'আ-উন'। মানুষেব বুকেব ভেতরকাব হৃৎপিণ্ডগুলি চারের গরুর মতই দড়ি ছিঁড়ে ছুটে পালাতে চাইছে যেন।

'আ-উন'—আবার। ভূমিকম্প যেন টান দিল মাটির অতলস্পর্শী শিকড়ে।

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এলো সবার। কয়েক শত মানুষে লাগলো একটা বিষম হুটোপুটি। পাঁচ ছ' হাত উঁচু বারান্দায় উঠবার জন্যে একটিমাত্র কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনতা। ওরা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠবার জন্যে। আর জোয়ান মানুষের দল হাঁকছে লাঠি, সড়কি, বর্শা ও তীরধনুর জন্যে।

ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ার উপরেও সেই একই ব্যাপার! মেয়েরা ছিলেন সেখানে। আর্ত কণ্ঠের চেঁচামেচি আর হৈ হুল্লোড়ে কানে কথা শোনাই দায়।

দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে গেল আঙিনাখানি। যারা বারান্দায় উঠতে পারেনি তারা কেউ চড়েছে গাছের মাথায়, কেউ বা উঠে পড়েছে গোয়াল বা আস্তাবলের চালের উপর।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু কালী আর ময়না। ওদের সঙ্গে বনবিবির বেশে রহমানের বড় ছেলেকেও দেখলুম।

আর একবার ডাক শুনবার অপেক্ষায় আছে ময়না। কালীও বিভ্রান্ত।

বাঘিনী কোনদিকে বা কতদূরে আছে তার কোন আন্দাজ করা যাচ্ছেনা।

কালী বা ময়নার জন্যে ভাবনা হয় না।

কিন্তু, রহমানের ছেলে? কাছে ডাকলুম ওকে। বছর কুড়ি বাইশ বড় জোর ওর বয়স হবে। চেহারা ছবিতে তেমন বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়না, বরং বাবু-বাবু ভাব অনেকটা। বনবিবির বেশে ওকে সুন্দরী বলেই মনে হচ্ছিল। তবে বাপের মতই লাল চোখ, লম্বাটে নাক আর চিবুক। সব মিলিয়ে বাপের মুখের আদল আছে বটে, তবে দৃঢ়তার ছাপ নেই, সেই একরোখা ভাব নেই। কাঠিন্যের চাইতে মুখ চোখে চাতুর্যের চিহ্ন বেশি। বাপের মতই সে কথা বলে কম, তবে যা বলে তেমন জোর দিয়ে তা বলেনা।

জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার ভয় করছেনা মিঞা?'

মাথা নেড়ে সে জবাবে জানালে, 'না'।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কিন্তু বাঘিনীর গর্জন শোনা গেলনা আর।

হাঁড়ির মুখে মুখ রেখে আবার সেই ডাকের নকল করা হলো।

বৃথা চেষ্টা।

বাঘিনীর ডাক এসেছিল খুব নিকট থেকেই। অতএব সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি।

কালী আর ময়না তো আছেই, সঙ্গ নিল মেঠো কুকুরেরাও।

খুঁজে রাত্রি ভোর হয়ে এলো। বাঘিনীর দেখা মিললো না তবু।

প্রভাত, বেলা পেরিয়ে যেতে না যেতেই খবর এলো কিন্তু। কাছারির এক ক্রোশের মধ্যেই মোষ মেরেছে বাঘিনী। চায়ের কাপে চা রয়েই গেল। ছুটলুম আবার।

মোষ মেরেছে সত্যি। তবে কেয়া ঝোপের আড়ালে বসে নিশ্চিন্ত মনে নৈশ ভোজ সমাধা করে বিশ্রামের জন্যে ওরা ফিরে গেছে ওদের দিনের আস্তনায়।

কোথায় সেই আস্তানা?

কুকুর সঙ্গে নিয়ে খুঁজে বেড়ালুম সারাদিন। মিছেই খুঁজে মরি।

হিসাব মিলিয়ে দেখতে চাই—হিসাবে যে গরমিল। দশ-বারো মাইলের অর্ধাচন্দ্রাকৃতি একটি এলাকা জুড়ে বাঘিনীর তৎপরতা সীমাবদ্ধ। পর পর দুটি হত্যাকাণ্ডের মাঝে মিল নাই কোনো, দূরত্বের মাপকাঠিতেও অমিল অনেক। বাঘিনীর সম্পর্কে শুধু একটি মাত্র সত্য এই যে, একই জায়গায় পর পর দু'দিন সে শিকার ধরে না।

নিজেরা বোকা বনে যাচ্ছি এই অতি হিসেবের বেহিসেবী গোঁজামিলে। কুকুরেরাও বার বার হার মানছে দেখে হতাশা আসে মনে।

ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত আনতে পাঠালুম আমার রুকসা আর আয়েষাকে।

শুম্ভ নিশুম্ভকে ছেড়ে রুকসা আর আয়েষাকে আনতে পাঠালুম কেন, তার একটু বিবরণ দেওয়ার দরকার আছে বৈকি।

রুকসার খ্যাতি তখন গাঁয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে পরগণা জুড়ে বিস্তৃত।

আয়েষাও অবিশ্যি কম যায় না। তবে আয়েষা রূপসী মেয়ে। রূপের দেমাকে সে কিছুটা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আয়েষার পাণিগ্রহণের জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভে যখন লড়াই চলতো আয়েষা তখন চোখ ট্যারা করে চেয়ে দেখতো সেই লড়াইয়ের ফলাফল। মুখে কিন্তু এমন একটি ভাব ফুটিয়ে তুলতো। যেন সকল যুগের শুম্ভ-নিশুম্ভের স্বজাতিরা আয়েষাদের জন্যে এমনি লড়াই করবে বলেই বিধাতা তাঁর বিধান রেখেছেন।

শেষ পর্যন্ত শুম্ভেরই জয় হতো। শুম্ভ শক্তিমান, চতুরও বটে, তবে একটু বেশি গোঁয়ার।

আর এই গোঁয়ার্তুমির খেসারতও দিতে হতো আমাকে মুখ বুজে। চোরের মার কান্না যেন।

হঠাৎ একদিন ছাড়া পেয়ে পাড়ার কার জাম গাছে বসে জাম খাচ্ছিল সে আপনার সুখে। বাড়ির বুড়ো কর্তা ওকে লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন হেই হেই করে। শুম্ভ নির্বিকার ছিল প্রথমটাতে। শেষ পর্যন্ত বুড়ো কর্তা নাকি শাপান্ত করে ওর মনিবকেও ওর স্বজাতি বলে সন্দেহ করেন।

এতক্ষণ সয়েছিল শুম্ভ। কিন্তু মনিবের প্রতি এই অপমান সহ্য করার মত নিমকহারাম নয় সে। বুড়ো কর্তাকে রীতিমত দিগম্বর করে ছাড়লে তক্ষুনি।

বুড়ো মানুষ, গাঁ সম্পর্কে দাদু বলে ডাকি তাঁকে। কাঁকালে গামছা জড়িয়ে চলেছেন তিনি শুম্ভের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে আমার বাবার কাছে।

কি বিপদ বলুন তো। এক্ষুণি আকবর আলি কিংবা কানাই এসে বলবে, খোকাবাবুকে ডাকছেন কর্তা।

আর কর্তা যে কি বলবেন, তাও আমার জানা আছে।

মার কানেও কথাটা যেতে উঠতে দেরী হবে না। তার পুত্র-টিকে তিনি বালী সুগ্রীবের দোসর বৈ রাম-লক্ষ্মণ মনে করেন না।

বাবার কাছ থেকে নগদ কাপড়ের দাম ও মার কাছ থেকে নোতুন দশ হাত ধুতি—ডবল লাভ।

তা হোক। বুড়ো দাত্বর ভাগ্যকে ঈর্ষা করি না আমি।

আর বাবা-মার ভয়। না, সে ভয়ও আমার নেই। অপরকে বিশেষ করে অভাবী মানুষকে কিছু দিতে পারার স্নুযোগ এসেছে দেখে তাঁরা মনে মনে বরং খুশি হবেন।

কিন্তু আজ একটু ভিন্ন ব্যাপার। শুম্ভ নাকি বুড়ো ব্রাহ্মণের গণ্ডে চপেটাঘাত করেছে সজোরে, চুলের মুঠি ধরার উপায় ছিল না বলে মাথার টাকে মেরেছে তুহাতিয়া কিল।

অতএব ইনিয়ে বিনিয়ে তুকথা বলে এবং অনেক দর কষাকষিব পরে নগদ পাঁচটা রূপোর টাকা দিয়ে শান্ত করতে হলো বুড়ো দাত্নকে।

শুম্ভেব চাইতে অনেক শান্ত বলে নিশুম্ভের খ্যাতি আছে। ফুটবলের মাঠে সে ফুটবল বহে নিয়ে যেতে পারে আমার হুকুমে। সেলুনের বয়ের মত মাথার চুল টেনে কসরৎ দেখাতে পারে। ফাই ফরমাস খাটতে সে অদ্বিতীয়। শুধু একটি মাত্র ওর দোষ-বড্ড খেয়ালী সে।

'রুকসা কিন্তু ভারী লক্ষ্মী মেয়ে', বলতেন মা। আমার কিন্তু ওকে লক্ষ্মী মেয়ে বলে মনে হতোনা—রুকসা চালাক মেয়ে। দেমাকী আয়েষাকে সে দস্তুরমত দাবিয়ে রেখেছিল এই বুদ্ধিব জোরে।

মানুষের মন-মেজাজ সম্পর্কে এমন বিজ্ঞতা খুব কম মেয়েরই থাকে। মানুষের মুখের কথা সে নির্ভুলভাবেই বুঝতে পারে—চোখের ভাষাও।

রুকসাকে তাই সব চাইতে বেশি ভালবেসেছি আমি। রুকসাও ভালবাসে আমাকে।

রুকসার উপরে আমার একান্ত ভরসা।

রেঞ্জার সাহেবের কিন্তু অগাধ বিশ্বাস ঐ কুকুরের উপর।

কলকাতা থেকে খাঁটি জাতের এ্যালশেসিয়ন কুকুর আমদানী করার কথা বললেন তিনি ।

কনসারভেটর সাহেবও এসেছিলেন। খাস সাহেব মানুষ। সঙ্গে তাঁর ডজন খানেক নানা আকারের কুকুর। একজোড়া শিক্ষিত কুকুরকে তিনি ধার দিলেন দু দিনের জন্যে।

কাছারির পোষ্য এখন কুকুরীমার সেই তিন পুত্র কন্যা। পুত্রটির নাম দিয়েছে কালী। সে হচ্ছে 'ক্যাবলা'।

ক্যাবলা যে মোটেও ক্যাবলা নয় তা দুদিনেই প্রমাণ হয়ে গেল। শিক্ষিত কুকুর জোড়ার হাব-ভাব, চলন-বলন সে অনায়াসেই আয়ত্ত করে নিলে। মায়ের অপমৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে যেন বদ্ধপরিকর।

গন্ধ শুঁকে শিকারের নিশানা করার বেলাতে এ্যালশেসিয়ন গুরুদের মত অতখানি ওস্তাদ হতে পারেনি ও। তবে গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে চলা থেকে শিকারকে কোণঠাসা করবার কায়দা পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে রপ্ত করেছে ক্যাবলা। নাম গোত্র হীন একটা মেঠো কুকুরের এই বাহাদুরি দেখে বেঙ্গার সাহেবও অবাক হলেন বড় কম নয়।

একে তো বয়সে কাঁচা, তায় আবার আকৃতিতে সে বাঘার মত বড় হবেনা ঠিকই। দেহগত দারিদ্র্য ঢাকা পড়বে তার বুদ্ধির ঐশ্বর্যে—বাঘার তুলনায় বেমানান হবেনা ক্যাবলা।

॥ ছয় ॥

বনের অন্দর মহলে বাঘকে খুঁজে বার করা! রূপকথার রাক্ষসের সেই প্রাণ-ভোমরাকে খুঁজে বার করাও বোধ করি এর চেয়ে অনেক সহজ।

দশ হাত দূরে থেকেও নিশ্চিন্ত মনে মানুষকে অনুসরণ করে চলতে পারে বাঘ। বনের রঙে বিধাতা মিলিয়ে দিয়েছেন ওর গায়ের রঙ। শুকনো পাতার উপর দিয়েও সে চলতে পারে মৃত্যুপুরীর নীরবতায়।

বাঘের চলন শুধু ধরা পড়ে বানরের চোখে। বনের অন্দর মহলে বানরই হচ্ছে শিকারীর সেরা সাইরেন। এই বানরের হুঁশিয়ারিতেই প্রাণে বেঁচে গেছি বেশ কয়েকবার।

এবার তাই রুকসা আর আয়েষার উপরে ভরসা করে এগোই।

বাঘিনীর সন্ধান করে দিতে পারে ওরা দুটিতে। গাছের মাথায় চড়ে বসে বনের অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখতে পায় ওরা, সেও ওদের মস্ত সুবিধে।

তবু ওদের নোতুন করে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে। সুন্দর-বনে ওরা জন্মেছে বটে, তবে লালিত হয়েছে মানুষের ঘরে, মায়ের কোলে নয়।

গেঁয়ো-কেওড়ার খণ্ড জঙ্গলেই ওদের ছেড়ে দিলুম প্রথমটাতে। অবাক কাণ্ড। কিছুতেই জঙ্গলে যেতে রাজী হয়না ওরা। বার বার ফিরে আসে আমার কাছে।

অনেক তাড়নার পরে বনের গাছে ওরা চড়ে বসলে বটে, কিন্তু চুপটি করে চেয়ে রইল আমার দিকে কাতর দৃষ্টি মেলে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি আমরা। গাছ থেকে এক ছুটে নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরলে রুকসা।

দুদিন না যেতেই কিন্তু ওরা আমার মর্জি মত কাজ করতে শুরু করে। আমরা যখন এগিয়ে চলি পায়ে পায়ে, ওরা তখন লাফিয়ে চলে গাছে গাছে।

আরো দু তিনটে দিন—ভোল পালটে গেল একেবারে।

বন ছেড়ে ফিরে আসতেই ওরা নারাজ। বন্দুক উঁচিয়ে তবেই ওদের রাগ মানাতে পারি মাত্র।

একদিন কিন্তু জঙ্গলের মধ্যেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল রুকসা আর আয়েষা। সন্ধ্যে হতে চলেছে। ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি। সাড়া দেয়না ওরা।

ফিরে আসছিলুম মনের দুঃখে। রুকসা বা আয়েষা আমার বিবি নয়, পোষা বানরী মাত্র। তবু যেন ছেড়ে যেতে পারছিলুম না। শেষে ভাবি, যাকগে ওরা। বনের প্রাণী বনেই ছেড়ে দিয়েছি তো। ওদের মুক্তি দিয়ে ভরে মনের আঁধার মুছে ফেলতে চাই আনন্দ-আলোতে।

বেশ সহজ হয়েই আসছিল মনটা। ময়নার ইঙ্গিতে নজর ফেরালুম নদীর পাড়ের কেওড়ার জঙ্গলের দিকে। ওখানে তখন রীতিমত হটগোল শুরু করেছে বানরেরা। এখান থেকেও ওদের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কানে আসছে আমাদের।

কিন্তু এ তো সেই কণ্ঠস্বর নয়। এই হৈ-হুল্লোড়ও তো সেই বহু পরিচিত পশ্চাদপসরণ পর্বের তাড়াহুড়া নয়।

বাঘের আবির্ভাবে বানরের ক্রোধ হয় বটে। কিন্তু সেই ক্রোধের সঙ্গে থাকে ভয় আর বিরক্তি। ওদের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয় বুঝি গালমন্দ আর অভিসম্পাত। তা ছাড়া ক্রমাগত উঁচুতে উঠবার চেষ্টায় দোলা লাগে শুধু গাছের মাথায়।

দু দল বানরে লড়াই বেধেছে কি?

না—তাও নয় নিশ্চয়।

যাহোক, ব্যাপারটা দেখবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছি, দেখি বানরপাল ছুটে আসছে আমাদের দিকেই।

ব্যাপার কি ?

পুরোভাগে দুটি মাত্র—চিনতে পারি এতক্ষণে। ওরা আর কেউ নয়—ওরা আমার রুকসা আর আয়েষা। অগুণতি বানর-বানরী তেড়ে আসছে ওদের দুটিকে।

তাড়াতাড়ি বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আক্রমণকারী বাহিনী। কেউ কেউ বা পিছু হটতে শুরু করলে তক্ষুনি।

প্রাণপণে ছুটে আসছে কিন্তু রুকসা আর আয়েষা—স্পষ্টতঃই প্রাণভয়ে। আমাদের আঁকড়ে ধরেও ওদের ভয় ভাঙেনি, লাফিয়ে উঠে পড়লো একেবারে কাঁধের উপর।

বনের বানর এই নবাগতদের বরদাস্ত করতে নারাজ। উপায়ন্তর না দেখে শুম্ভ নিশুম্ভকেও আনিয়ে নিলুম বাড়ি থেকে।

বাঞ্ছিত ফল পেলুম এবার হাতে হাতে। নদীর পায়ের কেওড়ার জঙ্গলে লাফিয়ে চলে ওরা গাছের মাথায়। ভেড়ির নিচে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলি আমরা। মেঠো কুকুরের পালও চলে আমাকে ঘিরে। ক্যাবলার মাতব্বরিকে মেনে নিতে পারেনি ওরা। মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে প্রতিবাদের, মুখর গুঞ্জনের। ক্যাবলা এখন অনেক গুণের অধিকারী। তবে গেঁয়ো যোগী সে। তা বলে হাল ছেড়ে দেবার মতো নিরীহ নয় ক্যাবলা। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লি করবার জন্যেই যেন জন্মেছে সে।

দিনের পর দিন কেটে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন ভাবান্তর দেখা গেল আমার শাখাচারী চার গোয়েন্দার মধ্যে।

শুম্ভ-নিশুম্ভ ধমক দিচ্ছে যেন কাউকে। প্রচণ্ডবেগে গাছের ডাল নাড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছে গাছের তলের কাউকে। তারপর দেখি ভয় পেয়ে ওরা নিজেরাই ছুটে আসছে। গাছে গাছে লাফিয়ে বাঁধের উপরে একে একে নামলো এসে শুম্ভ, নিশুম্ভ আর আয়েষা।

রুকসা ফেরেনি কিন্তু। গাছের মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে সে।

ভেড়ির বাঁধের উপর বসে বার কয়েক গা মাথা চুলকে নিয়ে শুম্ভ আবার ফিরে চললো রুকসার কাছে।

এতদিনে এলো বুঝি পরম বাঞ্ছিত সেই লগ্ন।

ক্যাবলাকে ছেড়ে দিলুম। ক্যাবলা ছুটলো তো ওর সঙ্গ নিলে মেঠো কুকুরের দল।

কেওড়ার জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল ওরা। ওদের একটানা 'ঘউ ঘউ' শব্দ শিকারের অবস্থানের নির্দেশ দিলে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে মানুষের প্রবেশ বুঝি দুঃসাধ্য।

পথ না পেয়ে পথের সন্ধানেই এগিয়ে গেলুম অনেকখানি। সুবিধে মত একটা জায়গা দেখে জঙ্গলের ওপার থেকে এলুম নদীর পারে।

নদীর জল অনেক খানি সরে গেছে তখন ভাটার টানে। জলের গা ঘেঁষে চললুম এক হাঁটু কাদা ভেঙে।

ময়না সাবধান করে আমাকে। সুন্দরবনের কুমীর কিংবা হাঙ্গর বন্দুকওয়ালা মানুষকেও খুব যে খাতির করে এমন কথা কেউ বলবেন না নিশ্চয়।

আমি ভাবছিলুম কিন্তু আর এক কথা। নদীর ই কর্দম সমুদ্র মন্থন করে পাব কি? অমৃত না গরল!

জঙ্গলের অনেকখানি নিচুতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। গুলবিদ্ধ বাঘিনা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে এই একহাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করা একরকম অসম্ভব হবে।

রুকসাকে দেখতে পেলুম। এগিয়ে এসেছে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে।

'ঘউ-ঘউ-ঘউ,' 'খ্যাক্-খ্যাক্'। কোন বাঞ্ছিত জানোয়ারকে কোণঠাসা করেছে ওরা ঠিকই।

কিন্তু বেশ বুঝতে পারি বাঘিনী নয় সে।

তবে কি বিশাল দেহ কোন অজগর! দৈত্যকায় কোন কুমীর!

হতে পারে ওদের যে কেউ।

হুটোপুটি হচ্ছে—কুকুরের দল যেন লড়াই করছে নিজেরাই। অবাঞ্ছিত, তবে ভয়ঙ্কর সেই শত্রু।

কুকুরকুলের কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারি যে শত্রুকে বেড়াজালে বন্দী করে রাখতে নাজেহাল হচ্ছে ওরা।

কাদার উপর বুকে হেঁটে বনের মধ্যে ঢুকে পড়তেই দেখি, কালো কুতকুতে দুখানি পা, লম্বাটে মুখে তীক্ষ্ণ দাঁত শাণিত ছোরার মত উঁচিয়ে, অনলবর্ষী একজোড়া চোখ।

ট্রিগারে আঙ্গুল রেখেছি মাত্র, চোখে পড়লো ওর গলায় বাঁধা চামড়ার বেল্ট। বন্য শূকর নয় তাহলে। পোষা জানোয়ার—কিন্তু কে সে?

কেমন করে আমার বিশ্বাস জন্মালো কি জানি। ময়নাকে বললুম, ওকে ধরে ফেলবার জন্যে বুকে হেঁটে শিকারের পেছন দিক থেকে চেষ্টা করুক সে।

গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে অজগরের মতই বুকে হেঁটে যাচ্ছিল ময়না। কিন্তু শত্রুর নজর এড়িয়ে চলা তো সহজ নয়।

সহজাত বুদ্ধি বলেই সে বুঝে ফেলেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশল। তাই হুড়মুড় করে ছুটে এলো সে।

গুলি করলে তখনও করা যেতো। কিন্তু যখন সে সত্যিই তার হাঁ মেলে ধরলো তখন বন্দুকটাকেই ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না কিছু। সঙ্গে সঙ্গেই আমি ধরে ফেললুম ওর গলার বেল্ট!

একটুখানি ধ্বস্তাধস্তি—মুখ ফিরিয়ে আমার দেহে দাঁত বসাবার আগেই কোমরের একহাতি ছোরাখানাকে গুঁজে দিলুম ওর মুখের

মধ্যে। নিরুপায় ঋক্ষবীর তখন আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বার জন্যেই বোধ হয় দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মানুষের মত।

ময়না ওর মাথার খুলিতে ছোট্ট একটি ঘা মারলে ওর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে।

ভল্লুক ভায়ার সুবুদ্ধি ফিরে আসে ময়নার মার খেয়ে।

নাকের বদলে নরুন—বাঘিনীর বদলে ভালুক। দিনটা মন্দ নয় যাহোক।

বড় অপ্রত্যাশিত; কিন্তু তা বলে সহজ শিকার বলা চলেনা কোনমতে।

এই ভালুকের আক্রমণে তরাই অঞ্চলে দু দুবার আমি বিপন্ন হতে দেখেছি দুজন সাহেব শিকারীকে। একবার আমি নিজেও বিপন্ন হয়েছিলুম দার্জিলিং থেকে কয়েক মাইল দূরে।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

সুন্দরবন অঞ্চলে ভালুক দেখা যায় না—অবাক হয়েছিলুম তাই। কি জানি কার পোষা ভালুক পালিয়ে এসেছে কেমন করে।

রূপো বল্লে দু বছর আগের এক গল্প—হয়তো সে সত্যি গল্প।

ভিনদেশী এক ভালুকওয়ালা এসেছিল তার এক জোড়া ভালুক নিয়ে। ভালুক খেলিয়েই রুজি রোজগার চলতো তার। একদিন সে খেলা দেখিয়ে ফিরছিল তার ঘরে। সঙ্গে চলেছিল একপাল ছোকরা। হঠাৎ কি হলো কে জানে। পুরুষ ভালুকটি ক্ষেপে গেল, আক্রমণ করলো ওর মালিককে। কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি—মরণ আলিঙ্গন একেবারে।

তারপরে পালিয়ে গেল ওরা। কেউ আর ওদের খোঁজ করেনি এতদিন।

রূপোর গল্প সত্যি হলে জোড়ার অপরটি গেল কোথায়?

পাঠক সিংও বললে আর একটি গল্প।

এই কাছারি এলাকাতেই সুধো গাইনদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল এক রাতে। গাইন বাড়িতে ছিল ওদের পোষা ভালুক। ছাড়া থাকতো সে রাতে। ডাকাত দলের তিন চারজন ঐ ভালুকের হাতেই জখম হয়েছিল সাংঘাতিক ভাবে। শেষ পর্যন্ত ঐ ভালুকের বিক্রমেই নাকি ডাকাতদলকে পিছু হটতে হয়। তবে সেই থেকে ভালুকটিও উধাও।

রাত দুপুরে যখন চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে ঘুমে, মনের চোখে তখনও ঘুরে মরছে ঐ সন্ধ্যে রাতে শোনা গল্প দুটি। বোধ হয় তখনও ভাবছিলুম, একটি না হয়ে একজোড়া হতো যদি ওরা, তা হলে আমি বনেই ছেড়ে দিতুম ওদের।

দিন যায়, দিন আসে। দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে আসে আমার। রাত পোহালে ফিরে যাব আমি আবাদী অঞ্চল ছেড়ে।

রাত পোহাতেই কিন্তু কাছারি সরগরম হয়ে ওঠে। আর্ত প্রজার দল আর্জি পেশ করে, এখন কি উপায়!

উপায় যা ছিল তা পরীক্ষা করে দেখেছি, করণীয় যা করেছি তা। বাঘিনীর সন্ধানে উদয়াস্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটেছি, রাতের বেলায় ওৎ পেতেছি বনেবাদাড়ে। বন ঘিরেছি, মাচানে বসে টোপ ফেলেছি। এক কথায় শিকারীর সব বিদ্যে বুদ্ধি আজ ব্যর্থ করেছে বাঘিনী। ময়না শিকারীর মাথা হেঁট হয়েছে, আর আমিও ফিরে যাচ্ছি পরাজিত হয়ে। মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে। এই লজ্জার চাইতে মৃত্যুও বুঝি গৌরবের।

অভয় দিয়ে ওদের বিদায় দিলুম। মনে মনে ভাবছিলুম কত বড় মিথ্যে অভয় দিলুম।

বোটের মাঝি তাগিদ দেয়, জোয়ার বয়ে যায় যে।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নেবো বলে ঘরে ঢুকেছি, দেখি আমারই শয্যাপার্শে দাঁড়িয়ে আছে বোরখা পরা একটি বউ।

হতভম্ব হয়ে যাই। কার এত সাহস!

হাত দিয়ে মুখের উপর থেকে বোরখা সরিয়ে দেয় বউটি। তরুণী, সুন্দরী, চমৎকার মুখশ্রী মেয়েটির। মনে হয় বড় চেনা। চিনতে পারি না।

'চিনতে পারছো না আমাকে?'

চুপ করে থাকি।

'আমার শাদিতে বাবা এসেছিলেন। তুমি এলে না কেন? আমি এখন বড় ঘরের বিবি।'

মেয়েটির প্রশ্নে হাঁপিয়ে উঠি যেন।

'আমি রাবেয়া—এখনও চিনতে পারোনি আমাকে! আমি তো তোমাকে চিনতে ভুল করিনি।'

'তুমি যে অনেক বড় হয়ে গেছ রাবেয়া'—এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেলুম আমি।

'তুমিও তো অনেক বড় হয়েছ। একশো বছরের বুড়ো হয়ে গেলেও আমি তোমাকে চিনতে ভুল করতুম না।'

বাইরে নায়েব মশায়ের অকারণ কাশির শব্দ কানে আসতেই দুজনেই চমকে উঠি আমরা।

'অনেকক্ষণ ঢুকেছি তোমার ঘরে। হাঁ শোন, যা বলতে এসেছি। বাঘের পেছনে এমনি করে ছুটে বেড়ানো চলবে না, ভয়ে আমি ঘুমুতে পারি না রাতে।'

'বাঘ নয়, বাঘিনী। শাদি করবার লোভ হয়েছে ওকে। তাই খুঁজে মরছি।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠি আমি হো হো করে। রাবেয়ার মুখের উপর নজর পড়তেই মুখের হাসি কিন্তু মিলিয়ে যায়।

ওর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কাজল-ধোয়া বড় বড় চোখের জলের ফোঁটা।

নিজেকে সামলে নিলে রাবেয়া।

'বেশ, পথ ছাড়, আমাকে যেতে দাও'—পা বাড়ায় মেয়েটি। রাবেয়াকে বোঝাতে যাচ্ছিলুম যে এই বাঘিনী আজ গোটা অঞ্চলের অভিশাপ। আবাদী প্রজার জীবন রক্ষার জন্যে বাঘিনীকে হত্যা করা আজ একান্ত দরকার। সহস্র মানুষের আশীর্বাদ পাব আমি ঐ শয়তানীকে মেরে।

ফিক করে হেসে ফেললে রাবেয়া—'সেই মারকুটে স্বভাবটা বুঝি যায়নি এখনও।'

ওর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে আবার।

'বেশ, যা খুশি তোমার তাই করো'—মুখের উপর বোরখা টেনে দেয় রাবেয়া।

'কাছারির খিড়কির দরজায় পালকি রেখে এসেছি। খিড়কি দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছি তাই। মনে রেখো আমার বাড়ির খিড়কি দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই নদী। অনেক জল ওখানে—তাই না!'

দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রাবেয়া আমার বিমূঢ় দৃষ্টির সুমুখে। বাধা দেওয়া দূরে থাক, একটা কথা বলাও সম্ভব হলোনা।

জোয়ারের টানে আর চার চারখানা দাঁড়ের ঠেলায় নেচে চলেছে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও।

দেহ মন দুটোই যেন এলিয়ে পড়েছে অকস্মাৎ। চোখের সুমুখে রাবেয়া, মাথার মধ্যে রাবেয়া, আমার বুকের উপর যেন টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়ছে দুটি আয়ত চোখের অশ্রু।

রাবেয়া—রাবেয়া—কে সে আমার! স্বজাতি-স্বজন কেউ নয়। সে মুসলমানী—প্রজা বৈ কেউ নয় সে।

না—মিথ্যে বলবো না। অরণ্যচারীর জীবনে উৎকট উলঙ্গতা আছে হয়তো, কিন্তু মিথ্যাচার তো নেই।

তাদেরই জীবন-বেদ লিখতে বসে তাদেরই লেখক আমি সত্যভ্রষ্ট হবো কেন!

সত্য—তা সে যত দুঃসহ হোক, যতই নগ্ন হোক—সেই সত্যকেই আশ্রয় করতে যে শিক্ষা দিয়েছে ঐ অরণ্য আদিম।

উপন্যাসের লেখক হয়তো রাবেয়াকে হাজির করতে চাইতেন না।

আমিও তাকে ডাকিনি। সে এসেছে নিজে। আর এসেছে যখন তখন তাকে বাদ দিয়ে কাহিনীকে আর সম্পূর্ণ করতে পারি কই!

এই কাছারির এলাকায় বাস করতেন এনায়েৎ খাঁ। আইনের চোখে তিনি প্রজা। জমিদারের চোখে তিনি অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু।

খাজনা তাঁকে দিতে হয়নি কখনও। তবু যে পাইক-পেয়াদা বা নায়েব গোমস্তারা এনায়েৎ খাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতো সে শুধু জমিদারের উপহার বহে নিয়ে যাবার জন্যে। জমিদারের হুকুমে এনায়েৎ খাঁকেও মনিব বলে ভাবতো কাছারি।

জমিদার প্রজার বাড়িতে যান না—সেকালে সেইটেই ছিল নিয়ম।

আমার কিন্তু বেশ মনে পড়ে বাবার সঙ্গে এনায়েৎ খাঁর কোলে চড়েই আমি তাঁর বাড়িতে যাই প্রথমে। এনায়েৎ খাঁর বিবি এসে কোলে তুলে নিলেন আমাকে।

একেবারে কচি বাচ্চা তো নই তখন। মেয়েদের কোলে উঠতে আপত্তি হবারই কথা।

বাবা বল্লেন, 'তোমার কাকিমা—কোলে উঠেই যাও'।

এনায়েৎ খাঁ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'আমার বেটিকে আমি শিখিয়ে দেবো বৌমাকে মা বলবে, তোমাকে ডাকবে বাবা বলে।'

বাড়ির ভেতরে এসে দেখলুম এনায়েৎ খাঁর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, হাঁটি হাঁটি পা পা হাঁটছে আর মাটিতে পড়ে গেলেই হেসে কুটিপাটি।

এনায়েৎ খাঁর মেয়ে বড় হলো। এখন সে বায়না ধরে 'বাবার' কাছে যাবে বলে।

এনায়েৎ খাঁ তো প্রজা নন। তাই আমাদের বাড়িতে এলে কাকাবাবুকে এগিয়ে নিতে আসি আমি। রাবেয়া ওর বাবার হাত ছেড়ে ছুটে আসে আমার কাছে।

রাবেয়ার বয়স বাড়ে, দুষ্টামিও বেড়ে চলে। কাছারিতে গেলে দেখি ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সে আমারই প্রতীক্ষায়। হাত ধরে সে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে আমাকে ওদের বাড়ির দিকে। কানের মধ্যে মুখ নিয়ে বলে, কোন গাছে কত কুল হয়েছে, আম পেকেছে না এখনও কাঁচা জারিয়ে খেতে পারি। কোন গাইয়েব বাছুর হয়েছে, কোন বকরীর ক'টা বাচ্চা আমাকে সে দেবে—এই সব কত কথা।

মৌলভীর কাছে বাড়িতে ওর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমি যে কদিন থাকবো সে কদিন সে পড়বেনা—বাবেয়াব বুকের মধ্যে কথার সমুদ্রে যেন ঝড়ো হাওয়া লাগে।

কথা নয়—কাজও। এনায়েৎ খাঁর একমাত্র দুলালী কুল গাছে চড়ে। গাছের তলে দাঁড়িয়ে আমি তাব কুল কুড়িয়ে জড়ো কবি, আম কি জাম কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরি।

আমি ছিপ ফেলে মাছ ধরি, রাবেয়া বড়শিতে চার গাঁথে।

এনায়েৎ খাঁ আর তাঁর বিবি মুচকি হাসেন।

বয়স ওদিকে বেড়েই চলেছে।

পূজার সময়—বাবা ওকে কিনে দিয়েছেন মখমলেব জরি বসানো সালোয়ার-পাঞ্জাবী-ওড়না আর মাথায় দিয়েছেন পালক পরানো বেগম সাহেবী টুপি।

মা ওকে সাজিয়ে দিয়েছেন সেই ঝকমকে সাজে। 'বেটি যেন দিল্লীর বাদশার বেগম', বললেন এনায়েৎ খাঁ। বাবা বললেন, 'বিয়ের সময় ওকে আমি সাজিয়ে দেবো রাণীর বেশে, বেগমী পোশাকে নয়।'

রাবেয়াকে সেদিন খুব ভাল লেগেছিল, অবিশ্যি ভাল ওকে বরাবরই লাগতো। তবু যে মাঝে মাঝে চড় চাপড়টা মেরে বসতুম তার কারণও ছিল বৈকি।

ওর সব ভাল। শুধু একটা দোষ। আমার পোষ্যদের উপর মোটেই খুশি নয় রাবেয়া। আমার বানর-বানরীদের সে ভেঙচি কাটবে, হরিণশিশুকে তাড়া করবে অকারণে—এমনি কত অনাছিষ্টি কাজ।

সেদিনেও ওর চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছি। তুকান মলে শাসন করেছি। আমার হাতের উপর গোটা কয়েক চড় মেরে ভেঙচি কেটে রাবেয়া ছুটলো বাবার কাছে কাছারিতে।

কাছারিতে অনেক লোকজন। মৌলভী এসেছে, কাজী এসেছে। বিচার চলছে তখন।

শাদি হয়েছিল। তারপর স্বামী তালাক দিয়েছে স্ত্রীকে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ভোগদখল করছে তখনও। স্ত্রীর নামে কেনা সম্পত্তি। আইনের জোরে ভূতপূর্ব স্বামীকে আমল দিচ্ছেনা স্ত্রী —এমনি কি একটা ব্যাপার!

ঘরময় গম্ভীর আবহাওয়া। রাবেয়া কিন্তু অতশত বোঝেনি। ছুটে গিয়ে আমার নামে নালিশ জানায়—'বা· তোমার ছেলে আমার চুল ছিঁড়ে দিয়েছে, কান মলে দিয়েছে।'

রাবেয়াকে কোলের ভিতর টেনে নিলেন বাবা, এক্ষুণি তোমার বিচার করে দিচ্ছি মা। আগে ওদের বিচারটা করে দিই।'

কাজী আর মৌলভী সাহেবদের দিকে লক্ষ্য করে বাবা বললেন, 'ওদের আবার বিয়ে দিয়ে দিলেই তো গোল মিটে যায় কাজী সাহেব। তাই করুন না কেন।'

কাজী আর মৌলভী সাহেবেরা মিলে হৈ হৈ করে ওঠেন, 'সাবাস, তোবা, তোবা, হুজুরের কথা—বড় ভাল বিচার হয়েছে হুজুর। সব কুল বজায় হল হুজুর।'

সবাই খুব খুশি, ফরিয়াদীর মুখে মুচকি হাসি, আসামীর মুখে লজ্জার লাল চমক।

বর কনে বাবাম্মু পায়ের ধুলো নিলে—দুপক্ষই খুশি। রাবেয়া কিন্তু মুখ ভার করে, 'এবার আমার বিচার।' বাবা বলেন, 'কাজী সাহেবকে তোমার আর্জি বল তাহলে।' কাজী সাবে হো হো করে হেসে ওঠেন।

'দেওয়ানী মামলা নয় হুজুর, রীতিমত মারপিট ফৌজদারী ব্যাপার। তা আসামীকে তলব করে আনি আগে।'

'তারপর ?' রাবেয়ার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় ওর জিজ্ঞাসায়।

'তারপব—তারপর'! কাজীসাহেব বেশ সমস্যায় পড়েছেন মনে হলো।

'তারপর কি ? কিচ্ছু জানেনা কাজী সাহেব।'

'জানিনা—খুব জানি আসুক আগে আসামী। তাবপর দেবো শাদি করিয়ে। আব ঝগড়া মারপিট কিচ্ছু করতে হবেনা! আব তালাক হয়েছে কি আবাব শাদি দিয়ে দেবো।'

কাজী সাহেব তাঁর নিজেব রসিকতায় হেসে উঠলেন হো হো করে। ঘরশুদ্ধ হাসিতে ফেটে পড়লো। পর্দার আড়াল থেকে দেখলুম, দুড় দুড় করে ছুটে পালিয়ে গেল রাবেয়া।

আবার যখন দেখা হলো রাবেয়াব সঙ্গে, সে তখন ভেঙচি কেটে বললে, 'কিচ্ছু জানেনা কাজীসাহেব। আমাকে মারবে আর আমি বুঝি তাকে শাদি করবো। বয়ে গেছে অমন মারকুটে ছেলেকে শাদি করতে।'

রাবেয়া বড় হচ্ছে—আমিও।

তারপর অনেকদিন পরে, কাছারির ঘাটে এসে ভিড়লো আমার নৌকা। এনায়েৎ খাঁ এগিয়ে এসে হাত ধরে নামিয়ে নিলেন আমাকে। কিন্তু রাবেয়া কই!

কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করলো সেদিন। আমিও বড় হয়েছি বুঝি।

রাবেয়াদের বাড়িতে গেলুম। দরজায় দাঁড়িয়ে কাকিমার সেই আগেকার মতই অভ্যর্থনা।

কিন্তু রাবেয়া!

সকাল থেকে ক্ষেতের কুমড়ো, বেগুন, শশা, বাতাবি লেবু, আর করমচা তুলে গুছিয়ে রেখেছে সে। পুকুর থেকে মাছ ধরিয়েছে। কিন্তু বড় হয়েছে বলে কাছারির ঘাটে যেতে পারেনি রাবেয়া। কাকিমা ওর মেয়েকে ডাকাডাকি করলেন। মেয়েও সাড়া দিলে পাশের ঘর থেকে। কিন্তু যাচ্ছি বলেও এলো না সে। অতএব আমাকেই যেতে হলো উঠে।

'রাবেয়া!'

চোখ তুলে অপলক চেয়ে রইল শুধু। একটিও কথা নেই ওর মুখে।

আমিও অবাক হয়ে যাই।

যৌবনের ছোঁয়া লেগেছে। যৌবন তার দেহে এনেছে রূপ—এত রূপ যে দেহের সীমায় তাকে সীমায়িত করা সম্ভব হয়নি বলেই যেন সে উপচে পড়ছে দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেয়ে।

শুধু রূপ! যৌবন ওকে আরও অনেক কিছু দিয়েছে। দিয়েছে লজ্জা নম্র চেতনা, আত্মস্থ করেছে ওকে আপনার মধ্যে।

'আমি এখন বড় হয়েছি'—ওর কম্পিত ওষ্ঠ প্রান্তের কটি সলজ্জ কথা আমাকেও মনে করিয়ে দিলে যে আমিও এখন বড় হয়েছি।

যৌবন দিলে অনেক কিছু। কিন্তু কিশোর-কিশোরী দুটির জীবন থেকে কেড়ে নিলে অনেক কিছু।

যৌবন এনেছে উন্মাদনা, কিন্তু কেড়ে নিলে যে সুধাসিন্ধুর বৈকুণ্ঠ মাধুরী, দুজোড়া ডাগর চোখের স্বপ্ন বিলাস, সহস্র কল্পনা।

বড় হওয়াটাই কাল হলো দুই কিশোর-কিশোরীর জীবনে।

ওরা আর ধানের ক্ষেতে লুকোচুরি খেলেনি, গাছের তলে তলে ফুল-ফল কুড়িয়ে জড়ো করেনি, কাছারির কড়া পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে নদীর ঢেউয়ে নৌকা ভাসায়নি। কত দিনের কত খেয়ালীপনার উপর চিরকালের মত যবনিকা টেনে দিলো যৌবন।

সেবারে যখন রাবেয়ার কাছে বিদায় নিতে গেলুম, তখন ওকে আঁতি পাঁতি করেও খুঁজে পেলুম না কোথাও। পথের ধারে বকুল গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

'কাজীসাহেবরা বলছে হিন্দু আর মুসলমান নাকি ছুটো জাত। আচ্ছা, মানুষের জাত তো মানুষ। তবে ওরা কেন এমন মিথ্যে বলছে। তুমি যখন আরও বড় হবে তখন ঐ মিথ্যেবাদীদের বিচার করবে না!'

—রাবেয়ার ছুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল বড় বড় জলের ফোঁটা।

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। তবু নৌকার কামরায় নিশ্চিন্ত শুয়ে সেই কথাগুলোই কানে বেজে ওঠে। আর বাজে তার সেই ভয়ঙ্কর কটি কথা—

'আমার বাড়ির খিড়কি দিয়েও বহে যাচ্ছে এই নদী। অনেক জল ওখানে—তাই না!'

মনের অস্থিরতায় চিঠি লিখতে বসলুম রাবেয়াকে। লিখি আর ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলি আমার লেখা পাতাগুলোকে। কিছুতেই মনের মত হয় না। শেষ পর্যন্ত একছত্র মাত্র লিখলুম—'তুমি যখন একশো বছরের বুড়ি হবে তখন আমার চোখের দৃষ্টি কমে যাবে। তবু দেখো, আমি ঠিকই চিনতে পারবো তোমাকে। প্রমাণের অপেক্ষায় থাকো।'

চিঠিটাকে খামে পুরে কামরার বাইরে আসছিলুম হঠাৎ কানে এলো রূপোর গলা, 'নৌকা ভেড়াও নৈমদ্দি।'

হ্যাঁ, খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে রূপো বরকন্দাজ হাঁকছে সত্যি। জরুরী কাজ নিশ্চয়। ঘোড়ার পিঠে চেপে তিন চার মাইল পথ ছুটে এসেছে রূপো আর সেলিম।

'হুজুর, মানুষ—মানুষ মেরেছে বাঘিনী।' একপাওয়ালা ফরমান খাঁ তার ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে কাছারিতে। খবর শুনেই রওনা হয়েছে ময়না সেই হতভাগ্য শিকারকে খুঁজে আনতে।

নৌকা ছেড়ে ঘোড়ার পিঠেই ফিরে চললুম কাছারিতে।

নদীর বাঁকে দেখতে পেলুম জেলে ডিঙ্গি। দশখানা বোঠে পড়ছে তার দুদিকে। কাছারির দিকেই ছুটে আসছে ডিঙ্গিখানা। জলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে গাঙচিল যেন।

ডিঙ্গি ভিড়লো কাছারির ঘাটে। ওষুধ-পত্র নিয়ে ছুটে গেলুম আহতের কাছে। ঝুঁকে পড়লুম ওর ক্ষতগুলি পরীক্ষার জন্যে—রক্তের জমাট দানায় গোটা মানুষটাকেই লাল কাপড়ে মোড়া বলে মনে হচ্ছে।

'হু-জু-র'—

কে—কে তুমি! উঃ! কি নির্মম পরিহাস প্রকৃতির, কি দুর্লঙ্ঘ্য বিধান!

'রহমান--রহমান'—আমি ওর ঝুলে পড়া চিবুক তুলে ধরি দু'হাতে।

'বেইমানী—শয়তানী—বে-ই-মা-নী'—রহমানের মুখের শিরাগুলি একবার স্ফীত হয়ে ওঠে, বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে।

তারপরে ধীরে ধীরে নিভে যায় তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি, ঝুলে পড়ে চিবুক।

রহমানের মুখে শোনা হবেনা আর বাঘিনীর সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা।

জেলেদের মুখে শোনা গেল, শুধু শেষ অধ্যায়টি। বাঘিনীর

কন্যার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নদীর উঁচু পাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছিল সে নিচে, একেবারে জলের কাছাকাছি। হাত থেকে ওর ছিটকে গেছিল একটা বল্লম। সেই বল্লমটাকে কুড়িয়ে নেবার জন্যেই কয়েক পা ছুটে গেল রহমান। সবেমাত্র বল্লমটিকে আঁকড়ে ধরেছে সে, পাড়ের উপর থেকে তীরবেগে ছুটে এলো বাঘিনী। থাবা মারলো ওর পিঠে! রহমান সেই আঘাতে ছিটকে পড়লো একহাঁটু জলে।

বাঘিনী ইচ্ছে করলে দিব্যি মুখে তুলে নিয়ে যেতে পারতো রহমানকে। কিন্তু সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল তার নিজের জায়গাটিতে। ওর কন্যা কিন্তু ছুটে এলো রহমানকে মুখে তুলে নিতে। মায়ের ক্রুদ্ধ গোঙরানি শুনে সে থমকে দাঁড়ালো রহমানের কাছে এসে।

আবার মা দিলে মেয়েকে ধমক। ক্ষুদে বাঘিনী নেউটে ফিরে গেল ওর মায়ের কাছে।

মা মেয়ে দুজনেই তারপর ঢুকে পড়লো কেওড়ার জঙ্গলে।

মানুষের খোঁজে মানুষ আসবে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে—এই কি বাঘিনীর ভয়!

জেলেরা ওদের ডিঙ্গিতে বসে চেঁচামেচি করে বাঘিনীকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অতগুলো মানুষের কান ফাটানো চীৎকারেও সে মোটেই আমল দেয়নি।

প্রথম মানুষ-শিকার। তাই কি বাঘিনী ছেড়ে গেল রহমানকে?

না, জরুর প্রেম ছিল তার!

॥ সাত ॥

কালের ঘুরন্ত চাকায় আবার ঘুরে এসেছে গরম কাল।

আমিও ঘুরে চলেছি কাছারিতে। সুমুখে এবার দীর্ঘ অবসর।

আমি ছিলুম না বটে, ভাবলে চেষ্টার কিছু কসুর ছিল না কিন্তু।

ওরা এখন দস্তুরমত মানুষখেকো। নরমেধ মহাযজ্ঞের তাণ্ডব বহে চলেছে তাই বিশ মাইলের একটা এলাকা জুড়ে।

বাঘিনী মা আর তার দুলালী আজ রাতের দুঃস্বপ্ন আর দিনের দুরন্ত বিভীষিকা।

জমিদারের তরফ থেকে তিনশ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে ওদের মুণ্ড পিছু।

মা বাঘিনীর মুণ্ড বাবদ সরকারও ঘোষণা করেছেন তিনশ টাকা পুরস্কার।

অর্থাৎ একুনে ন'শ' টাকার দাঁও।

দূর দূরান্তর থেকে শিকারীরা এসে ভিড় করেছেন তাই। সাহেব শিকারীরাও এসেছেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আহ্বানে।

সত্যি বলতে কি, সাহেব শিকারীদের ভরসায় পলাতক প্রজারা আবার ফিরে এসেছিল ওদের আপন ঘরে। ওদের মনে একান্ত বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাঘিনীর রেহাই নেই এবার।

একে রাজার জাত, তায় আবার অভাবিত অস্ত্রসম্ভার ওঁদের সঙ্গে। ডজন খানেক ছোট বড় নানাজাতের শিক্ষিত কুকুরও এসেছে বাঘিনীর তল্লাসীতে।

অতএব বাঘিনীর হৃৎকম্প উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক।

দিন গেল, হপ্তা গেল, মাসও ফুরিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

নদীর জলে ঢেউ ভেঙে রাতের শেষে ষ্টীমার এসে ভিড়লো কাছারির ঘাটে। তার উদ্ধত বাঁশির আওয়াজে চমকে উঠেছিল অনভ্যস্ত মানুষেরা।

ওঁরা এসেছিলেন অহঙ্কার আর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ধ্বজা উড়িয়ে। তারপর ফিরে গেলেন এক সন্ধ্যে রাতে চোরের মতন চুপিসাড়ে।

সাহেব শিকারীদের মুখে চুণ কালি মাখিয়ে বাঘিনী যেন বাঙলা দেশের মান রাখল।

প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন সাহেব শিকারীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতে ছিল। আরও মজার কথা এই যে শিকারীদের নাকের ডগার উপর দিয়েই সে তার শিকার সংগ্রহ করেছে প্রায় প্রতিদিন।

সাহেবেরা নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ওটা বাঘ নেই আছে, ওটা শইতান আছে।'

আবাদী মানুষ সেদিন সাহেবদের বাক্যকে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিল। তবে বিদেশীদের বাক্যে লিঙ্গভ্রান্তির ক্রুটিটুকু সংশোধন করে নিয়ে ওরা বলতো 'শয়তানী'। আর এই শয়তানী-স্বরূপটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে বিচিত্র কৈফিয়ৎ কল্পনা করলে ওরা।

সাহেব শিকারীরা হেরে গেলেন কেন ?

কোরমান সর্দার তার গল্প বললে অমনি গড় গড় করে।

সাহেব তাঁর রাইফেল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাঘিনীর কাছে যেতেই দেখলেন দিব্যি সুন্দরী এক মেমসাহেব সেজে বসে আছে বাঘিনী। সাহেব লোকেরা তো জেনানা আদমিকে রীতিমত সমীহ করে চলে। তাই সেই সুন্দরী মেমসাহেবের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক' করে হাসতে হাসতে চলে এলেন সাহেব।

কানাই মোড়লের গল্পটা আবার একটু অন্য রকমের। কেওড়ার

জঙ্গলে একদিন বাঘিনীকে গুলিবিদ্ধ করলেন সাহেব। বাঘিনী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর?

তারপর সে এক বিচিত্র কাণ্ড। বাঘিনী এক অপ্সরার বেশ ধরে সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে আকাশে মিলিয়ে গেল। পরণে তার বাঘিনীর ছাল, পিঠের উপর পরীদের মত পাখা।

—এমনি ধরনের আরো কত উদ্ভট কাহিনী তখন আবাদী মানুষের মুখে মুখে।

সেদিনের সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা মোটেও সহজ ছিলনা।

হয়তো ওঁদের জল হাওয়া সয়নি। হয়তো গোটা পরিবেশটাই ছিল প্রতিকূল।

জিম করবেট, হাণ্টার বা কেনেথ এণ্ডারসনের মত খ্যাতিমান শিকারীও কিন্তু সুন্দরবনের ছায়া মাড়াননি। তাঁদের সকল কর্মচাঞ্চল্য সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর, মধ্য বা দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী এলাকায়।

সুন্দরবনের সম্পর্কে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

সুন্দরবনের বাঘ দুনিয়ার সেরা—শিকারীর সেরা আকর্ষণ হওয়া উচিত এই সুন্দরবন। তবু যে কোন সাহেব শিকারী সুন্দরবনের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখে যেতে পারেননি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে পরিবেশ। সুন্দরবনের পরিবেশ শিকারের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

ভিজে স্যাঁতসেতে মাটি, অগুণতি ঘাস, প্রায়ই একহাঁটু কাদা। জোয়ারের জলে এক এক সময় বন ডুবে যায়।

তা ছাড়া গহন জঙ্গল, এক এক জায়গায় এমন নীরন্ধ্র এই গহনতা যে গুলি চালাবার অবকাশ নেই প্রায়।

হাতির পিঠে শিকার এখানে অসম্ভব। মাচানে বসাও সব

সময়ে নিরাপদ নয়। গাছে গাছে নানা আকারের নানা জাতের বিষধর সাপ।

গোলবন হচ্ছে বাঘের নিরাপদ আস্তানা। গোলপাতার রঙের সঙ্গে বাঘের হলুদ কালো বর্ণ সমাবেশ এমন মিলে থাকে যে বাঘের ঘাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আরো আছে—কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন নয়।

এপারে নদীর পাড় বরাবর ঘন কেওড়ার জঙ্গলে বাঘিনী আশ্রয় নিত বলেই বিদেশী শিকারীদের এই শোচনীয় ব্যর্থতা।

কথায় কথায় আর একটা কথা এসে যায়।

ইউরোপীয়েরা শিকারকে একটা আর্ট বলে মর্যাদা দিয়েছে। ওদের দেশে শিকার হলো স্পোর্ট—সেরা স্পোর্ট। তাই ওদের বড়লাট, জঙ্গীলাট বা নাম করা সেরা মানুষেরা এগিয়ে আসেন শিকারের বইয়ের ভূমিকা লিখতে, শিকারীকে বিশ্বময় পরিচিতি দিতে।

আর আমাদের দেশে?

থাক, আত্মনিন্দা আর নাই বা করলুম।

ইংরেজ শিকারীর বই আছে। সমস্ত ইংরেজজাতির প্রীতি-শুভেচ্ছার তুলসীমালা তাদের গলায় পরানো। সুতরাং তার কৌলীন্যের প্রতি কটাক্ষ করবার অবকাশ নেই, সাহসও নেই আমাদের।

স্বাধীন সরকার দেশের মানুষের কাছে প্রচার করছেন 'সত্যমেব জয়তে'। কিন্তু যে সত্য তলিয়ে গেছে কালের অতলতলে তাকে উদ্ধার করে দেবে আজ কোন ডুবুরী, কোন ঐতিহাসিক।

আমাদের দেশে রাজা মহারাজারা শিকার করতেন। সখের শিকারকে স্মরণীয় করে রাখবার কথা চিন্তা করেননি তাঁরা।

তাঁদের কথা তাঁরা বলতে পারেন আজও।

আমি বলছি সুন্দরবনের শিকারীদের কথা। ওদের ভাষা নেই

যে বলবে, কলম নেই যে লিখবে, মগজ নেই যে সংবাদপত্রসেবীদের তাক লাগিয়ে দেবে। ওদের কোন পরিচয় নেই বাইরের জগতের সঙ্গে। ওরা ক্যামেরা কি জানে না। ক্যামেরা যাঁদের বাহন তাঁরা ওদের খবর রাখেন নি। মরা বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেনি ওদের কেউ।

শুধু তাই নয়, ময়না শিকারী বাঘ মারলে কোন একজন উঁচু পদের সাহেব কর্মচারীর নামে ব্যাঘ্র হননের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়ে ময়না শিকারী ধন্য হয়।

একশো টাকা সরকারী পুরস্কারের বদলে ময়না তখন পাবে হয়তো দেড়শো। মহানুভব সাহেব কর্মচারী তাঁর পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা খসিয়ে শিকারের কপিরাইট পর্যন্ত কিনে নেবেন।

ময়না জানবেনা সে কি হারালো। সাহেবও হয়তো ভেবে দেখেননি কত অল্পমূল্যে কত বড় সওদা এলো ঘরে।

অর্জুন সর্দার একবার কৈখালির এক খণ্ড জঙ্গলে মানুষখেকো একটা বাঘ মেরেছিল।

ভারী ভালবাসতো সে আমাকে। বাঘটাকে টেনে নিয়ে তাই সে হাজির হলো কাছারিতে এসে!

বললে, 'বাঘটারে লা-এ তুলে নিয়ে সরকারী কাছারিতে যাক খোকাবাবু। সাহেব সুবোর নাম লিখলি এবার ক হারি আমি গাঙের জলে উপড়ে ফেলে দেবো। বাঘ মেরেছে বলে খোকাবাবুর নাম লিখতি কয়ে দেবা কিন্তু।'

অর্জুন বাঘ মেরেছে। সরকারী নথিপত্রে অর্জুনের নামের পরিবর্তে লিপিবদ্ধ হবে আমার নাম। কি দুঃসহ অপমান! কি দুরন্ত প্রতারণা!

অর্জুনকে ধমক দিলুম তো অর্জুনও তিরিক্ষি মেজাজে জবাব দিলে, 'খাই পরি তোমার। ঐ সাহে লোকেরা কি ভাতকাপড় জোগাচ্ছে নাকি আমারে যে বার বার মান্যি করতি হবে তাদের।

উনি শহরে বসে থাকবেন আর মিথ্যে করে বলতি হবে যে উনি ভাগাড় ঠেঙিয়ে বাঘ মারতি এসেছিলেন ?'

এই সব নিরক্ষর, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি। ওদের শিকার পদ্ধতিকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, ওদের কাছে পাঠ নিয়েছি।

নাম করা ইংরেজ বা ইউরোপীয় শিকারীদের বইগুলোও পড়ে নিয়েছি।

মনের মুকুরে একসঙ্গে আজ দেখতে পাই ময়না, কালী, অর্জুন, হাসান বা তমিজুদ্দিনের সাথে জিম করবেট, হান্টার, কেনেথ এণ্ডারসন, ক্যাপ্টেন ফোরসাইথ, বলডুইন, হিকস বা পারসী সাহেবকে :

পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে চলেছেন করবেট সাহেব, সঙ্গে তার ছু ছুটো রাইফেল।

সুন্দরবনের একহাঁটু কাদায় গহন জঙ্গল ঠেলে চলেছে ময়না শিকারী, হাতে তার সেকেলে এক দোনলা বন্দুক।

সাহেব শিকারী বাঘ মেরেছেন বলে দেশের সরকার ভোজ সভার আয়োজন করেছেন, লাট-বেলাট সবাই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সংবাদপত্রের অফিসে অফিসে খবর জানাচ্ছেন। তারে বেতারে টাইপরাইটারে বা টেলিপ্রিন্টারে খবর ছড়াচ্ছে দেশে বিদেশে।

হাতাহাতি লড়াই করে রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে মেরেছে কালী। কাছারি কালীকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়েছে। ফকীর সাহেব কি কালীবাড়ীর সাধু কেউ গান বেঁধেছেন তাই নিয়ে। আবাদী মানুষ কাছারির আঙিনায় পালা গাইছে রাতে—

'এক যে ছিল বাঘ
বেজায় তাহার রাগ।
মানুষ গরু যা পেতো সে
খেতো টপাটপ্

ডাকসাইটে কালী ডাকাত
তারই সঙ্গে শেষ মোলাকাৎ।
কালীর হাতের খেয়ে চড়
বাঘ বাবাজী করে ধড়ফড়
ঘাড়মোড় ভেঙে পড়লো ভুঁয়ে ঝপ্।'

কিংবা ওরা গায়,

'বনবিবির পুত্তুর ময়না মিঞা
বাঘ মেরে সে বাজায় মোষের শিঙা।'

বাস্, ঐ পর্যন্তই।

কিন্তু যাক্ এখন ওকথা। অপেক্ষা করে থাকবো অবহেলিত আবাদী মহলের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে বসেই আবাদী ভারতকে আবিষ্কার করবেন কোন সত্যদ্রষ্টা ঐতিহাসিক।

তবে আমার চোখে একজন ময়না শিকারীর কাছে বড় নিষ্প্রভ মনে হয় দেশী বিদেশী সকল শিকারীকে।

একজন হাসান কি অর্জুনের তুলনায় কোন বিদেশী শিকারীকে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়না আমার।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম।

এত চেষ্টা সত্বেও মুস্কিল আসান হয়নি। বরং বাঘিনী আজ রুদ্রমূর্তি ধরে ওলট পালট করে দিচ্ছে আবাদী অঞ্চলের জীবনযাত্রা।

দুরন্ত ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতিতে আমার জীবনেও ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

রাবেয়ার সেই অলক্ষুণে কথাগুলো আমাকে চমকে দেয়, এক অশুভ আশঙ্কার ছায়াপাতে অকারণে শিউরে উঠি আমি।

তবু আমি ফিরে চলেছি কাছারিতে। একজন রাবেয়া কেন, অনন্ত যৌবনা অপ্সরাকুলের মিনতিকেও অগ্রাহ্য করে যেতে পারি বুঝি।

বাঘিনী যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, টানছে আমাকে মায়াবিনী তার মায়াজালের টানে।

কাছারির ঘাটে পা দিয়েই কিন্তু মনের আনন্দ উবে গেল আমার।

চোখের সুমুখে ধূ ধূ করছে শুধু তেপান্তরের বিল। একটিও গৃহপালিতের দেখা নেই সেখানে।

ভেড়ির উপরে আনাগোনা নেই একটি মানুষেরও। নদীর বাঁকে বাঁকে খেপলা জাল ছুঁড়ে দিয়ে মাছ ধরছেনা কেউ, ঘাটে ঘাটে জাল মেলে দেয়নি জেলেরা।

ব্যাপার দেখে তো চক্ষুস্থির। এ যেন সেই রূপকথার মৃত্যুপুরী। একে একে রাক্ষুসী খেয়ে ফেলেছে সবাইকে! যাদের সে বাকী রেখেছে তাদের গায়ে আবার মরণ কাঠি ছুঁয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে যেন। যারা পালাতে পারেনি তারা ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখে আধমরা প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কোনমতে।

গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী বা ছাগল কুকুর এখন গোয়াল ছেড়ে মানুষের সঙ্গে একই ঘরে বাস করছে বা শয্যা সঙ্গী হয়েছে।

একটি মাত্র বাঘিনী এমন একটা মৃত্যুপুরীর সৃষ্টি করতে পারে একথা চোখে না দেখলে বিশ্বাস কবতুম না হয়তো।

অবাক কাণ্ড! আমাকে অভ্যর্থনা করতে ঘাটে এসেছে শুধু ময়না। কাছারির পাঠক সিং বা রূপো বরকন্দাজ নেই, প্রজা পাইক কেউ আসেনি ঘাটে।

জমজমাট কাছারি খাঁ খাঁ করছে মরুভূমির শূন্যতা নিয়ে। না পাইক পেয়াদা, না প্রজাপত্তর। নায়েবমশায়ও উধাও, মায় ঠাকুর চাকর ঝি পর্যন্ত।

কাকিমা অর্থাৎ রাবেয়ার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ময়না অমনি বন্দুক ঘাড়ে করে পেছু নিলে আমার। ধমক দিয়ে ময়নাকে বলি ফিরে যেতে।

ময়না ঘাড় নাড়ে, পালটা ধমক দেয়। তারপর গড় গড় করে বলে চলে সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর কথাটা:

বাঘিনী কাছারির প্রজা নয়। কাছারিকে সে পরোয়া করেনা এতটুকুও। এই গাঁয়ের বলির সংখ্যা কমপক্ষেও দশটি।

কাছারির ঝি তারাদাসী ক'বছর আগে বিধবা হয়েছে। তাই সে কাজ নিয়েছিল কাছারিতে কোলের বাচ্চা দুটির ভরণপোষণের জন্য। নিত্যকারের মতই সেদিনও সে ভাত নিয়ে যাচ্ছিল দুপুরে।

তারপর?

তারপর তারাদাসীকে আর পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেল শুধু তার সস্তা দামের বাসন কখানি আর পরণের ধুতি।

যাক সে কথা।

কাকিমার কাছে এসেছি। কিন্তু কোথায় সেই অভ্যস্ত অভ্যর্থনা। ভূত দেখে যেন আঁৎকে উঠলেন রবেয়ার মা। তারপর এক ছুটে এসে আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন ওঁর ঘরের মধ্যে। দুম করে দরজা দুটো বন্ধ করে দিয়ে হাঁপাতে থাকেন রাবেয়ার মা।

আমি কেন এসেছি এই দুঃসময়ে। রাক্ষুসী যে উজাড় করে চলেছে গাঁয়ের পর গাঁ। শিকারীরা মারা পড়েছে, জখমও হয়েছে কজনা। হাটুরে কাঠুরের তো কথাই নেই। মাঠে মাঠে মারা পড়েছে রাখাল ছেলে। ঘরের বিবিরা জল আনতে গেছিল কলসী কাঁখে। রাক্ষুসী যে রেহাই দেয়নি তাদেরও।

'এমন দিনে কি এই যমপুরীতে আসতে আছে বাবা', বললেন কাকিমা।

'মাকে রাক্ষুসীর মুখে সঁপে দিয়ে ছেলে বুঝি ভয়ে পালাবে?'

'মা—আমি মা—সত্যি বলছিস্, আমি তোর মা, কাকিমা নই, শুধুই মা!'

চেয়ে দেখি রবেয়ার মা আবেগে কাঁপছেন। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাঁর চোখের জল; অথচ কম্পিত ওষ্ঠ প্রান্তে ফুটে উঠেছে অনির্বাণ হাসি।

চিরদিন যাঁকে শান্ত সংযত স্বল্পভাষী বলে জেনে এসেছি তাঁর এই আবেগ চঞ্চলতায় বিহ্বল হয়ে গেলুম যেন, অভিভূতের মত উত্তর দিলুম,

'হ্যাঁ, মা—সত্যি মা। তুমি গো রাবেয়ার আম্মা, একা আমারই মা। আমার মা ছাড়া কে পারতো এমনি করে এই দুঃখী প্রজাদের আগলে বসে থাকতে।'

'প্রজাদের পিতা যিনি আমি যে তাঁরই ভ্রাতৃবধূ। তাই প্রজাদের মা যে আমি।'

মায়ের চোখের আনন্দঅশ্রুতে ধুয়ে যায় আমার বুকের অনুদারতা।

একসময় আবার এই আবেগ-আতিশয্যে লজ্জা পেলেন কাকিমা।

সন্ধ্যেবেলায় আবার গেছিলুম কাকিমার কাছে। আশ্চর্য! এই ভয়ঙ্কর দিনেও বাড়ির বার হয়েছেন তিনি। ঝিকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর সন্ধানে যাব ভাবছি, এমন সময় ফিরে এলেন কাকিমা।

'পায়ে হেঁটে গেছিলে কেন মা? কাছারিতে পাইক পেয়াদার অভাব হয়ে থাকে তো, মায়ের পালকি পাহারা দেবার জন্যে তোমার ছেলেকে খবর পাঠাও নি কেন?'

আবেগে কথা বলতে পারেন না কাকিমা। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগে।

'ফকীর সাহেব এসেছেন অনেকদিন পরে। পালকি চেপে ওঁদের কাছে যেতে নেই বাবা।'

'কি বললেন ফকীর সাহেব। ছেলেকে তোমার আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে—তাই না?'

'না'—মাথা দোলান কাকিমা।

'তবে?'

'ছেলেকে বাধা না দিতেই বললেন তিনি।'

'কিন্তু বাঘিনীকে আমি মারতে পারবো কিনা সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছো ?'

'সে কথা তিনি জানেন না। পুরুষকে পৌরুষ থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা অন্যায়—এইটুকুই শুধু বললেন তিনি। আল্লার আদেশ বড় কঠিন। বিপদের ভয়ে পেছপা না হয়ে প্রাণের বিনিময়ে তাকে পালন করাই উচিত।'

কাকিমা ওঁর আচল ছুঁয়ে দিলেন আমার মাথায়। 'ফকীর সাহেব আল্লার অনেক কাছাকাছি। তাঁর আশীর্বাদ পড়ুক তোমার মাথায়'—রাবেয়ার মা তাঁর মাতৃস্নেহের শেষ সঞ্চয়টুকু যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন আমার সর্বাঙ্গে।

ভেবেছিলুম ফকীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাব রাত পোহালে। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলোনা।

পাণখালির হাট থেকে ঘরে ফিরছিল হাটুরেরা। সূর্য তখনও আকাশে ছিল তার নিভন্ত আলো নিয়ে। অথচ এক বাঁকের মাথায় হারিয়ে গেল রসিদ মিঞা।

গাঁ এর পরে গাঁ। আর গাঁয়ের পাশে তেপান্তরের মাঠ। গাঁ-গুলি আজ ঐ মাঠের মতই নির্জন।

মনটা মুষড়ে পড়ে এক মর্মান্তিক বেদনায়। আজ তার একটি মানুষ ছুটে এলোনা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। গরীবের পাতার কুঁড়ে আজ পরিত্যক্ত। ভাঙাচোরা চেহারা নিয়ে আজও ওরা দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে সামনের বর্ষায় গা এলিয়ে দেবে মাটিতে। গেরস্ত বাড়ির চারপাশ ঘিরে গজিয়ে উঠেছে বাঁশের বেড়া কিংবা মাটির পাঁচিল।

তবু অন্দরের মানুষকে সদরে আসতে হয়, বাড়ির মানুষকে যেতে হয় বাইরে।

আর শয়তানী যেন ওৎ পেতে আছে সব খানেই। কেউ জানেনা কখন সে হানা দেবে কোথায়।

অথচ মজার কথা এই যে কেউ তাকে চোখে দেখেনি আজ একটি বছরের মধ্যে।

বুঝতে পারি যে বাঘিনী এখন পাকা চোরে পরিণত হয়েছে। নদীর পাড় বরাবর বিশ মাইল দীর্ঘ একটা এলাকা জুড়ে বাঘিনী চরে বেড়ায়। তবে নদী থেকে এই এলাকার বিস্তৃতি কোনমতেই দশ মাইলের বেশি হবেনা। ফলে আমার মনে এমনি একটি ধারণা জন্মেছিল যে নদীর পাড়ের কেওড়ার জঙ্গল বা নদীর কাছাছাছি খণ্ড জঙ্গলগুলির নিরাপদ আস্তানা ছেড়ে বাঘিনী বেশি দূরে যেতে রাজী নয়। নদীর কাছাকাছি কোন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে সন্ধ্যেবেলাকার শুভ লগ্নে। আট দশ মাইলের মধ্যে সে তার শিকার ধরে। তারপরে কাছেপিঠের কোন ঝোপঝাড়ে বসে সে তার রাতের ভোজ সেরে নেয়। ভোর হবার আগেই আবার সে ফিরে আসে নদীর নিকটবর্তী তাঁর দিনের ডেরায়।

ভূরি ভোজের পর ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল চাই। নদীর কাছা-কাছি খণ্ড জঙ্গলগুলির পাশেই আছে খাল। আত্মগোপন করে এমন জলপানের সুবিধে নেই আর কোথাও।

তা ছাড়া আরো একটা কথা।

দূরের গাঁ গুলিতে গোরু মোষই মারা পড়েছে বেশি। আর প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটনা ঘটেছে রাত্রি দশটার পরে।

অথচ নদীর কাছাকাছি গাঁয়ে সে দিনের বেলাতেই হানা দিয়েছে অনেকবার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মারা পড়েছে মানুষ।

ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম আমি।

সেদিন আসফ খাঁর খামার থেকে চুপিসাড়ে বাঘিনী চুরি করে নিয়ে গেল একটি মুসলমান মজুরকে। কয়েকটি মাত্র সুস্পষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে ওদের যাওয়া-আসার।

নদীর পাড়ের জঙ্গল থেকে ওরা এসেছিল। কিন্তু কি জানি কি কারণে ওরা শিকারকে টেনে নিয়ে গেছে আধ মাইল দূরের এক খণ্ড জঙ্গলে।

আশ্চর্য এই যে সেদিন ঐ আসফ খাঁর বাড়িতেই রাত কাটিয়েছি আমরা পুরো দলবল নিয়ে। আর আমাদেরই নাকের ডগার উপর দিয়েই বাঘিনী তার শিকার সংগ্রহ করেছে।

লোকজন জোগাড় করে পিটুনী শুরু করতে প্রায় এগারোটা বাজলো।

আমি আর হাসান শিকারী ঘোড়ার পিঠে। ভেড়ির বাঁধে তমিজুদ্দিন আর সেলিম।

ময়না ঢুকলো জঙ্গলে।

পিটুনি শুরু হলো। বনের বাঁয়ে খাল আর দুপাশেই অগুণতি কাঁটা ঝোপ।

খাল পেরিয়ে পালাতে চাইবেনা বাঘিনী। সম্ভবতঃ ডান পাশে আমাদের ব্যূহ ভেদ করে কেওড়ার জঙ্গলে পালিয়ে যেতে চাইবে ওরা।

হাসানকে তাই বাঁধের কাছে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই রাজী হলোনা হাসান। ময়না যে আমাকে রক্ষার জন্যে সজাগ থাকতে বলেছে হাসানকে। তাই হাসান আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। ধমক দিলুম, তবু সে নাজোড়বান্দা।

পিটুনি বা বিট শেষ হয়ে এলো প্রায়। হঠাৎ সেই বেসুরো বাদ্যভাণ্ডের কোলাহলকে ডুবিয়ে দিয়ে বেজে উঠলো ময়নার শিঙ্গা। তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো তিনটি শব্দ ফুৎকার। তার অর্থ, বাঘিনী দক্ষিণ ব্যূহে হানা দেবে—হুঁসিয়ার। ব্যূহের দুর্বল স্থানটিকে আগলাতে হবে এক্ষুণি।

ঘোড়া ছুটিয়ে যাব কি, শিঙ্গাধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই কেঁপে উঠলুম এক ভয়ঙ্কর গর্জনে।

মুখ ব্যাদান করে ছুটে আসছে বাঘিনী। বিশাল হাঁ এর মধ্যে বর্শার ফলায় মত উঁচিয়ে আছে দুটি দাঁত।

ভালো করে লক্ষ্য স্থির করবার অবকাশ নেই। ট্রিগার টানতে হলো। বাঘিনীও মুখ থুবড়ে পড়লো আমার ঘোড়ার পায়ের উপর। বুঝতে পারি যে সে আগেই মরেছে। দুরন্ত দৌড়ের বেগ তার মৃত দেহটিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে লক্ষ্যবস্তুর উপর।

আতঙ্কে আমার বাহনটি তার পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুমুখের দুপা মাটিতে নামাতেই বাতাসে বেজে উঠলো আর একটি গর্জন—আরও ভারিক্কী, আরো ভয়ঙ্কর।

চকিত চমক মাত্র—মা বাঘিনী লাফিয়ে উঠেছে হাসানের ঘোড়ার পিঠে।

লাফিয়ে উঠলো আমার ঘোড়াটিও। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হাসানের সওয়ারহীন বাহনটি এসে লাফিয়ে পড়লো আমার ঘোড়ার ঘাড়ে।

এই প্রচণ্ড সংঘাতের ফলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লো আমার অশ্বরাজ। হাসানের ঘোড়া তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়েছিলুম আমি। পড়বি না পড়বি, পড়লুম যেয়ে·আমারই গুলিতে ধরাশায়ী সেই শিকারের ঘাড়ে। রক্ষে, সে তখন মৃত।

এক পলকে ভরে নিয়েছি বন্দুক। ঐ যে বাঘিনী ঝোপের আড়াল দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আমিও ছুটলুম ওর পেছু পেছু। লক্ষ্য স্থির করবার আগেই বাঘিনী একটা কাঁটা ঝোপ লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্দুক উঁচিয়ে ছুটতে থাকি আমি।

এক লাফে ভেড়ি টপকে কেওড়ার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘিনী।

সেলিমের বন্দুক গর্জন করে উঠলো বটে, কিন্তু নিষ্ফল সেই গর্জন। বাঘিনীর গায়ে গুলির আঁচ পর্যন্ত লাগেনি।

মাটিতে পড়ে আছে হাসান শিকারী।

সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে সে। ছুটলুম তাই হাসানের কাছে।

হঠাৎ কানে এলো মানুষের গোঙানি। তাকিয়ে দেখি এক জোয়ান মানুষের কাঁধের উপর পা তুলে দিয়েছে বাঘ। বেচারা মানুষটি ওর মাথাটাকে বাঘের কামড় থেকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে।

গুলি চালালুম। ঝরা পাতার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বাঘ।

টলতে টলতে মানুষটিও গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

কি আশ্চর্য্য! এযে আমার সেই মরা শিকার, বাঘিনী মার শেষ সম্বল তার বড় আদরের দুলালী। একটু আগে তো ওরই ঘাড়ের উপরে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছিলুম আমি! আমার প্রথম গুলি, জোড়া ওর ঘাড়ের নিচে গর্ত করে ঢুকেছে।

ময়না আর তার লোকজনেরা ছুটে এসেছে—সেলিম আর তমিজুদ্দীনও।

যে মানুষটি ক্ষুদে বাঘিনীর হাতে জখম হয়েছে তার আঘাত তত গুরুতর নয়। তাড়াতাড়ি ওকে ওষুধপত্র প্রয়োগ করে কিছুটা সুস্থ করে তুললুম।

লোকটি আমাদের বিটাবদের একজন। বাচ্চা বাঘিনী ধড়ফড় করছিল নাকি। এক্ষুণি ওর জীবন প্রদীপ নিভে যাবে ভেবে বাঘিনীর পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে।

হঠাৎ কি হলো। বাচ্চা বাঘিনী দানো পাওয়া মানুষের মত জ্যান্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু এবার সে সত্যিই মরেছে।

আর হাসান!

দিনান্তের সূর্য শুধু সাক্ষী হয়ে রইলেন আমার নীরব কান্নার, প্রিয়জনের সঙ্গে চির বিচ্ছেদের করুণ ভূমিকার।

কাছারিতে ফিরে এলুম যখন, সন্ধ্যে তখন গড়িয়ে চলেছে রাত দুপুরে।

শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন, অবসন্ন যেন সকল ইন্দ্রিয়। টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকছি, দরজায় দাঁড়িয়ে কাকিমার বুড়ি ঝি।

আকিলা কেঁদে ওঠে, 'বিবিসাহেবাকে পাওয়া যাচ্ছেনা সেই সন্ধ্যে থেকেই।'

'সে কি সর্বনেশে কথা?'

'সত্যি বলছি দাদাবাবু', আকিলা আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। তারপরে সে বলে সেই হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী।

পড়তি বেলায় রূপো এসেছিল প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে। দাশু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল সে। কেমন করে বিবিসাহেবার কানে খবর পৌঁছেছিল তা আকিলা জানেনা। নদীর ঘাটে রূপোর সঙ্গে দেখা করতে পাগলের মত ছুটে এলেন বিবি-সাহেবা। রূপো বরকন্দাজ কাঁদতে থাকে। বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দাদাবাবুর ঘাড়ে। ঘোড়া থেকে দাদাবাবুকে পড়ে যেতে দেখেছে সে, বললে রূপো। তারপরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালালো সে।

বিবি সাহেবা দাঁড়িয়ে রইলেন ঘাটে শূন্য দৃষ্টি মেলে। মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই—মরা মানুষ যে। দাঁড়িয়ে আছে পাথর হয়ে।

বিবিসাহেবার এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছিল আকিলা। তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু পারেনি। আকিলা তাই বাড়ি ছুটে এসেছিল লোকজন আর পালকি নিয়ে যেতে।

আবার যখন সে পালকি নিয়ে ঘাটে গেল তখন আর বিবি সাহেবাকে পাওয়া গেল না।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বিবিসাহেবা বাড়ি ফিরে এসেছেন ভেবে শূন্য পালকি নিয়ে আকিলা ফিরে এলো বাড়িতে।

কিন্তু ঘরও যে শূন্য।

আকিলা তাই আবার ছুটলো ফকির সাহেবের কাছে। বিবি-সাহেবা আজ কদিন ঘন ঘন যাচ্ছেন সেখানে।

খবর শুনে ফকীর সাহেব আলো আর লোকজন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছেন তক্ষুনি।

একবার বাড়ি আর একবার কাছারি, সেই সন্ধ্যে থেকেই টহল দিচ্ছে সে।

কি জানি কেন, রাবেয়ার সেই অলুক্ষুণে কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে গেল। 'আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বহে যাচ্ছে এই নদী। নদীতে অনেক জল—'

ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম সেই গভীর অন্ধকারে। আশে পাশে সুমুখে পশ্চাতে সূচীভেদ্য অন্ধকার।

নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে ডাকি, 'মা-মা-মা'।

কেওড়ার জঙ্গল সমবেদনা জানায় আমার দুঃখে। সেও আমারই মত গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, 'মা-মা-মা-আ-আ।

সাড়া আসেনা তাই আবার ডাকি, 'মা, তুমি কোথায়! মা—মা-আ-আ'।

নদীর দুপারের কেওড়ার জঙ্গলও কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'মা-মা-আ-আ'।

আমার সাথে ওরাও কাঁদতে থাকে, ঐ আকাশ, আকাশের বুকের ঐ কটি মিটমিটে তারা, ঐ ভরা জোয়ারের নদী, লক্ষকোটি গাছপালা।

ওরা কাঁদছে আর কেঁদে কেঁদে আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডেকে মরছে মাকে।

নদীর পাড় বরাবর বাঁধের উপর দিয়ে ছুটে চলি আর হারানো মাকে ডেকে মরি বুকের সব বাতাসটুকু উজাড় করে দিয়ে।

এতডাকেও সাড়া মেলে না।

উঃ, টর্চটা সঙ্গে থাকতো যদি! ওর একরোখা আলোর রশ্মি অন্ধকারের বুক চিরে হয়তো খুঁজে দিতে পারতো আমার হারানো মাকে।

আলো—আলো—একটা আলো—একটুখানি আলো। আপন আবেগের উন্মত্ততায় বাঁধের উপর থেকে পা হড়কে পড়ে গেলুম নিচে। একেবারে এককোমর জলে।

সম্বিৎ ফিরে এলো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে জল ছেড়ে উঠলুম ডাঙ্গার কাদায়। পরণের জুতো ব্রীচ দিয়ে জল ঝরছে। এতক্ষণে টের পেলুম যে কোমরের বেল্টে যথারীতি বাঁধা আছে আমার ছোরা আর টর্চ। শুধু বুলেট বেল্টটা খুলে রেখেছি এমন সময় হাজির হয়েছিল আকিলা।

আলো পেয়ে আনন্দ হলো খুব। কিন্তু আলো জ্বেলেই চমকে উঠলুম একেবারে। এ যে .রৌরব নরকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। যে দিকে তাকাই দেখি, ছোট বড় অগুণতি কুমির আমাকে ঘিরে ধরেছে।

সপ্তরথী নয়, শত রাক্ষুসীর ব্যূহে বন্দী আমি। নির্গমনের ছিদ্র নেই, নিরেট, নীরন্ধ্র বেষ্টনী। কেউ কেউ ওদের ঘুমের আমেজে হাঁই তুললো। দুই চোয়ালের ফাঁকে যমপুরীর প্রশস্ত পথ!

অসহনীয় অবস্থা—আপনা থেকে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক্ষুণি বোধ করি নিজেই আমি শুয়ে পড়বো ওদের পাশে।

একটা বাচ্চা কুমির গুটি গুটি এগিয়ে আসছিল। চোখের উপর তীব্র আলোর ঝলক পড়তেই হকচকিয়ে গেল সে। অন্ধকারে আরও একজন এগিয়ে আসছে। ছোরার ডগাটা দিয়ে ওকে উলটে দিতেই গোটা কুমিরপুরীও যেন নড়ে উঠলো।

একটি বুড়ো কুমির কিন্তু তার দীর্ঘ দেহখানি এলিয়ে দিয়ে মরার মত পড়ে আছে।

কুমির কুল সচল হয়েছে। ভাবনার সময় নেই আমার। বুড়ো

কুমিরের পিঠের পাটাতন বেয়ে দিলুম ছুট। লাফিয়ে পড়লুম ভেড়ির গায়ে। ভেড়ির গা থেকে ক'জনা আবার তেড়ে এলো তক্ষুনি। লাফিয়ে একহাতে ধরে ফেললুম কেওড়া গাছের গায়ে ঝুলন্ত একটা লতা। লতা নয় সত্যি। লতা ভেবে আঁকড়ে ধরেছি ডালের বানরের ঝুলন্ত লেজ। আচমকা লেজের উপর টান পড়াতে ডিগবাজী খেয়ে নিচে পড়লো বানর মহাশয়। দুজনেই কাদার উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠলুম। লাফিয়ে লাফিয়ে বানর যেয়ে চড়ে বসলো এবার গাছের আরও উঁচু একটা ডালে। আমিও গাছের ডালে দোল খেয়ে নেমে পড়লুম বাঁধের উপর।

খ্যাক্-খ্যাক্-খ্যাক্—রামচন্দ্রের গোটা বাহিনী যেন যুদ্ধ ঘোষণা করলো আমার বিরুদ্ধে। টর্চের আলো ফেলতেই ওরা বুঝলো যে রাবণ রাজার কেউ নই আমি, বরং রামচন্দ্রেরই এক বিপন্ন স্বজাতি। ওরা চুপ করলো। কুমিরকুল কিন্তু তখনও হাল ছাড়েনি। হাঁ করা চোয়ালগুলো উঁচিয়ে ওরা তখনও ভাবছে আমি ওদের নাগালের বাইরে গেছি কিনা।

'মা-মাগো-মা-আ-আ'—আবার চেঁচিয়ে ডাকি আমি। অদূরে নদীর ওপারে সুন্দরবনের অযুত গাছে প্রতিহত প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া আসে—একক কণ্ঠের প্রত্যুত্তর।

অবাক হয়ে যাই। তাই আবার ডাকি, আবার শুনতে পাই সেই মনুষ্য কণ্ঠের উত্তর।

দূর বাঁধের মাথায় মশালের আলো নেড়ে সঙ্কেত করছে কে।

ঐ মশাল লক্ষ্য করেই ছুটে চলেছি টর্চ জ্বালিয়ে। পা পড়লো একটা নরম পিচ্ছিল কোন জিনিষের উপর।

'ফোঁ-ও-ওস'।

হাতের আলো ঘুরিয়ে ধরলুম। নদীর দিকে লেজ ঝুলছে।

মাথা ঝুলছে ভেড়ির নিচে মাঠের দিকে। ভেড়ির উপরে দেখা যাচ্ছে শুধু ওর চওড়া পিঠের অংশ।

বিরাটকায় বন্য ময়াল তার মাথা তুলছে আমাকে লক্ষ্য করে। ওর চোখের উপর আলো ফেলতেই সে তার মাথা নামিয়ে আপন পথে চললো।

মশাল হাতে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘকায় মানুষ। কোমরে একখানি আট হাত রঙীন শাড়ি। মাথার চুল মুখের দাঁড়ি যেন বকের পালকের মত ধবধবে সাদা। চেহারাটা সুশ্রী নয়, তবে আলগা শ্রী বেশ ভাল।

'তোর মা ঐ ঘুমুচ্ছে। আমি পারলাম না দাদা'—বৃদ্ধের বুকের পাঁজরাগুলো ফুলে উঠতে থাকে।

জোয়ারের জল অনেকখানি সরে গেছে। জলের কিনারায় মাটির কাদায় শুয়ে আছেন রাবেয়ার আম্মা। পা থেকে গলা অবধি ফকীর সাহেব ঢেকে দিয়েছেন তাঁর গায়ের উত্তরীয় দিয়ে। মুখখানি শুধু অনাবৃত। সে মুখে হাসি নেই, কান্না নেই—কঠিন, শুষ্ক, মশালের আলোতে দীপ্তিময়।

'মা-মা-মা'—কান্না আমার বাগ মানে না। মা ডেকে যেন ডাকার সাধ মিটতে চায় না। হাতের মুঠি কঠিন হয়ে বন্দুক আঁকড়ে ধরতে চায়। মনে হয় যমপুরীকে লণ্ডভণ্ড করে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি আমার মাকে।

'মা স্বর্গে গেছেন। বেহস্তের পথে কাঁটা হবে যে তোর কান্না। ওঠ, শেষ কাজটুকু যে তোকেই করতে হবে।'—ফকীর সাহেব আমাকে টেনে তুললেন। 'আল্লা'—ফকীর সাহেবের সকল সংযম ভেঙে চুরে বেরিয়ে এলো আর একটি বুক ভাঙা বিলাপ।

'ওরা শবাধার নিয়ে আসছে গ্রাম থেকে, অগুনতি মশালের আলো এগিয়ে আসছে এদিকে—' ভেড়ির উপর দাঁড়িয়ে বললে আর একটি লোক।

শবাধার এলো। জমিদারের ভ্রাতৃবধূর যোগ্য শবাধার—যোগ্য অর্ঘ্যসম্ভার।

মশালের শোভাযাত্রা রাত্রি শেষে এসে থামলো এনায়েৎ খাঁর কবরের পাশে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি যে এই একটি রাতের জন্যেও বাঘিনীকে ভুলে ছিল সবাই।

॥ আট ॥

দিনের শেষে আবার এলো রাত্রি।

সন্ধ্যে বেলাতে কবরের উপর মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছিলুম। তারই কম্পিত শিখা ঘুমের মধ্যেও হাতছানি দিয়ে ডাকে; মা ডাকছেন, 'আয়-আয়-আয়'।

দুপুর রাত। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলুম, বারান্দা ছেড়ে আঙিনায়। অমনি যেন সবাই আমাকে ডেকে ওঠে সমস্বরে, 'আয়-আয়'।

আঙিনা পেরিয়ে মেঠো রাস্তা। আকাশের তারা যেন মোম-বাতি জ্বেলে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

কবরের পাশে এসে বসি উঁচু বেদীতে মাথা রেখে। ঝিরঝিরে হাওয়া তখন হাত বুলিয়ে দেয় আমার জীর্ণ ক্লান্ত দেহে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে।

কার উষ্ণ নিশ্বাস্ পড়ছে আমার কপালের উপর। চমকে উঠি—

মা!

মায়ের মুখে কথা নেই। শুধু মুখ থেকে সরানো বোরখাটাকে আরও সরিয়ে দিলেন তিনি। মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসি, আয়ত চোখে স্থির আঁখিতারা, উপচে পড়ছে অনাবিল স্নেহধারা।

মার মুখে কথা নেই। সকল ভাষা যে বাণী হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

'একটু কথা বল মা, একটা কথা অন্তত:।'

মায়ের আরক্ত ওষ্ঠ প্রান্তে কাঁপন লাগে। আমার মাথায় চুমা দিতে বুঝি মুখ নামালেন মা। মাথার চুলে ছোঁয়া লাগে মায়ের নম্র.নত ওষ্ঠপ্রান্তের।

আনন্দে ছুহাত বাড়াই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে।

একি, কোথায় মা! কেউ তো নেই।

চমকে উঠলুম। আমি যে তাঁরই কবরের উপর বসে আছি। গাছের ডালে কিচির মিচির করে ওঠে পাখিরা। ভোর হয়েছে। এক ছুটে কাছারিতে যেয়ে খিল এঁটে দিই নিজের ঘরে।

বাঘিনীর খবর নেই আজ দু তিনটে দিন। মনটা তাই দিনের-বেলায় ছটফট করে মরে খবরের আশায়।

সন্ধ্যে রাতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসি কবরের উপরে। বন্দুক ঘাড়ে করে পাহারা দেয় ময়না। আমাকে একা ছেড়ে দিতে তার বেজায় আপত্তি। তবু, ভাল লাগেনা আমার। নিঃসঙ্গ একা এসে চুপটি করে বসে থাকতে চাই এই সমাধির একপাশে। কদিন পরেই মসজিদ তৈরী হবে এই সমাধির উপরে। সেদিন তো আর এমনি করে বসে থাকতে পাবোনা।

ময়নার চোখে ঘুম আসবে ছুপুর রাতে। ঐ কবর তখন হাত ছানি দেবে আমাকে। ছুপুর রাতে ঘুম ভেঙে যায় বুঝি তাই। পা টিপে টিপে এই সমাধির কাছে আসি। কবরের বেদীতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

মার বুকে ব্যথা বাজে। ধীর পায়ে তিনি আসেন। চোখের কোণে ছুষ্টু হাসি নিয়ে ধমক দেন, 'ছুষ্টু ছেলে, এমনি করলে অসুখ হবে না!'

কাঁচা পেয়ারা আর কুল পেড়ে বাগানের এককোণে লুকিয়ে বসে খেতুম আমরা ছুজনাতে—আমি আর রাবেয়া। সেদিনেও ঠিক এমনি করেই ধমক দিতেন কাকিমা।

আজও ঠিক তেমনি করেই ধমক দেন মা। তারপরে আমার মাথাটাকে তুলে নেন তাঁর কোলের উপর। আমার মাথার চুলে ক্লান্ত কপোলে ছোঁয়া লাগে মার কোমল ওষ্ঠ প্রান্তের, উষ্ণ নিশ্বাস লাগে চোখের পাতায়।

যাক সে কথা।

এক পাওয়ালা ফরমান সেদিন খবর নিয়ে এসে হাজির হলো।

ভোরের বেলায় ইয়াকুবের বিবি গোবর ছড়া দিচ্ছিল অন্দরের আঙিনায়। হুঁকোর খোলের জল বদলাতে ইয়াকুব আলি ওর বিবির হাতেই হুঁকোটা দিল। বাড়ির খিড়কির পাশেই পুকুর। অথচ পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল তবু ফিরে এলোনা ইয়াকুব আলির গর্ভবতী স্ত্রী। একলা গেছে পুকুর ঘাটে। ইয়াকুব আলি তাই এগিয়ে আনতে গেল বিবিকে।

বিবি তো ঘাটে নেই। পুকুরের ওপারে পড়ে আছে ওর বিবির গায়ের গামছাখানি।

ইয়াকুব ছুটে গেল সেই গামছার কাছে। ছোট একফালি বাগান, বাগানের পরে দুতিনশ' হাত মাঠ, মাঠের পরে ভেড়ির বাঁধ।

বাঁধের উপরে দেখা যাচ্ছে বিবির পরণের সেই পাছা পেড়ে শাড়ি।

ইয়াকুবের চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হলো। অনেক খোঁজাখুজির পরে পাওয়া গেল শুধু মুখ সমেত মাথাটা। কানে দুলছে একজোড়া দুল। শাদির সময়ে ইয়াকুব দিয়েছিল ঐ দুল জোড়া।

বাড়া ভাত ফেলে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে এলুম ঘটনাস্থলে। সবাইকে বিদায় দিয়ে শুধু রুকসাকে নিয়েই তল্লাসী চালাই আমি আর ময়না।

ঘটনাস্থল থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে এসে পেলুম রুকসার সঙ্কেত।

একেবারে নদীর কিনারায় একটা লম্বাটে গাছের আগডালে বসে রুকসা ঘন ঘন নিচের দিকে চেয়ে দেখছে।

বাঁধের দিক থেকে জঙ্গলে ঢুকে পড়া সম্ভব হবে না বলেই নদীর পাড় বেয়ে জঙ্গলের গা ঘেঁষে আসতে হবে।

অনেকখানি পিছু হটে একটা সদ্য মড়া পোড়ানো শশ্মানের উপর দিয়ে নদীর কিনারায় এসে হাজির হলুম।

শেষ ভাটার টানে জঙ্গলের কিনারা থেকে প্রায় দুশ গজ নিচে নেমে গেছে নদীর জল।

জঙ্গলের কিনারায় এক হাঁটুর বেশি কাদা। পা দিলে মনে হয় পাতালে সেঁধিয়ে যাচ্ছি বুঝিবা।

অগত্যা জঙ্গলের গা ছেড়ে নেমে এলাম জলের ধারে। কিন্তু সেখানেও সেই এক হাঁটু কাদা। তবু হয়তো যেতুম। কিন্তু মানুষের গায়ের গন্ধে একপাল কুমিরের হঠাৎ আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হলুম। আহ্লাদে আটখানা ওরা তৎক্ষণে তাল ভাঁজতে শুরু করেছে।

অতএব মানে মানে সরে আসতে হলো। পায়ে হাঁটা ছেড়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলি।

গাছের মাথায় বসে আমাদের এই কাণ্ড দেখে রুকসার ভারি মজা লাগে। তবু সে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, 'চুপ-চুপ'।

চুপিসাড়েই চলেছি এবার খাড়াই পথে। খুবই হুঁসিয়ার আমরা। তবু মনে মনে জানি কত অসহায় অবস্থা আমাদের।

এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। গোটা প্রকৃতি জুড়ে বিরাজ করছে এক ভয়াল নিস্তব্ধতা। তবু মনে হলো কে যেন পিছনে অনুসরণ করছে চুপিসাড়ে।

বনের কিনারার পৌঁছে এক পলকের জন্যে পিছনে তাকিয়ে দেখি।

আর কেউ নয়, একটি অতিলোভী কুমির। আমরা থামতে সেও থমকে দাঁড়াল। মিটি মিটি চাহনি, চোখে শয়তানী বুদ্ধি, চালচলনে দস্তুরমত ধড়িবাজ। মনুষ্য মাংসের লোভে নাল গড়িয়ে পড়ছে বুঝি ওর চোয়ালের দুপাশ বেয়ে।

ইচ্ছে করলে এই দৈত্যদেহী সরীসৃপটিকে আমি স্তব্ধ করে দিতে পারি চিরকালের মত।

কিন্তু তাতে যে ব্যর্থ হবে আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণটি। বাঘিনী কে আমরা দেখতে পাচ্ছি না বটে তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে বাঘিনীর সাথে আমার ব্যবধান শত হস্তের বেশি হবেনা কোনমতে।

সঙ্কেতে ময়নাকে পিছনে নজর রাখতে বলে বুকে হেঁটেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ি আমরা। আরও কয়েক গজ এগিয়ে চলি হামাগুড়ি দিয়ে। কাঁটা ঝোপের একটা ডালকে সরিয়ে দিতে যেয়ে ডালটা আমার হাত ফসকে আবার যথাস্থানে ফিরে গেল—শব্দ হলো ছটাং।

সুমুখে বিশ তিরিশ হাত দূরের জঙ্গলটাও নড়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। গাছের আড়ালে নজরে পড়লো একটা ডোরাকাটা লেজের কতটুকু। দমবন্ধ করে পড়ে রইলুম কিছুক্ষণ। লেজের কোন একটা প্রান্ত দেখতে না পাওয়া অবধি বাঘিনীর মাথাটা যে কোন-দিকে তা ঠাওর করতে পারছি না।

আরো কয়েক মিনিটের পাষাণ-মৌনতা।

অনুমানের উপর নির্ভর করে কিছুটা ডানদিকে ঘুরে এগিয়ে চললো ময়না।

আমার পিছনের দিকটাতে শুকনো পাতার উপর শব্দ হলো—খস্ খস্।

পলকের জন্যে পেছনে তাকাই। কই, কোথাও কিছু চোখে পড়েনা তো।

সুন্দরবনের সুলোর জন্যে বনের পথ বড়ই দুর্গম। এপারেও তার অভাব নেই। অগুণতি সুলোর উপর দিয়ে হাতে পায়ে হেঁটে এসেছি এতক্ষণ। দেহের অনাবৃত অংশ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। তাছাড়া এখন তো সেই সূঁচওয়ালা মাথা সুলোর উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছি। ভীষ্মের শরশয্যা প্রায়।

এহেন অবস্থায় কতক্ষণই বা এমনি চুপটি করে থাকা চলে কনুই আর হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে এগিয়ে চলি নিঃসাড়ে।

গজ পাঁচেক মাত্র—চোখে পড়লো সেই ডোরাকাটা লেজের শেষটুকু। ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে সেই দীর্ঘ লোমশ লেজ।

বাঘিনী তার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার লেজের আন্দোলন থেকে বোঝা যায়, সে-ও সন্দেহ দোলায় দুলছে।

বাঘিনীর মাথার অবস্থান আন্দাজ করে আর একবার মোড় ঘুরতে যাব, সুমুখের লতার বেষ্টনীর মধ্যে দেখি লম্বা চোয়াল উঁচিয়ে ধরেছে কুমির ভায়া। এবার সে আমাকে রেহাই দিতে নারাজ। এতক্ষণের এই লুকোচুরি খেলায় রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে।

আড়চোখে দেখলুম, বাঘিনীর সুমুখের পা একখানি আর পিঠের একটা অংশ দেখা গেল দুই গাছের ফাঁকে।

সুমুখে আট-দশ হাত দূরে বিশালকায় কুমির, ডাইনে পনেরো-বিশ হাত দূরে জ্বলন্ত বাঘিনী।

ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলুম। ট্রিগারের উপর আঙুলও বুঝি কেঁপে উঠলো।

কুমিরকে আমি বিলক্ষণ চিনি। এখন গুলি চালানোর অর্থ যে কি তাও জানি।

গুলির আঘাত অগ্রাহ্য করেই কুমির এসে কামড় বসাবে আমার মাথায়।

আর বাঘিনী!

গুলির শব্দে সে পালিয়ে যেতেও পারে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারে আমার ঘাড়ে।

পেশাদার শিকারীর জীবনেও এমন সঙ্কটমুহূর্ত হয়তো খুব বেশিবার আসেনা।

কুমিরের পিঠের উপর গুলি বিঁধবে না, কিংবা হয়তো চামড় কেটে বেরিয়ে যাবে গুলি।

এক খাবলা কাদা ছুঁড়ে মারলুম তাই। আবার—আবার।

খুব ঠাণ্ডা মেজাজে কুমির ভায়া গুটি গুটি এগিয়ে আসছে তবু।

হাতের কাছে পেলুম একটা ন্যাড়া শুকনো ডাল। বাঁ হাতে সেই লম্বা ডালখানাকে এগিয়ে ধরলুম ওর মুখ বরাবর।

নিরুপায় সরীসৃপ এবার তার রাক্ষুসী হাঁ মেলে ধরলো। আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই ওর হাঁ এর মধ্যে ঢুকলো যেয়ে আমার একজোড়া গুলি।

ইস্পাতের মত শক্ত দুটি লম্বা চোয়াল ধীরে ধীরে জুড়ে গেল।

বাঘিনীও যদি ঝাঁপ দেয়। বন্দুক ভরে নিয়ে তাই এবার মুখ ঘোরাতেই কানে এলো আর একজোড়া গুলির গর্জন। 'খ্যাকখ্যাক' করে ওঠে রুকসা, প্রত্যুত্তরে বাঘিনীর ক্রুদ্ধ চাপা কণ্ঠ প্রায় এক সঙ্গেই প্রতিধ্বনিত হয় কেওড়ার জঙ্গলে।

ব্যস্, সব চুপচাপ তারপর। ময়না গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলো আমার কাছে। গাছ বেয়ে নেমে এলো রুকসা।

কুমির ভায়া চুপটি করে শুয়ে আছে। সে যে মরে গেছে এমন বলবে কে?

না, সত্যিই মরেছে সে। মোক্ষম মারই বটে।

বাঘিনী কিন্তু মরেনি। মরা দূরে থাক, ওর গায়ে গুলির আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

তবে কি ময়না শিকারী মিথ্যে গুলি চালিয়েছে!

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

বাঘিনী আমাকে দেখতে পেয়েছিল। দুর্ভেদ্য গাছের বেষ্টনীর জন্যেই হোক বা অন্য কোন কারণে সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়াটা সে মোটেই নিরাপদ মনে করেনি। তাই কিছুটা ঘুরে পিছন থেকে অতর্কিতে আমার ঘাড়ে কামড় বসাবার ফন্দী এঁটেছিল সে।

খোলা জায়গাগুলো এড়িয়ে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে দ্রুত পায়ে অথচ একদম চুপিসাড়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল বাঘিনী।

শয়তানীকে গুলিবিদ্ধ করা সম্ভব নয় দেখেই শেষ পর্যন্ত ফাঁকা আওয়াজ করলে ময়না।

উদ্দেশ্য সফল হলো। বাঘিনী আমাদের সজাগ দেখে নেউটে পালিয়ে গেছে।

একটু আগে বাঘিনী যেখানে ছিল সেখানে এসে দাঁড়ালুম আমরা। ছোট্ট একটা লতাপাতার ঝোপের মধ্যে শুয়েছিল বাঘিনী। সম্ভবতঃ সে ঘুমুচ্ছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

পাশেই একটা নালা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ঝির ঝির করে। নালার মধ্যে প্রচুর হাড় গোড় ছড়ানো রয়েছে, দু তিনটে মাথার খুলিও---বীভৎস দৃশ্য। দেখলেই বুকের ভেতরটা আঁৎকে ওঠে।

ভেড়ির বাঁধে ফিরে এলুম আবার। রুকসা বড় ভয় পেয়েছে। আমাকে সে আঁকড়ে ধরেছে নাছোড়বান্দার মতই। ওকে দিয়ে তল্লাসী চালানো চলে না আর।

উপায়ান্তর না দেখে নিকটের একটা গাঁয়ে যেয়ে হাজির হতে হলো। ফিরে এলুম চার পাঁচটা গরু-মোষকে নিয়ে।

ভেড়ির উপর দিয়ে ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো দ্বিজু মোড়ল।

ভেড়ির নিচের পথ বেয়ে চললুম আমি আর ময়না।

দ্বিজু সাহসী আর শক্তিশালীও বটে। ওকে বললু জোরে জোরে গান গেয়ে আর মুখে নানারকম শব্দ করে সে যেন তার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে তোলে বাঘিনীকে।

কেওড়ার জঙ্গল থেকে বাঘিনী ভেড়ির উপরকার গরু-মোষ ও তাদের রাখালকে পরিষ্কার দেখতে পাবে। কিন্তু ভেড়ির নিচে আমাদের অস্তিত্বের কথা সে টের পাবে না কোনমতে। অথচ ভেড়ির উপরের গরু-মোষের হাবভাব থেকে আমরা বাঘিনীর অস্তিত্ব টের পাব নির্ভুলভাবে।

বেলা পড়ে আসছে দেখে ক্রমেই আমরা পায়ের জোর বাড়াচ্ছি।

দ্বিজুও তার হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে,—

ও পাঁচি, পাঁচিরে !
তুইরে আমার পেরাণ।
দেতাম তোরে রূপোর পৈছে
ঘরে পাইলে ধান।
হাতে বাজু, পায়ে দেতাম মল।
পরাণ থাকতি দেখতি নারি
ঐ চক্ষু দুটির জল।
হায়রে হায় !
পরাণ ফাইটা যায়।

গানের ফাঁকে ফাঁকে গরুর লেজ মলে দ্বিজু, 'হ্যাট্-হ্যাট-হ্যাট্', আর জিভ নেড়ে শব্দ করে 'টক্কর-টক্কর-টক্কর।'

হাসবারই কথা। কিন্তু হাসতে পারলুম না। অনাবৃষ্টি নয়, প্লাবন নেই, অতিবৃষ্টিও হয়নি। তবুও ফসল হয়নি ভাল। একদিকে হাজার হাজার মানুষ, অনেক শিকারী, অনেকতর অস্ত্র সম্ভার। অন্যদিকে একটিমাত্র বাঘিনী। বাঘিনীর প্রতাপে হালের গরু নেই চাষীর ঘরে। চাষের গরু জোগাড় হলো যদি চাষীর দেখা নেই। ধান যদিবা হলো, কেটে তুলবার লোক মেলে না।

লজ্জার কথা যে বাঘিনী আজও বহাল তবিয়তে তার অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে অবাধে।

মনের গ্লানি মুখের হাসি কেড়ে নিল।

ক্রোশ দুয়েক পেরিয়েছি হয়তো, হঠাৎ ভেড়ির উপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে এলো গরু-মোষেরা। তারপরে ছুটলো সবে পুচ্ছ উঁচিয়ে—'হাম্বা-হাম্বা-ব্যা-এ্যা-এ্যা'।

দ্বিজু মোড়লও লাফিয়ে পড়লো ভেড়ির নিচে, 'বড় শেয়াল

আসছে হুঁজুর, বড় শেয়াল'। দ্বিজুকে ছুটে পালাতে দেখে ওর ছুটন্ত পায়ে ল্যাং মেরে দিলুম। ধূলোর উপর গড়াগড়ি খায় দ্বিজু মোড়ল।

ভেড়ির গায়ে মিশে আছি আমরা। দ্বিজুকে মুখে তুলে নিতে আসবে বাঘিনী একথা সহজেই অনুমান করা যায়। কেওড়ার জঙ্গল থেকে ভেড়ির বাঁধের উপর উঠতেই হবে ওকে। সেই সুযোগের অপেক্ষায় বন্দুক বাগিয়ে আছি আমরা।

বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেও কিন্তু বাঘিনীর দর্শন পাওয়া গেল না দেখে রুকসাকে তুলে দিলুম ভেড়ির বাঁধে।

বাঁধের উপর বসে কয়েকবার গা মাথা চুলকে নিল রুকসা। তারপর একদৃষ্টে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল সে। দুএক মিনিট মোটে। রুকসা একবারে ছিটকে এলো যেন।

বাঘিনীকে দেখতে পেয়েছে রুকসা—তাই এত ভয়। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলুম তাই।

কোথায় বাঘিনী!

আধ মাইল দূরে অনেক মানুষের হৈ হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। অতএব আবার ছুটতে হলো।

খেয়াঘাট—ওপারের এক হাট থেকে নদী পেরিয়ে গাঁয়ে ফিরছিল প্রায় বিশজন জোয়ান মানুষ। নৌকা থেকে ওরা বাঘিনীকে দেখতে পেয়েছে—তাই এত চেঁচামেচি। ভয়ে ওরা নৌকা ভিড়াতে চায়না ঘাটে।

অথচ এমনটি ওরা কোনকালেই ছিল না। বাঘের উৎপাত তো লেগেই থাকে। ওদের সড়কির ফলায় ধার আছে, বর্শার ফলকে হীরের আলো ঠিকরায়; তাছাড়া টাঙ্গি চালাতে ওরা প্রায় সব্যসাচী। বাঘ ওদের মারে সত্যি, তবে ওরাও তো ছেড়ে কথা কয়না। বাঘের উৎপাতে ওরা বিপন্ন হয় বটে, তবে এমন বেসামাল হয়ে পড়েনি বুঝি আর কখনও। গোটা আবাদী মহলের উদ্ধত স্নায়ুযন্ত্রটি এমন করে আর কখনও বিগড়ে দেখেনি কেউ।

আমাকে দেখে এতক্ষণে ঘাটে ভিড়লো খেয়া! বিশজন জোয়ান, সঙ্গে সড়কি, বর্শা, টাঙ্গি ও তীরধনু। একা বাঘিনীকে এত ভয় তবু!

বুক চাপড়ে এগিয়ে এলো এক নমশূদ্র ছোকরা। 'হুকুম করুন হুঁজুর, জঙ্গলে ঢুকছি আমি। ময়না শিকারী আমার পেছনের দিকটা রক্ষে করুক শুধু। সামনাসামনি লড়ায়ে আমি যদি বাঘিনীর মুণ্ড কেটে আনতি না পারি তো অর্জুন সর্দারের ব্যাটা নই আমি। তবে ওডা যে শয়তানী, পেছন থেকে চোরের মত মারে হুজুর।'

অর্জুন সর্দারের ব্যাটাকে দেখে কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতো না কেউ। তবে কথাটা সত্যি। বুড়িগোয়ালিনির সেই মানুষখেকো বাঘটাকে শুধু টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছিল এই অভিমন্যু। বাবা ওকে দুশ'টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন বলেও মনে পড়লো। অভিমন্যুর দুই কাঁধের উপরে এখনও বিদ্যমান রয়েছে বাঘের থাবার দাগ।

ওরা ওদের গাঁয়ে চলে গেল দল বেঁধে। অভিমন্যু দলের আগে। দলের পৃষ্ঠদেশ রক্ষার দায়িত্ব দিলে ওরা ময়নার উপরে।

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলো। সারা দিনের পরিশ্রমে পা চলেনা আর।

খেয়ার নৌকা বেয়ে আমরা তাই চললুম কাছারিতে। হাল ধরেছি আমি, দাঁড় টানছে ময়না আর দ্বিজু।

এক প্রহর রাতে কাছারিতে ঢুকছি, হঠাৎ আমার পাশ কাটিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল একটা কালো কুতকুতে জানোয়ার।

ভালুকই হবে। কাছারির পোষা ভালুকটি হয়তো তার শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

'ইউ-ইউ-হু-উউ'—না-না-ঐ তো আমার পোষা ভালুকের আদুরে ডাক।

হ্যাঁ, শিকলেই সে বাঁধা আছে তো। তবে যাকে এইমাত্র দেখলুম?

শুয়ে বসে কাটলো কটি দিন। কেওড়ার জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে চলার ফলে চামড়ার উপরে যে ক্ষত দেখা দিয়েছিল সেগুলি তখন শুকিয়ে এসেছে।

ভগ্নদূতের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলুম। সাতসকালেই দেখি ভগ্নদূত আমারই আগমন অপেক্ষায় দাওয়ায় বসে বিড়ি ফুঁকচে।

সেই একঘেয়ে খবর—বাঘিনী মানুষ মেরেছে। মানুষ মেরেছে সত্যি, তবে একটা নয়। অবাক হয়ে শুনি খোঁড়া ফরমানের খবর।

সর্দারদের খামার থেকে দু'দুটো মজুরকে টেনে নিয়ে গেছে বাঘিনী।

তাজ্জব কথা—তাই ছুটতে হলো তক্ষুনি। একসঙ্গে দুটি মানুষকে হত্যা করা বাঘিনীর স্বভাব নয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে হয়তো—হত্যা তো পাবে।

কিন্তু হত্যা করেছে বলেই টেনে নিয়ে যাওয়া তার স্বভাব নয়। তবে সেও কি প্রয়োজনের তাগিদ?

বাঘিনী আজ একা—তিন তিনটে বাচ্চা তো আগেই মারা পড়েছে একে একে। এই বাড়তি প্রয়োজনটুকু তবে কার জন্যে?

ভারী সমস্যায় পড়লুম।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরেজমিন তদন্তের পরে তবেই আশ্বস্ত হলুম যে বাঘিনী আজ আর নিঃসঙ্গ নয়।

শক্ত মাটির উপরে পায়ের ছাপ পড়েনি। তবে একই সঙ্গে দুটি মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছিল বলে মনে করবার কারণ ছিল। সম্ভবতঃ মজুর দুজন চার পাঁচ হাত দূরে বসে ধান মাপছিল। পিছন থেকে চুপিসাড়ে এসে দুজনকেই এক সঙ্গে আক্রমণ করা হয়েছে। ওদের কেউই সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে পারেনি।

খামারের অপর প্রান্তে গোলায় ধান তুলছিল আরো কয়েকজন মজুর। মাঝখানে সারিবদ্ধ ধানের গাদা। গাদার আড়ালে যা ঘটে

গেল তার খবর গোলার মজুরেরা প্রথমটা কিছু জানতেই পারেনি। যখন জানলো, তখন আর হতভাগ্যদের সন্ধান মিললো না।

রক্তের দাগ থেকে বুঝলাম যে ঘটনাস্থল থেকে একজন মজুরকে তিরিশ চল্লিশ হাত দূর পর্যন্ত উঁচু করেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপবে আট দশ হাত মাটিতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার পরে শিকাবকে মাটি থেকে আবার উঁচু করে তুলে নিয়ে গেছে শিকারী।

অন্য শিকারী কিন্তু তাঁব মানুষ-শিকাবটিকে ববাববই মাটিতে হিঁচড়ে টেনে নিযে গেছে।

বেশ বুঝতে পারি যে ঐ প্রথম শিকাবী হচ্ছে বাঘিনা।

ঐটেই ওব স্বভাব। শিকাবকে সে মাটি থেকে উচু কবে নিয়ে চলে।

অন্য, শিকারী নিতান্তই আনাড়ী। সম্ভবতঃ নদীব ওপাবেব সুন্দরবন থেকে সে সদ্য আগন্তুক।

তাছাড়া সে জাতে পুরুষ এবং বাঘিনীর বর্তমান সঙ্গী।

কদিন আগেও বাঘিনীব গর্জন শোনা যেতো বাতেব বেলায়। আজ দুতিন দিন কিন্তু তাব ডাক শোনা যায়নি আব।

সঙ্গীব জন্যেই বাঘিনী ডাকতো। সঙ্গী লাভেব পব এই ডাক বন্ধ হয়েছে। সেইটেই স্বাভাবিক।

আগন্তুকেব পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন মানুষেব সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বেড়ার চৌহদ্দীব মধ্যে ঢুকতেই সাহস পেতোনা আগন্তুক। বাঘিনীব সাহসে এবং শিক্ষায় সে এসেছিল সঙ্গিনীব সঙ্গে।

একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসব—বাঘিনীব সঙ্গে জুটেছে বাঘ। কুহকিনীর শিক্ষায় এই অনাড়ী বাঘ অচিরে হয়ে দাঁড়াবে দুরন্ত মানুষখেকো।

অতএব অনতিবিলম্বে ওকে খুন করতে হবে, সম্ভব হলে

আজই। নইলে অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার কথা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

কথাটা আর কাউকে জানতে দেওয়া ঠিক হবে না। আতঙ্কিত প্রজাদের স্নায়ুযন্ত্রটিকে একেবারে বিকল করে দিয়ে লাভ নেই, বরং লোকসানের ভয় আছে।

তাই চুপচাপ থেকে গেলুম তখনকারের মত। তমিজুদ্দীনও কিন্তু ব্যাপারটা বোঝেনি। তবু ওকে বলতে হলো সব কথা খুলে। ওর চোখ না থাক দেখবার মত, বুকের পাটায় সাহস আছে, লক্ষ্য ভেদ করবার মত টিপ আছে ওর হাতে। এর আগে কমসে কম ডজন দুয়েক রয়াল বেঙ্গল টাইগার মেরেছে তমিজুদ্দীন।

ময়না আর তমিজুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে মানিকজোড়ের সন্ধানেই বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি। রুকসাও রয়েছে সঙ্গে।

খামারের পিছন দিকে ভেড়ির বাঁধ—আধ মাইলের মত দূর হবে বড় জোর। বাঁধের নিচে কেওড়ার জঙ্গল।

আবার খামারের ডাইনে ও বামে একটা একহাঁটু জলের খাল। খালের ওপারে অপেক্ষাকৃত কম দূরে দু'দুটো জঙ্গলখণ্ডও দেখা যাচ্ছে। ফলে শিকারকে টেনে নিয়ে ওরা কোথায় আস্তানা গেড়েছে তারই হদিশ করতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

রক্তের দাগ ধরেই আসতে পারা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেই রক্তের দাগও খুব পরিষ্কার ছিল না। বরং, মনে হলো যে ওরা খামারের ডানদিকে ঐ খণ্ড জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল প্রথমে। খালের কাছে এসে আবার হঠাৎ ওরা গতি পথ বদলে ভেড়ির পারের কেওড়ার জঙ্গলের দিকেই পা বাড়িয়েছে।

রক্তের চিহ্ন নয়, ঘাসের মাথা পরীক্ষা করেই সেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

ভেড়ির বাঁধের ওপারে অগুণতি পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে নরম কাদায়।

অনেকদিন অনেকবার ওরা চলাফেরা করেছে এখানে। ওরা বলছি কেন! সব ছাপগুলি তো আপাত দৃষ্টিতে হুবহু একরকমের। মনে হবে একটি মাত্র বাঘ হয়তো তার যাতায়াতের চিহ্ন রেখে গেছে।

ময়নাকে বললুম পায়ের ছাপ পড়ে বাঘিনী আর তার সঙ্গীর নিশানা জানাতে।

ময়না মুচকি হাসে শুধু। তার অর্থ, এতকাল তবে কি শিখেছি আমি।

অগত্যা কাদায় নেমে কাজে লাগলুম। তমিজুদ্দীন তো রাগে গজ গজ করতে থাকে। 'কোনকালের কত ছাপ, ঐ দেখে বেলা নষ্ট করতি চাও করো। আমি ততক্ষণ তোমার বাঁদরীটারে নিয়ে জঙ্গলটারে চষে দেখি।'

বাঁদরী বলে গাল দেওয়াতে রুকসার বোধ হয় রাগ হয়েছিল খুব। তাই সে তমিজুদ্দীনের সঙ্গে আড়ি দিয়ে গাছের মাথায় চুপটি করে বসে রইল।

পায়ের ছাপ—হ্যাঁ, সবগুলি একই রকমের দেখায় বটে। অনেক মনোযোগেব সঙ্গে অনেকদিন ধরে দেখতে দেখতে পাকা চোখ তৈরী হয়। সেই চোখের দৃষ্টিতেই শুধু ধরা পড়ে খুঁটিনাটি।

তমিজুদ্দীন মিথ্যে বলেনি। দশ-বারো দিন আগেকাব ছাপও আছে। তিন চার দিন আগেকার পদচিহ্ন—তাও আছে। কিন্তু গত রাত্রের পদচিহ্নও আঁকা পড়েছে সেই সঙ্গে।

ওরা দুজন বটে।

একজনের পায়ের থাবার দৈর্ঘ্য কম, কিন্তু বিস্তৃতিতে বেশি বা চ্যাপটা ধাঁচের গড়ন। নখরগুলি একটু বেশি মোটা; কিন্তু কম সূঁচালো। পায়ের থাবার মালিক ওজনে ভারী।

অপর জনেব পায়ের থাবা লম্বাটে ধাঁচের, অর্থাৎ বিস্তৃতির অনুপাতে বেশি দীর্ঘ। নখরগুলি সরু, লম্বা আর সূঁচালো।

বেশ বুঝতে পারলুম যে বাঘিনী চলেছে আগে আগে। সঙ্গিনীর

পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে আগন্তুক সঙ্গী। ফলে ওদের কারো পায়ের ছাপই পরিষ্কার নয় এবং প্রায়ই বিকৃত।

বাঘিনীর পায়ের ছাপ আমার খুব চেনা বলেই এক্ষেত্রে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

জঙ্গলে প্রবেশ করার পরে কোন দিকে গেছে ওরা? এ আর এক সমস্যা বটে।

ওরা দুজনায় দুটি মানুষকে টেনে নিয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে একটা আস্তানা নিয়েছিল। শিকার দুটিকে আস্তানায় সঙ্গীর হেপাজতে রেখে বাঘিনী আবার সেই একই পথে জঙ্গলের বাইরে এসেছিল। সম্ভবতঃ মানুষেরা তাদের অনুসরণ করেছে কিনা সেই খবরটা সে যাচাই করে দেখেছিল। তারপরে নিঃসন্দেহ চিত্তে সে আবার ফিরে গেছে তার শিকারের কাছে।

বারবার একই পথে যাতায়াতের ফলে পায়ের ছাপগুলির একটিও অক্ষত ছিলনা। শিকারকে টেনে নিয়ে যাবার দাগও মুছে গেছে একরকম।

নিরুপায় হয়ে জঙ্গলের লতাগুল্ম ও ঝুলোর মাথাগুলোকে পরীক্ষা করে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি। জঙ্গলের মধ্যে এক নালার ধারে পেলুম এবার পুরো চার পায়ের ছাপ– বাঘিনীর নয়, তার নোতুন প্রণয়ীর। চমৎকার চিহ্ন। হিসেবমত পায়ের মালিকের দৈর্ঘ্য হবে ন'দশ ফুটের মত। আকারে বিশাল, ওজনেও জাদরেল। তবে সুমুখের বাম পায়ে সে সম্ভবতঃ আহত। একটু খুঁড়িয়ে চলে, কিংবা হয়তো কাদার ভেতর চলতে ব্যথা বোধ করছিল বলেই সে পাটাকে বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে।

এতক্ষণে যেন আলোর নিশানা পেলুম। ময়না হাসে, আশার চমক আর আনন্দের উচ্ছ্বাস ওর হাসিতে।

ওর কপালে আজ মরণ লেখা আছে তোমার হাতে। কেউ ঠেকাতি পারবে না দাদাভাই—ময়না হাসতে থাকে।

ময়নার কথায় উৎসাহিত হয়ে পা বাড়ালুম। হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি, সুমুখের একটা গভীর খাদ থেকে উড়ে এসে গাছের ডালে বসলো একটি কাক—কা-কা-কা।

কাকের চেঁচানিতে খাদের মধ্য থেকে একটা শকুনিও উড়ে এলো।

কাকটা চেঁচাতে থাকে—কা-কা-কা। ওদিক থেকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল 'গুড়ুম'।

কাকটা তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে উড়ে পালালো।

বন্দুকের আওয়াজ!

কিন্তু অবাক হয়ে গেলুম এই ভেবে যে স্থানীয় শিকারীদের কেউ তো একথা আমাকে জানায়নি।

আবার বাইরেব কেউ হলে কাছাবির অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে। তবে কাছারি তো ফাঁকা, না আছে নায়েব-গোমস্তা না আছে পাইক-পেয়াদা। থাকার মধ্যে আছি আমি একা।

যাক্ সে কথা।

খাদেব ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলুম অনেকগুলো মাথা আব একরাশ হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আহাব পব সাঙ্গ করে ওরা আর কোথাও চলে গেছে! নালার নিচু দিকে কয়েক পা এগিয়ে লাফ দিয়ে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

মাথার উপরে গাছের একটা ডালে দোলা লাগলো। চেয়ে দেখি, গাছের আগডালে চড়ে বসেছে রুকসা।

আকাশেব রোদও গাছের আগডালে বসে যাই যাই কবছে।

ভাবছিলুম, এর পরে আর অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

আবার সেই শব্দ—'গুড়ুম'।

জঙ্গলের বাইরে এসে বরং এই বন্দুকধারীর সন্ধান কবা প্রয়োজন।

ভেড়ির বাঁধের উপর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসতেই চোখে পড়লো কটি মানুষ! একজনের পবণে আবাব হ্যাট-কোট।

কনজাবভেটব সাহেব বা বেঙ্গাব সাহেব হতে পাবেন, কিম্বা হয়তো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সাহেব।

দীর্ঘদেহ কালীকে দূর থেকে চিনতে ভুল হয়না কাবো। কালী কপালীকে চিনিযে দেয ওব ঐ দৈত্য দেহখানি।

ব্যাপাব কি।

জলজ্যান্ত এক সাহেব কালীব সঙ্গে কবমর্দন কববাব জন্যে হাত বাড়িযে আছেন।

আবে, এ যে আমাদেব সেই স্বদেশী ডাকাত ধবা সাহেব!

সাহেব সত্যিই স্বদেশী ডাকাত ধবতে এই জঙ্গলা দেশে এসে পডেছেন।

স্বদেশী ডাকাতেবা কিন্তু সাহেবেব চোখে ধুলো দিযে সবে পড়েছে। তাই ঘাটে লঞ্চ থামিযে পাখি শিকাবেব জন্যে ডাঙ্গায উঠেছিলেন। গোটা কযেক বাটাং আব দু তিনটে বাকচু পাখি শিকাব কবেছেন আজ দুপুব থেকে। এইমাত্র একটা কাস্তেচোবা পাখিকে গুলি কবে ধবাশাযী কবেছেন তিনি।

কিন্তু কালী আব অভিমন্যু এসে কৈফিযৎ দাবি কবে বসল, জমিদাবেব হুকুমনামা দেখতে চাইল।

ফলে আবক্ত চক্ষু সাহেব কালীকেই গুলি কবে বসেন আব কি।

হাতেব লাঠিতে পাক দিযে কালী সেই গুলি প্রতিবোধ কবতে এগিযে যায।

এ হেন একটা আজব কাণ্ড দেখে সাহেবেব তো নাডী ছাডবাব জোগাড।

তাই বিনাসর্তে তিনি আত্মসমর্পণ কবেন এবং কালীব সঙ্গে বন্ধুত্ব কবে সে যাত্রা বক্ষে পান।

বিনিমযে কালী সাহেবেব কাছ থেকে আদায় কবে নিযেছে

একটি কথা। কথাটা এই যে স্বদেশী ডাকাতদের পেছু নিয়ে তিনি আর কখনও এই অঞ্চলে পদার্পণ করবেন না।

স্বদেশী ডাকাতদের উপর কালীর এই দরদ কেন? কালী ওদেরকে ভালবাসে, খুব ভালবাসে।

ছেলে ছোকরার দল, পাকাপোক্ত হয়নি তেমন। কিন্তু লেখাপড়া জানে—বিদ্যের জাহাজ একেবারে। কালী একবার ওদের একখানা ছিপ আটক করেছিল। কালী সর্দারের রাজ্যে আর একদল ডাকাত! কালী ওদের ধরে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। কালীর মনে যেন কেমন কেমন একটা নোতুন ভাব জেগেছে।

কালীর বৌ বললে, "ওরা ভদ্দরনোকের ছেলে, বড় ঘরের ছেলে, খবরদার ওদের গায়ে হাত তুলোনা। খাইয়ে দাইয়ে বিদেয় করে দাও বাপু।"

ভাত আর খাসির মাংস রান্না করে দিল কালীর বৌ।

ছোকরা ডাকাতেরা কিন্তু নুন দিয়ে ভাত মেখে খেলে।

দেশ থেকে ইংরেজ রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে যখন দেশের সকল গরীব মানুষকে ওরা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে তখন আবার কালীর বাড়িতে এসে মায়ের হাতের রান্না খেয়ে যাবে ওরা।

মায়ের মন গলে গেল মা ডাকে, কালীর বুকটাতেও দোলা লাগে।

কথায় কথায় কালী শুনলো সবই।

ইংরেজকে তাড়ানো সহজ নয়, অনেক কামান বন্দুক চাই। অস্ত্রপাতি কিনতে চাই টাকা। তাই টাকার জন্যে ওরা ডাকাতি করে। সেই রাতেও ওরা ডাকাতি করতেই বেরিয়েছিল কিন্তু পথে কালীর হাতে বন্দী হয়েছে।

কালী ওদের সেই রাত্রেই টাকার জোগাড় করে দিয়েছিল। অবিশ্যি ঘোষদের বাড়ি লুট করে।

কি কথায় কি এসে গেল দেখ।

বলতে বসেছি যে বাঘ আর বাঘিনীর কথা, সেই কথাতেই ফিরে যাই আবার।

প্রাতরাশের পাতে গোটা মানুষ। সম্ভবতঃ আজ আর আহারের চেষ্টায় না বেরিয়ে মধুরাত্রি যাপনের পরিকল্পনা করবে ওরা।

তাছাড়া পর পর দুই রাত্রি একই জায়গায় শিকার ধরা ওদের স্বভাব নয়।

তবু আমার মন বলে যে ওরা আসবে, আবার আসবে আজ।

আগন্তুক বাঘটি মনুষ্যচরিত সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল নয়। তা ছাড়া বাদশাহী খানার লোভ।

ময়না কিন্তু আমার ওসব যুক্তিকে আমল দিতে চাইলেনা। তবে শেষ পর্যন্ত আমার জিদের কাছে হার মানতে হলো ওকে।

ভেড়ির বাঁধের এপাশে যেখানে যত খণ্ড-জঙ্গল আছে সুবিধেমত প্রায় সব জায়গাতেই গর্ত ফাঁদ তৈরী ছিল যাতায়াতের পথের উপরে।

যেখানে গর্ত ফাঁদের সুবিধে নেই সেখানে দড়ির ফাঁদ পেতেছে শিকারীরা।

বাঘিনী বড় হুঁসিয়ার। শিকারীদের সব কৌশলকেই ব্যর্থ করেছে সে এতদিন ধরে।

সব কথা জেনে শুনেও খামারের প্রবেশ পথে গর্ত ফাঁদ পাতা হলো আজ।

গর্ত ফাঁদ অবিশ্যি বন্য জন্তু ধরবার পক্ষে একটা বহু ব্যবহৃত ফন্দী। তবে আবাদী অঞ্চলে শুধু বুনো দাঁতাল শূয়োর ধরবার জন্যেই এর ব্যবহার হয়, বাঘ ধরবার জন্যে নয়।

কেমন এই গর্ত ফাঁদ?

হাত পাঁচেকের মত ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত। তারই পাশ বরাবর বৃত্তাকারে খাল কাটা হয়। চার পাঁচ হাত চওড়া আর পাঁচ-ছয় হাত গভীর ঐ গর্ত। এই গোলাকার গর্তের উপরে আড়া-

আড়িভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় লম্বা পাটের কাঠি। কাঠির উপরে মাটি আর ঘাসের চাবড়া ইত্যাদি সাজিয়ে আশপাশের সঙ্গে মানিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে আসল কথা।

এই গোলাকার গর্তের কেন্দ্রে রইল শক্ত মাটি। এই শক্ত মাটিতে খোঁটা পুতে খুব খাটো দড়িতে বাঁধা থাকে চার-গরু কি মোষ।

বাঘের স্বভাব এই যে কিছুটা দূর থেকে শিকারকে সে খুঁটিয়ে দেখে—গোটা পরিবেশকেও। তারপরে যদি সন্দেহের কোন কারণ না থাকে তাহলে বিদ্যুৎবেগে সে ছুটে আসে শিকার ধরবার জন্যে। গর্ত ফাঁদের উপরকার পাটকাঠি কি ঐ দশ-বারো মন ওজনের বপুখানি বইতে পারে! ফলে বাঘ বন্দী হয় গর্ত ফাঁদে।

খামারের দরজা খোলা রাখা হলো। খামারে ঢুকে দুপাশের শক্ত বাঁশের বেড়ার ভেতর দিয়ে একটুখানি পথ এগিয়ে এলেই বেষ্টনীর শেষ।

এই পথের মুখেই পাতা হলো গর্ত ফাঁদ। ফাঁদের চার গরু কি মোষ নয়, স্বয়ং ময়না আর তমিজুদ্দীন। দুজনেই ওরা থাকবে বন্দুকধারী। তবে ভাবটা এই যে নিতান্ত নিরীহ দুজন মজুর ধান ঝাড়ছে বসে।

খামারের শেষ প্রান্তে গরুর গোয়াল। খামারের মাঝামাঝি জায়গায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দু সারি ধানের গাদা। খামারের কেন্দ্রস্থলে একটা ন্যাড়া তালগাছ। এই তালগাছটিকে ঘিরে মাথা উঁচিয়ে আছে সারির মধ্যের সেরা গাদা।

গোয়াল আর গর্ত ফাঁদ দুটোই অনেকখানি দূরে। আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পড়েনা।

উপযুক্ত আর কোন জায়গা না পেয়ে এই ধানের গাদার মাথায় চড়ে বসতো হলো আমাকে। কিছু দূরে ধান মলাইয়ের জায়গা। মজুরেরা যেন ধান মলাই করছিল একটু আগে তেমনি করেই চার দিয়ে একজোড়া গরুকে।

গোয়ালের পাশে পাঁচিলের দরজাও অল্প একটু খুলে রাখা হলো যাতে শার্দূল যুগল সহজে প্রবেশ করতে পারে খামারের মধ্যে। গোয়ালের দরজা বন্ধ। অতএব ধান মলাইয়ের জায়গায় বাঁধা এই অরক্ষিত সহজ শিকার দুটির দিকে ওদের নজর পড়বে। তখন আমার প্রতীক্ষার শেষ লগ্ন।

সন্ধ্যের আঁধার নামতেই ধানের গাদার মাথায় উঠলুম মই বেয়ে। সঙ্গে শুধু রুকসা।

ধানের গাদাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে ওর মাথার উপরে খড়ের তৈরী মস্ত বড় ছাতা।

ছাতার তলে চমৎকার জায়গা। তবে অসহ্য গরমে প্রাণ বেরুবার জোগাড়। রুকসা তো কিছুতেই থাকতে চায়না ওর মধ্যে। রক্ষে যে কিছুদিন থেকে সাহেবী ধড়া চুড়া ছেড়েছি। দস্তুরমত চাষীর বেশ এখন। ধুতি, ফতুয়া আর কাঁধের বদলে কোমরে নেমেছে গামছা।

রাত তখন এগারোটা হবে। নামলো বৃষ্টি, জোর এক পশলা বৃষ্টি।

বৃষ্টির মধ্যেই অন্দরমহলের কুকুরকুল চেঁচামেচি শুরু করলো। গোহালের গরুও হাম্বারবের ঐক্যতান তুলে সজাগ করে দিল আমাকে। কিন্তু চেয়ে দেখবো কি, মুখ বাড়াবার উপায় নেই। মূষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

আমার চারের গরুজোড়াও বার কয়েক ডেকে উঠলো। কান পেতে শুনলুম সেই ডাক। না—বাঘের ভয় নয়, বৃষ্টির দাপটে অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা।

বৃষ্টি থামলো, কিন্তু মেঘ কাটলো না। ময়না আর তমিজুদ্দীনকে নজরে পড়লো না। কি জানি কোথায় গেল ওরা।

রুকসা এতক্ষণ ছাতার তলে বসেছিল বৃষ্টির ভয়ে। বৃষ্টি থামতেই ছাতার বাইরে গেছিল সে। হঠাৎ দেখি তীব্র মনোযোগের সঙ্গে হাত পঞ্চাশেক দূরের একটা গাদার দিকে চেয়ে বসে আছে সে।

রুকসার ইঙ্গিতে আমিও চেয়ে বসে রইলুম সেইদিকে। কৈ, কিছুই তো নজরে পড়ে না। দুতিন মিনিট পরে নজরে পড়লো একটা চলন্ত মূর্তি। আমার বাম পাশের ধানের গাদার তল দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে সে। ময়না কি তমিজুদ্দীন হবে নিশ্চয়। কিন্তু অমন করে চুপিসাড়ে চলেছে কেন?

চার পাঁচটা ধানের গাদার অন্ধকার তল দিয়ে গুঁড়ি মেরে সে আমারই গাদার তলে এসে হাজির হলো। একটুও না থেমে সে এগিয়ে চলেছে।

রুকসা চিমটি কাটে আমার বাহুতে। তারপরে আমাব বন্দুকের কুঁদোর উপর আঁচড়াতে থাকে।

রুকসার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখতে পেলুম আর একটি চলন্ত মূর্তি। মানুষের মূর্তি নয়।

তবে!

বিশাল দেহ এক জানোয়ার। কয়েক মিনিট আগে মনুষ্য মূর্তিটিকে যেখানে প্রথম দেখেছিলুম ঠিক সেইখানটাতে পৌঁছে চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

তারপর আবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসতে থাকে সেই জানোয়ারটা।

এযে শিকার ধরবার পূর্ব মুহূর্তের ভঙ্গী বা চলন। অন্ধকারে ধানের গাদার গা ঘেঁষে এগিয়ে আসছে। এখান থেকে ওকে গুলি করা অসম্ভব। কিন্তু আর কয়েক মিনিট দেরী করলে···। কথাটা মনে আসতেই শিউরে উঠি—আবার আর একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে হারাতে হবে।

এক মুহূর্তের অপেক্ষা নয় আর। পরণের আট হাতি কাপড় আর গায়ের ফতুয়া খুলে ফেলে গামছাখানিকে মালকোঁচা মেরে পরে নিলুম।

চুপিসাড়ে মই বেয়ে নেমে এলুম গাদার পিছন দিকে।

সম্ভবতঃ একটু শব্দ হয়েছিল। মুখ বাড়িয়ে দেখলুম আমার সুমুখে চতুর্থ গাদাটির তলে থমকে দাঁড়িয়ে আছে সেই জানোয়ারটা।

মিনিট কয়েক চুপচাপ কাটলো।

আমার ডাইনে আর এক সারি ধানের গাদা। তারপরে ধান মলাইয়ের জায়গা। সেখানেই চার রেখেছি একজোড়া বলদকে। প্রতিপক্ষ যাতে ঐ বলদজোড়ার দিকে আকৃষ্ট হয় এই জন্যেই দুই সারি ধানের গাদার মধ্যে একটা খালি কার্তুজের খোল ছুঁড়ে দিলুম।

জানোয়ারটা ঐ শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গুঁড়ি মেরে গাদার উলটো পিঠে দুই সারি গাদার মধ্যে এসে হাজির হলো।

বলদজোড়া তখনও বাঘের গায়েব গন্ধ পায়নি। ওদেব কোন ডাক শুনতে পেলুম না।

ভাবছিলুম, দুই সারি গাদার মধ্যেকার তিন চাব হাত চওড়া গলি বেয়েই প্রতিপক্ষ এবার এগিয়ে আসবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম সে ওব আগেকারেব জায়গাটিতেই ফিরে এলো আবার।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে সে—আরও সাবধানী চলন।

চতুর্থ গাদাটি থেকে তৃতীয় গাদার তলে পৌছে গেল সে অচিরে।

তৃতীয় গাদাটিকে বেড় দিয়ে আমার ডানদিকে চলে গেল আবার।

হঠাৎ দেখলুম দ্বিতীয় গাদার তল দিয়ে এগিয়ে আসছে সে।

কখন যে সে দুই গাদার মধ্যেকার ফাঁকটুকুকে অতিক্রম করে এসেছে তা আমি লক্ষ্য করতেই পারিনি। এতক্ষণে বুঝলুম যে সাজ্ঘাতিক বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছি আমি।

দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু মেলেই পাহারা দিচ্ছি, অথচ আমার দশ ইন্দ্রিয়ের জাগ্রত পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে কেমন করে সে এসে হাজির হলো আমার সুমুখের গাদার আড়ালে।

ভয়ে কেঁপে উঠল গোটা দেহটা। সে যে কোন দিক থেকে কেমন ভাবে আসছে তা জানবার কোন উপায় থাকবে না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি করলেও সে আমাকে রেহাই দেবেনা।

ওর চলন দেখে মনে হয়েছিল যে আমার বাম দিক দিয়েই আসবে সে। তাবলে আমার ডাইনে সে হাজির হবেনা এমন কথাও তো বলা যায় না হলপ করে।

কি জানি এতক্ষণে সে আমারই গাদার ওপিঠে এসে হাজির হয়েছে কিনা।

হাত চারেকের মত খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে পাশের সারিতে যেয়ে আত্মগোপন করতে পারলে তবেই ওকে গুলি করা সম্ভব।

আত্মরক্ষার জন্যেও এখান থেকে সরে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

জানোয়ারটাকে দেখতে পেলুম না বলে পিছনে হটে এসে পরের গাদাটির আড়ালে আশ্রয় নিলুম। উঁকি দিয়ে দেখি আমারই পরিত্যক্ত গাদার পিছনে আমার বাঁয়ে মাটির সঙ্গে সে মিশে আছে যেন।

এই সুযোগে আমার ডানপাশের সারিতে সরে গেলুম।

জানোয়ারটিকে আবার দেখতে পেলুম—গাদার ওপিঠ ছেড়ে এই পিঠেই এলো সে। এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই···।

না—জানোয়ারটা আবার ফিরে গেল গাদার ওপিঠে।

দুই গাদার মধ্যে বড়জোর চার-পাঁচ হাতের ব্যবধান, ঠিক যেমন দুই সারির মধ্যে দূরত্ব।

একটা চমকের মতই এই চাঁর পাঁচ হাতের ফাঁকটুকু পেরিয়ে সুমুখের গাদাটার আড়ালে চলে গেল জানোয়ারটা।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লুম এতক্ষণে। কিন্তু ওকে হত্যা করবার সুযোগও বুঝি ফসকে যায়।

না—সুযোগ এখনও আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে নিঃসাড়ে এগিয়ে যেতে হবে ওর পিছনে।

কিন্তু কে জানে জানোয়ারটা এখন কোনখানে, কতদূরে বা।

মিনিট কয়েক পরে আবার নজরে পড়লো, সে আর একটি গাদার দিকে এগিয়ে চলেছে।

লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হলোনা বলে চুপচাপ রইলুম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আমিও আমার সারির সুমুখের গাদার আড়ালে এসে আশ্রয় নিলুম।

উঁকি দিয়ে দেখি জানোয়ারটা চার পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমারই গাদার দিকে চেয়ে দেখছে। ওর মনে সন্দেহ হ'য়েছে! গাদার গা ঘেঁষে কয়েক পা এগিয়ে এলো সে।

কোণাকুণিভাবে দুই সারির মধ্যেকার সেই ফাঁকটুকুই এখন আমাদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান।

জানোয়ারটি নিঃসন্দেহ হলো শেষ পর্যন্ত। তাই সে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল প্রথমটা। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চললো এগিয়ে।

পিছন থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে এলুম আমি। স্থির লক্ষ্যে তুলে ধরলুম আমার হাতিয়ার—দুড়ুম দুড়ুম।

জানোয়ারটার মুখটা শুধু মাটির গায়ে থুবড়ে পড়লো। কণ্ঠনালী থেকে সজোরে বেরিয়ে এলো শুধু একটা ফুৎকারের শব্দ।

বাঘিনীকে বধ করেছি ভেবে উল্লাসে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো দেহ। হঠাৎ সেই বিস্ফারিত বুকটা আবার কুঁকড়ে গুটিয়ে এলো তমিজুদ্দীনের আর্ত চীৎকারে, 'হুজুর, আমারে জানে মেরে গেল শয়তানী—জানে মেরে গেল।'

'গুড়ুম গুড়ুম'—গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ময়নার চীৎকার কানে এলো—'দাদাভাই, কোথায় তুমি।'

উত্তর দিলুম, কিন্তু নড়তে পারলুম না। গুলিভরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে আছি, কি জানি, আবার যদি সে—।

রক্ত গড়িয়ে আসছে আমারই পায়ের দিকে—লাল তাজা রক্তের ধারা দানা বেঁধে জমেছে মাটির উপরে।

আলো এলো, লোকজন এলো। তমিজুদ্দীনের শিয়রে বসে আমি আর ময়না। যমদূতের মনে এতটুকু ভয় হলো না তবু। বাঘিনীর মতই চুপিসাড়ে এসে চুরি করে নিয়ে গেল সে বুড়ো তমিজুদ্দীনের ধুকধুক করা প্রাণটাকে।

খাটিয়ার উপবে উপুড় হয়ে রইল তমিজুদ্দীন। ওর পিঠেব উপরে মস্ত বড় একটা গর্তের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওর নিশ্চল হৃৎপিণ্ড।

আর বাঘিনীর যৌবনমত্ত প্রণয়ী! লুটিয়ে পড়ে আছে সে খাটিয়ার নিচে। মাথার উপরকারের গর্ত দুটো থেকে তখনও গড়িয়ে পড়ছে, হলুদ রঙের রস।

চেয়ে দেখি ভোবের আলোর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে রুকসা।

॥ নয় ॥

তমিজুদ্দিনের শেষকৃত্য সেরে ছাড়া পেলুম প্রায় বারোটা নাগাদ। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। চোখ দুটোতেও এসেছে ঝিমুনি। খেয়াঘাটে এসে দেখি খেয়ার মাঝি নেই, অথচ খেয়ার নৌকা বাধা আছে ঘাটে।

মাঝির জন্যে হাঁক ডাক শুরু করল ময়না। কিন্তু কোথায় মাঝি! অদূরেই ওর কুঁড়ে। ময়না তাই ওকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসতে চাইলো। ক্ষিধের জ্বালায় পেট চাঁই চাঁই করছে তখন—তর সয়না তাই। নিজেই যেয়ে বসে পড়লুম হাল ধরবো বলে। হালখানা হাতে ধরেছি মাত্র, আঁৎকে উঠলো যেন গোটা দেহটা। চোখের সুমুখে এ কি দেখছি! রক্ত,—জমাট রক্ত। আমার বাঁয়ে মাটির উপরে রক্তের দাগ দানা বেঁধে জমে আছে।

ওপারে কাছারি। এই খেয়া তাই দিনের বেলায় বন্ধ রাখা চলেনা। অথচ বাঘিনীর ভয়ে কেউ রাজী হয়নি খেয়ার নৌকায় মাঝিগিরি করতে। মোটা মাইনের লোভ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত মাঝি পাওয়া গেল। প্রথম প্রথম এখানে একজন বন্দুকধারী পাহারার ব্যবস্থাও রেখেছিলুম খেয়ার মাঝিকে পাহারা দিতে। কিন্তু আজ কদিন হলো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে পাহারাওয়ালা। সেই থেকেই খেয়ার মাঝি একা।

যা হোক, সন্দেহ নিরসন করতে ময়নাকে পাঠালুম মাঝির বাড়িতে। ফিরে এলো ময়না একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে নিয়ে।

খোঁজাখুজি করে লাভ নেই জানি। তবুও একটা চেষ্টা না করে চলে যেতে পারলুম না। ক্ষয় ক্ষতি—কি জানি আর কত কর আদায় করবে বাঘিনী!

সেদিন রাতে ঘুমিয়েছি—কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমনি ঘুম। কদিনের অভ্যাসমত রাতদুপুরে মায়ের কবরের কান্নাতেও ঘুম ভাঙেনি। শেষরাতে রুকসা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ক্ষেপে উঠেছে রুকসা। একবাব লাফিয়ে উঠছে আমার খাটের উপর, আবার তক্ষুনি লাফিয়ে পড়ছে নিচে। কখনো আবার আমার মাথার চুল ধরে টানাটানি করছে, কখনো বা আঁচড়ে দিচ্ছে আমাব পায়ে। তন্দ্রা ঘোর কাটেনি তখনও। মনে হলো চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ করছে ক্যাবলা। রতনও চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে।

চোখের উপর হাত রগড়াচ্ছি তখন, দেখি রুকসা আমার বন্দুকটাকে বগলে কবে নিয়ে এসেছে। ঘুম ছুটে গেল আচম্বিতে। দরজার খিল খুলতে যেয়ে দেখি বাইরের থেকে শিকল তুলে দিয়েছে কে। বাইরে ময়না আর কালীর গলা শোনা যাচ্ছে।

'আ-উন, আউন-আউন'—ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে ডুবে গেল ওদের তুজনের গলা। রুকসা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো আমার কাঁধেব উপব। ক্যাবলাব ঘেউ ঘেউ থেমে গেল এক নিমিষে। লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ শুরু করেছে সে।

ময়নাকে বলি দরজার শিকল খুলে দিতে। ময়না শিকল খুলে দিল বটে, কিন্তু খপ্ করে বন্দুকটিকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিল।

'শয়তানীডার মরণবাড় হয়েছে দাদাভাই। মোলাকাৎ করতি ডাকতিছে আমারে। যাতি হবে তাই। তবে কাছাবিতে পাহাবা নেই কেউ। কালী সর্দারও যাতি চায়। কিন্তু তোমারে যাতি দেবোনা। যা হোক একটা এস্পার ওস্পার হবে আজ।'

'তাই যদি হয় তাহলে আমার হাতেই তা হোক।'

'তাই হবে। কিন্তু কালীমার দিব্যি করে কও বারণ্ডা থেকে নামবানা তুমি ভোরের আগে', বললে কালী।

দিব্যি না করে উপায় ছিলনা। তাই দিব্যি করলুম। কালী

আর ময়না বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কাঠের সিঁড়িটাকে সরিয়ে নিল। কাছারির বারান্দাগুলি অনেক উঁচু। বাঘ তো দূরের কথা বানরদের পক্ষেও লাফিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। জন্তু জানোয়ারদের ভয়েই এমনি উঁচু বারান্দা প্রায় গেরস্তের বাড়িতেই আছে।

ওরা চলে গেল। বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে বারান্দার উপর পায়চারি করে বেড়াই আমি। কাছারি ঘরের বড় ঘড়িটাতে টক টক শব্দ করে সময় মেপে চলেছে ওর ঝুলন্ত দোলকটা। ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে আমিও সময় গুণছি বসে বসে। একপাশে ক্যাবলা আর একপাশে রুকসা। রুকসা মিটমিট করে চায় ক্যাবলার দিকে। উত্তরে রাগে গোঁ গোঁ করে ক্যাবলা।

ময়না আর কালীর হাসিতে চমকে জেগে উঠলুম হঠাৎ। ক্যাবলার পিঠের উপরে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলুম আমি। উঠে বসে দেখি আমার বন্দুক বাগিয়ে ধরে আমাকেই পাহারা দিচ্ছে রুকসা। বারান্দার উপরে তখন সকালের স্নিগ্ধ রোদ।

শরীরে আর সয়না—বাধ্য হয়ে তাই শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছিলুম। কাছারির ঘাটে বোট বাঁধা ছিল। ভাবলুম একবার বোটে চেপে ঘুরে আসি। সুন্দরবনের বনমোরগ বা বনের খাল থেকে কিছু মাছ নিয়ে আসি। বোটের মাঝি সবাই মাছ ধরতে পারে, আর জাল তো ওদের সঙ্গেই আছে।

একজোড়া বনমোরগ আর একরাশ মাছ নিয়ে ফিরছিলুম। দেখি, ফরমান খাঁ আসছে ওর সেই বেতো ঘোড়ার পিঠে চেপে। ফরমান আমাদের চিরকেলে ভগ্নদূত। রোজই প্রায় কাছারিতে আসে সে। আজও চলেছে কাছারিতে। কদিন সে আসেনি বটে। না, রোজই এসেছে ফরমান। দেবার মত খবরও নিয়ে এসেছে সে প্রতিবারেই। কিন্তু কালী সর্দার ওকে দেখা করতে দেয়নি আমার সঙ্গে। কালীকে ফরমান মান্য করে রীতিমত। তবে সে ভয়ে নয়,

ভক্তিতে। 'কলিযুগে কালীর মত সর্দার পাওয়া পুণ্যির কথা দাদাবাবু'—ফরমান একদিন বলেছিল আমাকে।

ফরমানের সেই একই খবর—মানুষ মেরেছে বাঘিনী। তবে এবার দূরের কোন গাঁয়ে নয়—একেবারেই কাছারির নাকের ডগায়। কাছারিতে আসবার পথে এক্ষুণি খবর পেলে সে।

কাছারিতে ফিরে গেলে পাছে ময়না বা কালীর খপ্পরে পড়ি এই ভেবে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি ফরমানের সাথে।

গেঁয়োতলীর খাল থেকে মাইলটাক দূরে সেই গাঁ খানি। গাঁ বলা চলে না অবিশ্যি, সাত আট ঘর গরীব চাষী প্রজার কুঁড়ে নিয়ে ছোট্ট একটি লোকালয় মাত্র। বাঘিনীর ভয়ে সবাই পালিয়েছে। পালায়নি শুধু সাদিখ সেখ। সাদিখ এক সময়ে কাছারির লাঠিয়াল ছিল। কি যেন একটা কাজের জন্যে কাছারি তাকে পুরস্কারও দিয়েছিল একবার। জোয়ান মানুষ—গায়ের জোরের বড়াইও তার কম নয়। তাছাড়া 'লাঠি যার মাটি তার' কথাটাকে সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো।

সাদিখের বাড়িতে আর কেউ নেই। তার বিবি বারান্দায় হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে আর এক বুড়ি ঝি বারন্দার এক কোণে বসে একথালা পান্তা ভাত সাবাড় করতে ব্যস্ত। ফরমানের হাঁক ডাকে সে উত্তর দিল বটে, কিন্তু থালা ফেলে সে এক্ষুণি নড়বে বলে মনে হলো না।

অগত্যা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। সাদিখের বিবি আমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। অবিশ্যি সে খুশির কারণটা কিছু ভিন্ন রকমের।

বিবির মুখে শুনলুম সাদিখকে বাঘিনী টেনে নিয়ে গেছে কিনা তা সে চোখে দেখেনি। তবে ঐ অদূরের ভেড়ির বাঁধের উপর থেকে বাঘিনীকে কেওড়ার জঙ্গলের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে দেখেছে সে।

সাদিখের বাড়ি থেকে ভেড়ির বাঁধের দূরত্ব হবে দুশ হাতের মত।

পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে মনে হলো ভেড়ির বিশ হাত দূরেই বাঘিনী সাদিখকে ধরেছে। সাদিখের হাতে তখন লাঠি ছিল। ভেড়ির বাঁধের উপরে টেনে তুলবার সময়ে লাঠিখানার উপর তার হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায়।

বাঁধের উপরে উঠে দাঁড়ালুম। আমার অনুমান সত্যি। বাঘিনী শিকার মুখে নিয়ে কেওড়ার জঙ্গলে ঢুকেছে এইখান থেকেই। ওর পায়ের ছাপগুলো একেবারে টাটকা—শিকারকে টেনে নিয়ে যাবার দাগও জ্বলজ্যান্ত বর্তমান।

জানি যে এই কেওড়ার জঙ্গল নিরেট। তা ছাড়া হয়তো সে কাছাকাছি কোথাও আহারে ব্যস্ত, কিংবা হয়তো তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে সে চলে গেছে তার দূরের কোন ডেরায়। কি জানি কেন, মনে তবু আমার ভারী আনন্দ।

ভেড়ির নিচে কেওড়ার জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়লুম। অগুণতি কেওড়া গাছই কেবল এখানে ঠাসাঠাসি করে আছে এমন নয়। অজস্র লতার বেষ্টনী আর আগাছায় সূর্যের আলোও কোনদিন মাথা গলিয়ে নামতে পারেনি মাটিতে। ওর মাটি তাই আদিকাল থেকেই অসূর্যম্পশ্যা, ভিজে আর স্যাঁতসেঁতে।

ভেড়ির উপর দাঁড়িয়ে মাথা কুটে মরে ফরমান। বড় ভালবাসে সে আমাকে। এই ভয়ানক কেওড়ার জঙ্গলে বাঘিনীর সন্ধানে সে আমাকে একা ছেড়ে দিতে নারাজ। গাছে যখন বানর নেই তখন হয় এখানে বাসা বেঁধেছে বিষধর সাপ, আর নয় গাছের তলে আছে বাঘের আনাগোনা। তবে বাঘ বা সাপের ভয়ে ফরমান আমার সঙ্গ নিতে নারাজ এমন কথা ওর শত্রুরাও কোনদিন বলবেনা। রক্ত নিতেও যেমন সে সিদ্ধ হস্ত রক্ত দিতেও তেমনি পরোয়া করেনি সে কোনোদিন। একদিন এই ফরমান খাঁ ছিল ডাকসাইটে সর্দার।

দশহাতি একটা কুমিরের সাথে দ্বৈরথ সমরে বিজয়ী হয়ে আজও বেঁচে আছে সে। তবে এই যুদ্ধ জয়ের মূল্য হিসেবে তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে একখানি পা। সেই থেকেই সে একপাওয়ালা। একখানা পা নিয়ে তো কেওড়ার জঙ্গলের একহাঁটু কাদায় নেমে চলা যায়না, তাই ওর বড় আফশোষ আজ।

ফরমানকে ভেড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে মানা করলুম। ফরমান চটে ওঠে আমার আদেশ শুনে, 'আল্লা, এও শুনতি হল কানে।' ফরমান সাফ জবাব দিলে আমাকে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসবো ফরমান ততক্ষণ নড়বেনা ওখান থেকে—'যমের বাবার সাধ্যি হবে না আমারে এক পা নাড়াতি, বড় শ্যালেরে তো থুই।'

শিকারের নেশায় শিকারী যখন মেতে ওঠে তখন সে নাকি মাতাল। কি জানি কথাটা হয়তো সত্যি। তবে মাতালের মত শিকারীর পা টলেনা, বরং তার দেহটা হয়ে ওঠে ইস্পাত কঠিন। শরীরে ভর করে আর এক শক্তি- -সে শক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের চাইতেও শক্তিমান। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, শিকার থেকে ফিরে আসলে কেউ যেন আমার কাছে ঘেঁষতে চাইতোনা। যাদেরকে আমি প্রিয় বলে জানি, তারাও সেলাম ঠুকে সরে যেতো আমার সামনে থেকে। ওরা কানাঘুষো করতো, এ সময়ে আমার চেহারাটা নাকি বদলে যায়—মানুষ আমি নাকি দানব হয়ে উঠি। ওদের বিশ্বাস দানো আমাকে ছুঁয়ে দেয় বলেই নাকি আমি অমন বদলে যাই। ঘুমের মধ্যে দানোটা আমার দেহ ছেড়ে পালিয়ে যায় আবার

ওদের কথা শুনে মনে মনে হাসতুম। তবে খুনের নেশায় পাগল মানুষের কাছে স্বয়ং যমরাজও বুঝি ঘেঁষতে ভয় পান। তেমনি এক নেশায় মাতাল হয়ে চলেছি আমি। ফরমানের অনুনয়-বিনয় আমার কানের ভেতর দিয়ে মরমে ঢুকবে কোন পথে!

বাঘিনীর পায়ের চিহ্ন ধরে জঙ্গলে ঢুকেছি। তারপর চলেছি

তো চলেছি—কখনও গুঁড়ি মেরে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো বা বুকে হেঁটে। ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত থমকে দাঁড়াই। এই নীরব জঙ্গলে রোদের আলো নেই, বাতাসও বুঝি ঢুকতে ভয় পায়।

দমবন্ধ হয়ে আসছে যেন। একটু বিশ্রাম নিতে হলো তাই। উঃ। কি ভয়াল নিস্তব্ধতা—যেন এক মৃত্যুপুরী তার শিং দরজাগুলো সব এঁটে বন্ধ করে দিয়েছে। কোথাও একটা গিরগিটির ডাক নেই, কাঠবিড়ালীরা সব সর শব্দ করে গাছের গুঁড়ির উপরে ছুটো-ছুটি করছে না, একটা কোলা ব্যাঙের থপথপ চলা পর্যন্ত নেই। ভাবলুম, এমনি কতদিনই না কত কৃচ্ছ্র সাধন করেছি। কোন লাভই তো কপালে ঘটেনি এতদিন। এই জঙ্গলের বিস্তৃতি তো তেমন কিছু নয়। সুমুখে এগিয়ে যেতে যেতে কোথাও একটু ফাঁক দেখলেই সেই ছিদ্র পথে বনের বাইরে যেতে হবে।

ঠিক সেই ভেবেই এগিয়ে চলা শুরু করেছি, কাটা গাছের গায়ে ঝুলছে দেখি রক্তমাখা একখণ্ড কাপড়। পরীক্ষা করে দেখি টাটকা রক্ত। মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে প্রবল উত্তেজনায়। খুব হুসিয়ার হয়ে এগিয়ে চলেছি এবার। চোখের সুমুখে কতকগুলো আগাছার বাঁকানো মাথা সোজা হয়ে দাঁড়াল। থমকে দাঁড়াতে হলো আমাকেও। একটু আগেই বাঘিনী এখানে আস্তানা নিয়েছিল। আমার সাড়া পেয়েই সে সরে গেছে। সম্ভবতঃ বেশি দূরে সে যায়নি, কাছাকাছি কোথাও আছে গা ঢাকা দিয়ে।

বাঁ চোখটা বড্ড লাফাচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে। মেয়েলী সংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই কোনকালেও। তবু যেন মনের মধ্যে এসে বাসা বাঁধলো কেমন একটা অস্বস্তি। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে যেয়ে চোখে পড়লো মানুষের মাথা থেকে কাঁধের অংশটুকু। আগাছার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে দেহের বাকী অংশ। নিশ্চিত বুঝলুম যে সাদিখের মাংসপেশীযুক্ত দেহে বাঘিনী তার প্রাতরাশ সমাধা করছিল এতক্ষণ।

হামাগুড়ি দিয়ে আগাছার ঝোপটাকে ঘুরে এসে দেখি পিঠ থেকে পেট কেন, কোমর পর্যন্ত সাবাড়। এক ঝলক বাতাসে বাঘিনীর গায়ের গন্ধ ভেসে এল নাকে। আনন্দে মনটাও আবার নেচে উঠলো মেঘের ডাকে পেখম মেলে ধরা ময়ূরের মত। বাঘিনীকে বধ করবার দুর্লভ গৌরব শুধু আমার একার, কেউ নেই আজ ভাগীদার। মনের ভেতরে কি যেন এক আনন্দের ঢেউ—বাঁ চোখটা বাব কয়েক লাফিয়ে ওঠে তবু। নিজের মনেই হেসে ফেলি।

এখানে আত্মগোপন করে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকলে বাঘিনী আবার আসবে তার অর্ধভুক্ত আহারের কাছে। সাদিখের পাশেই আমি তার সমাধি রচনা করতে পারি সহজে।

না—অতখানি দেরী করে থাকা আমার সইল না। এগিয়ে চললুম শক্ত মুঠিতে হাতিয়ার ধরে।

কয়েক পা মাত্র—মাথার উপরে গাছের ডালে একটা বড় রকমের দোলা লাগলো। তাকিয়ে দেখি একটা মস্ত বড় ময়াল সাপ। এক গাছ থেকে আর এক গাছে এগিয়ে চলেছে, সম্ভবতঃ আহার অন্বেষণে। আমাকে লক্ষ্য করতে পারেনি—আপন মনেই চলেছে সে। আমিও এগিয়ে যাবার চেষ্টায় পা বাড়িয়েছি মাত্র, মুখেব উপরে কে যেন ছুঁড়ে মারলে বাতাসের একটা উষ্ণ ফুৎকার।

কে আবার!

আমার এই গাছের আড়ালেই আছে বাঘিনী। ঠাসাঠাসি করে এমনিভাবে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে যে গাছের আড়ালে কিছুই চোখে পড়েনা। বুকে হেঁটে বহুকষ্টে ওপাশে যাবার জন্যে চেষ্টা করলুম—গেলুমও।

বাঘিনী এইমাত্র এখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিকই। পায়ের থাবাব দাগ রয়েছে নরম মাটিতে। বাঘিনীর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে যেয়ে দেখি, চক্রাকারে সে ঘুরে গেছে আমার বাঁ দিকে অর্থাৎ এই মাত্র এই গাছের সারির ও পিঠে যেখানে আমি বাঘিনীর নিশ্বাসের

ফুৎকার শুনেছি ঠিক সেই দিকে। সতর্ক দৃষ্টি মেলে ধরতেই দেখি ঘন লতাগুল্মের আড়াল থেকে বাঘিনী আমার দিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই বাঘিনী ওর মুখটাকে টেনে নিল, এক পলকের একটু বিদ্যুৎ চমকের মত দেখা।

তাড়াতাড়ি আগাছার জঙ্গলটাকে বেড় দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলুম, আমার বুকের ভেতর থেকে কে যেন তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'পেছন সামলাও'। চকিতে পেছনে চোখ ফেরাতেই দেখি, আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি গাছের ফাঁকে জ্বলজ্বল করছে দুটি আগুনের গোলা। বন্দুক উঁচিয়ে ধরবার আগেই অদৃশ্য হলো সেই দুটি অগ্নি গোলক।

বাঘিনী আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে পাকা খেলোয়াড় বটে সে। এমনি করেই সে একদিন একজন আনাড়ী শিকারীকে হত্যা করেছে। আর একজন শিকারীও এমনি ভয় পেয়েছিল যে সে ওকে বাঘিনী বলে বিশ্বাস করতেই চায়নি আর। মনে আছে লোকটা কাছারিতে এসেও ঠকঠক করে কাঁপছিল ভয়ে। আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, 'হু জুর ওডা জানোয়ার নয়, ঘাড় মটকানো দানো। ইচ্ছে করলি ওডা কুমির হতিও পারে।'

দেখা যাক আজ বাঘিনীর বিদ্যেটা। বা চোখটা তবুও লাফিয়ে মরছে সেই থেকে।

আমার শুধুই মনে হচ্ছিল যে বাঘিনী আমার পিছন থেকে অতর্কিতে এসে আক্রমণের ফন্দী আঁটছে। পেছনে চোখ রাখার মত তো তৃতীয় চক্ষু নেই। তাই গাছের সারির মধ্যে এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগলুম যাতে পেছন থেকে বাঘিনী আমাকে কামড় বসাবার কোন সুযোগ না পায়।

ঘন সন্নিবিষ্ট বা ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ আর তাদের গিঁটপাকানো কাঁটা লতার বেষ্টনীর জন্যেই আমার পক্ষে গুলি চালানোর অনেক অসুবিধে আছে বটে, তেমনি বাঘিনীর পক্ষেও

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বার সুবিধে নেই বললেও চলে। বাঘিনীর যেমন, আমার পক্ষেও তো তেমনি গা ঢাকা দেবার সুবিধে রয়েছে। ফলে এই লুকোচুরি খেলাতে ভয় পাইনি আমি, ববং মনে হলো মন্দ মজা নয় তো।

বাঘিনী আমার পেছন থেকে আসতে চায়। কিন্তু আমি ওকে পেতে চাই আমার ডাইনে অথবা বামে। ওর মাথা, ঘাড় বা নিদেন পক্ষে ওর ঐ বিশাল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে ওকে মরণঝাঁপ দেবাব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাই আমি।

ফলে এই লুকোচুরি খেলা যেন আব শেষ হতে চায় না। হামাগুড়ি দিয়ে বা বুকে হেঁটে না চলে আমি যতদূর সম্ভব বসে বসে হাঁটছি এখন।

দুপুর হবে তখন। মনে হলো এই লুকোচুরি খেলা বুঝি শেষ হবার নয়। বরং বাঘিনীকে উত্তেজিত করে যদি কোন সুফল পাই সেই চেষ্টায় সাদিখের সেই আধখানা দেহটাকে টেনে আনবার জন্য নিজে সুরক্ষিত বেষ্টনী ছেড়ে আমি এগিয়ে চললুম লক্ষ্যস্থলে।

বাঁ চোখটা লাফিয়ে উঠল আবার। মনটা হঠাৎ আবার ভরে উঠলো কি এক অজানা অস্বস্তিতে। থমকে দাঁড়ালুম। তারপর যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লুম এক সারি গাছের বেষ্টনীতে। আমার ঠিক পেছনেই একটা অস্ফুট গোঙরানির শব্দ শুনে উঁকি দিয়ে দেখি আবার একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। এক পলক মাত্র—অদৃশ্য হলো সেই চোখজোড়া।

আরো ক'টি মুহূর্ত। আমার ডাইনে, আমার বামে, আমার সুমুখে আমার পিছনে সেই চোখজোড়া—জ্বলে উঠছে আবার নিভে যাচ্ছে।

ভাবলুম, ভয় পেয়েছি আমি। নইলে সত্যিই কি এমনটি সম্ভব! সম্ভব নয়। তবু তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—ঐতো আমার ডাইনে, ঐতো আমার বামে, ঐতো আমার সুমুখে, আমার পেছনে, আমার

চারিপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে মরছে সেই জ্বলন্ত চোখজোড়া। কতটুকুই বা দূর হবে—বড় জোর দশ হাত। আর সেই সাথে মনের ভেতর থেকে কে একজন যেন অশ্রান্ত চেঁচিয়ে মরছে—'সুমুখে, পেছনে, ডাইনে, বায়ে—হুঁসিয়ার।'

পা দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছে, হাতের মুঠি আলগা হয়ে আসছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে গায়ে—যেন একটা ঘামের স্রোত বয়ে চলেছে আমার গায়ের উপর দিয়ে, নাকের নিশ্বাসের শব্দ আমার নিজের কানেই বেখাপ্পা মনে হচ্ছে।

অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে এমনটি হয়ে পড়া আমার সাজে না—এর অর্থ মৃত্যু।

চোখ দুটো রগড়ে নিলুম বা হাতে। চেয়ে দেখি আবার সেই হিংস্র, দীপ্তিমন্ত দুটি চোখ। যেদিকে তাকাই গাছের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সেই চোখজোড়া।

এইভাবে আর কয়েক মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারা সম্ভব হবেনা। যা থাকে কপালে- ঐ চোখ লক্ষ্য করে ট্রিগার টানলুম। ছুটলো আমার গুলি—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল গম্ভীর অথচ ক্রুদ্ধ গোঙরানি। একপলকের জন্যে দেখতে পেলুম ওর ডোরাকাটা বিশাল দেহটা। এতক্ষণে বুঝলুম মানুষের মত পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে ছিল সে। সুমুখের দুই থাবা গাছের উপর রেখে উঁকি দিয়ে সে আমাকে দেখছিল।

বাঘিনীর চোখে গুলি লাগেনি তা বুঝতে পারি সতর্ক বাঘিনী আমার গুলি ছুটবার ঠিক আগের মুহূর্তেই মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

একবার দুবার, তিনবার- বাঘিনীর গোঙরানির শব্দ অস্ফুট হতে থাকে—তারপরে মিলিয়ে যায়। বাঘিনী তার আহার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে দূরে।

একটু আগে যে মন কুঁকড়ে এসেছিল ভয়ে হঠাৎ সে দুর্জয় সাহস

সঞ্চয় করে বসল কোত্থেকে। বাঘিনীর পেছু ধাওয়া করাই স্থির করলুম।

কিছুটা পথ এগিয়ে আসতেই কিন্তু মনে হলো ভুল করেছি আমি। আপন মনে লুকোচুরি খেলছিল এক জোড়া কাঠবিড়াল। আমাকে অমন চোরের মত চলতে দেখে ওরা রীতিমত রেগে উঠল ঠিকই, তবে এই অনধিকার প্রবেশের দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করবে ওরা কার কাছে।

আবার মনে হলো মিথ্যেই এগিয়ে চলেছি আমি। নইলে কাঠবিড়াল দম্পতি অমন করে মাটির উপরে ছুটোছুটি করে বেড়াত না। আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে ওরা তখনও খেলছে ; মুখের উপর মুখ রেখে কি যেন বলাবলি করছে ওরা। আমার মনে হলো ওরা আমাকে বোকা ভাবছে।

পা টিপে টিপে যেয়ে খপ করে ধরে ফেললুম ওদের একটিকে। ভয় পেয়ে তর তর করে গাছে উঠে পড়লো জোড়ার অপরটি। কিন্তু তক্ষুনি আবার নেমে এলো গাছ থেকে। গাছের নিচে নেমে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বন্দীকে ছেড়ে দিতেই একছুটে যেয়ে সঙ্গীর কাছে হাজির হলো সে। দুজনাতে কিছু বলাবলি করলে। তারপরে এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে এলো কিছুটা।

মনে মনে হাসি পেল। বেশ খেলা তো। কিন্তু কোনদিকেই বা যাব। এগিয়ে চলার তাগিদ নেই কোন! ভাবছিলুম, সাদিখের সেই অর্ধভুক্ত দেহের কাছেই ফিরে যাই আবার। ওৎ পেতে থাকবো ওখানেই। বাঘিনী যেখানেই থাক না কেন আহারের লোভে আবার সে আসতেও পারে সন্ধ্যে নাগাদ।

সুমুখের নীরব জঙ্গল হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে—খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্-খ্যাক্। কলকণ্ঠে কোলাহল করছে একপাল বানর-বানরী। গাছের ডালে দোলা লাগছে—ওরা এগিয়ে আসছে আমারই ফেলে আসা

পথের নিশানা ধরে। আমার মাথার উপর দিয়ে ডালে ডালে চলে ওরা আমাকে অতিক্রম করে গেল।

এতক্ষণে নিশ্চিত হতে পারলুম—তাড়াতাড়ি ফিরে চললুম আবার।

কোথায় সেই অর্ধভুক্ত দেহ সাদিকের? কোন চিহ্নই নেই তার। বাঘিনী যে এই সুযোগে তার আহার মুখে তুলে নিয়ে সরে পড়েছে তারই চিহ্ন রয়েছে শুধু আশপাশের নরম মাটিতে।

বানরকুল তাইতো ওদিক থেকে ফিরে এসেছে এদিকে

এতক্ষণে মনে পড়লো ফরমান হয়তো আমার অপেক্ষায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সর্বনাশ! বাঘিনী যদি ফরমানকে আক্রমণ করে বসে।

তাড়াতাড়ি তাই জঙ্গল ছেড়ে ভেড়ির বাঁধের দিকে হেঁটে চলি হাতে পায়ে অনেকখানি দূর থেকে তখন কানে আসছে ফরমানের হাঁক।

ভেড়ির বাঁধে উঠে দেখি ওরা এগিয়ে আসছে—ফরমানের সাথে কালী আর অভিমন্যু। সূর্য তখন হেলে পড়েছে দূর বনের আড়ালে।

॥ দশ ॥

সকালের স্বচ্ছ আলো নেমেছে ঘরের দাওয়ায়। বন্দুক সাফ করছিলুম একমনে আর ভাবছিলুম যদি ভগ্নদূত এসে হাজির হয় এক্ষুণি।

মুখ তুলে তারপর এক সময়ে দেখি ভগ্নদূতই বটে. তবে ঘোঁড়া ফরমান নয় এবারে। বাড়ি থেকে এসেছেন সদর কাছারির খাজাঞ্চি মশায়, পেছনে আবার পাঁচ-হাতি লাঠি ঘাড়ে করে পাহারায় এসেছে আকবর আলি। সদরের লাঠিয়ালদের সর্দার সে, আমার জন্মের আগে থেকেই সে বহাল হয়ে আছে সদরে।

ব্যাপার কি! খাজাঞ্চি মশায় তো সদরের সেই কাঠের বাকসোটাকে কোল থেকে নামাবার ফুরসৎ পাননি গত বিশ বছরের মধ্যে। নইলে আকবর আলির আগমন অবিশ্যি এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। তবে কি কাঠের বাকসো আগলে বসে থাকবার মত টাকার অভাব হয়েছে আজ। তাই অনাদায়ের দায় সামলাতে স্বয়ং খাজাঞ্চি মশায়ও ছুটে এসেছেন এই দূর আবাদে! কিন্তু আদায় দেবে কে!

খাঁ খাঁ করছে আজ দশ ক্রোশ দূর পর্যন্ত। বাঘিনীর ভয়ে জমিদারি আজ জনশূন্য হবার যোগাড়। যারা আজও টিঁকে আছে তারা তো সদরে যেয়ে সাধ্যমত আদায় দিয়ে এসেছে।

সাত পাঁচ মনে আসতে থাকে। খাজাঞ্চি মশায়কে জেঠামশায় বলে ডাকি আর রীতিমত মান্য করিও বটে। বেহিসেবী না হলেও বাবাকে লুকিয়ে দশ বিশ টাকার দরকার তো হয়ই। মার কাছে তখন ধর্না দিই হুকুমের জন্যে। টাকা অবিশ্যি খাজাঞ্চি মশায়ের সেই কাঠের বাকসো থেকেই আসবে জানি। তাই খাজাঞ্চি মশায়কেও খাতির করি কম নয়।

ত্রৈ হেন খাজাঞ্চি মশায় খাজাঞ্চি খানা ছেড়ে হঠাৎ কেন আবাদের কাছারিতে!

বৌঠাকুরাণীর হুকুমে এক্ষণি বাড়ি যেতে হবে আমাকে—খাজাঞ্চি মশায় তাঁর শুভ আগমনের কারণ ব্যক্ত করেন।

মার হুকুম, অন্যথা করবে কোন ছেলে। তবে কদিন পরে গেলে হয়না।

আকবর আলি জিভ কেটে বলে, 'তোবা-তোবা'। মা জননীর হুকুম মাথায় নিয়ে এসেছে সে। মাথা আর ধড় একসঙ্গে থাকতে হুকুম তামিল হবেনা—সেও কি হয়।

আকবরের কথার অর্থ খুবই সোজা। আমি সহজে যেতে না চাইলে সেও সহজে ছাড়বেনা।

তাছাড়া খাজাঞ্চি মশায়ও দীর্ঘকাল ধরে খাজাঞ্চি খানার কাজে নাম কিনেছেন। বৌঠাকুরাণীর হুকুমে তিনি তাঁর গচ্ছিত সম্পদ সিন্দুক খুলে বার করে বরাবরই বৌঠাকুরাণীর হাতে সমর্পণ করে এসেছেন। আজ তাই বৌঠাকুরাণীর সব চাইতে মূল্যবান সম্পদটিকে হুকুম মাত্র তাঁর হাতে তুলে দিতে না পারলে তাঁরও বুঝি মাথা কাটা যাবে লজ্জায়।

নিরুপায় হয়ে কপোতাক্ষে সব বলে কয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে চললুম মায়ের হুকুমে।

বোটে বসে ভাবছিলুম, হুকুম তো চিরকাল বাবার কাছ থেকেই আসে। তবে মা আজ এমন হঠাৎ তাগিদ পাঠালেন কেন? কি এমন জরুরী তাগিদ?

বাড়িতে ফিরে দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড। চারিদিকে দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ব্যাপার। বাড়িময় উৎসবের ধুম লেগেছে যেন।

এ বাড়িতে উৎসবের অন্ত নেই তা জানি। তবে এই উৎসবের দিনে বাড়ির মানুষকে এমন বিমনা দেখিনি তো কখনও! বিশেষ করে বাবাকে দেখলুম যেন বড় গম্ভীর।

অন্দরে মার কাছে এসে প্রণাম করে বললুম, আজ আমার কি ব্রত উৎসব যে আমাকে না হলে তোমার ব্রত পালন করা হতোনা।

অকারণ ধমক দিয়ে উঠে কাজের অছিলায় মা সরে গেলেন।

পাকড়াও করলুম মার বুড়ি ঝিকে। ভারি ভালবাসে আমাকে সে—বুড়ি মা বলে ডাকতুম তাই ওকে।

'ব্যাপার কি বুড়িমা?'

'ব্যাপার খুব গুরুতর'—বুড়ির পেটের কথাগুলো ফিসফিস্ শব্দে কিলবিল করে বেরিয়ে এলো একে একে।

যশোরেশ্বরীর মন্দিরের কাছাকাছি এক পোড়ো মন্দিরে মাস কয়েক আগে থেকে আস্তানা নিয়ে আছেন এক তান্ত্রিক সাধু। তিনি ধুলি মুঠি ধরেন, আর মুঠো খুলে উপস্থিত সবাইকে সন্দেশ প্রসাদ দেন। কোন এক দুরারোগ্য রোগীকে মন্ত্রবলে রোগমুক্ত করেছেন তিনি। রাস্তা থেকে ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে এক নির্ধনের কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিয়েছিলেন, বাড়ীতে এসে কোঁচার খুঁট খুলতেই ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়লো রূপোর টাকা।

এমনি কত অলৌকিক কাণ্ড শুনে মা তাকে আমার কোষ্ঠী পত্র পাঠিয়েছিলেন ভাগ্যফল বিচারের জন্যে। সাধু মহারাজ কোষ্ঠীপত্র দেখতে নারাজ হয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে মাস দুয়েকের মধ্যে বাঘের হাতে আমার অপঘাত মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা এত প্রবল যে কোষ্ঠী দেখে লাভ নেই এখন।

পুত্রের কল্যাণে তাই এদিকে শুরু হয়েছে মহাযজ্ঞ, অপর দিকে বাঘিনীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে লোহার বাসরকে নিশ্ছিদ্র করতে চাইছেন মা।

এত কাণ্ড করেও শান্ত হতে চায়না মায়ের মন। এদিকে ওদিকে ঘুরে এসে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরে এলেন মা।

'কি কুক্ষণে জন্মেছিলি বাবা, জ্বলে পুড়ে মরছি আমি তোকে

নিয়ে বাঘের সঙ্গে খেলা চলে নাকি। বাড়ি থেকে এক পা বেরুবিনা কোথাও—বুঝলি!'

'লোহার খাঁচা একটা বানিয়ে রাখনি কেন! গারদের মধ্যে পুরে রাখলেও কিন্তু নিয়তির হাত থেকে নিস্তার নেই। লখীন্দর রেহাই পায়নি, রাজা পরীক্ষিৎও বাদ পড়েননি। তোমার ছেলেও বাদ পড়বেনা।' রুঢ় কণ্ঠের উত্তর এলো আমার পেছন থেকে।

চমকে উঠে আমার মাথার উপর হাত রাখলেন মা, যেন তাঁর আশীর্বাদের জোরে অপসারিত করতে চান আমার সকল অকল্যাণ।

'নিজের ছেলের সর্বনাশ ডেকে আনছো তুমি'—কান্নার আবেগে ফেটে পড়লেন মা।

হতচকিত হয়ে গেলুম আমি। আমাকে উপলক্ষ করে পিতা-মাতার এই দ্বন্দ্ব বড় অপ্রত্যাশিত।

মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়ালুম। কাছারিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন বাবা। হাঁ, এই রাত্রেই যাত্রা করবেন তিনি।

আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন শুধু, আমি বাঘিনীকে ভয় করি কিনা।

'ভয় পাইনা আমি, কিন্তু মায়ের চোখের জলকে উপেক্ষা করে—'

'যিনি তোমাকে আল্লার আদেশ পালন করতে বলেছিলেন, তোমার দুর্ঘটনার সংবাদটুকু শুনে যিনি নদীতে ঝাঁপ দিলে তিনি কি তোমার গর্ভধারিণী মায়ের চাইতে কিছু কম? তাকে এই মাতৃত্বের অধিকার অঙ্গীকার করেছিলুম। মিথ্যে-মিথ্যে তাকে মিথ্যে করে দিলে তোমরা'—দ্রুতপায়ে বন্দুকটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে সিঁড়িতে পা দিলেন বাবা।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো গোটা আমিটাই যেন এক মস্ত মিথ্যে হয়ে গেছি। সারা আবাদী মহলের মানুষ যেন শত কণ্ঠে ধিক্কার দিচ্ছে আমাকে।

ছুটে যাচ্ছিলুম মার কাছে। যেমন করে হোক, তাঁর সম্মতি আদায় করতে হবে এক্ষুণি।

পিছনে মুখ ঘোরাতেই দেখি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মা। চোখে তাঁর জল নেই, নিষ্প্রাণ পাথরের প্রতিমা যেন।

বলতে যাচ্ছিলুম, 'রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে—

বাধা দিয়ে মা বললেন, 'তুমিও পিতৃসত্য পালন কর। আমি আশীর্বাদ করছি।'

সদর আঙিনা থেকে আকবর আলির গলা শোনা গেল, 'সব তৈরী, হুজুর'।

'খোকাবাবুও তৈরী আকবর', বারন্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে সাড়া দিলেন মা।

বাবা বোধ করি বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। এগিয়ে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলেন তাই, 'এর মানে?'

'তোমার আশীর্বাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তোমার ছেলে।'

মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বাবা ওঁর বন্দুকটি তুলে দিলেন আমার হাতে।

ভাটার টান—তায় আবার পালে লেগেছে হাওয়া। আমার বোট চলেছে ঢেউ ভেঙে। মনটাও উড়ে চলেছে অমনি অনেক ঢেউ ভেঙে।

জীবনের অনেক কাহিনীই তো হারিয়ে যায়, কত যে হারিয়ে গেছে কে তার নিশানা করবে! কত না নাটকীয় চমক এসেছে, আবার মিলিয়ে গেছে তা অনন্ত আঁধারের আড়ালে।

শিকারীর জীবনে আসে দুঃসহ কত ঘটনা, দুর্দম আবেগ— আলো আঁধারের কত লুকোচুরি ঘটে চর্মচক্ষুর অলক্ষ্যে।

ঘটনার পরিমাপ করেন যাঁরা তাঁরা শুধু বহিরঙ্গকেই বড় করে দেখেন। এই বহিরঙ্গের আড়ালে অদেখা যে ঘটনাবলী শিকারীর ভাগ্যনিয়ন্তা তাকে কোনো শিকারীই সাহিত্যে স্থান দেননি জানি,

তবু বুঝবো, সত্য পালন যদি করতেই হয় তবে বীর হনুমানের মতই বুকটাকে দু হাতে চিরে ভেতরটাকেই দেখতে দেওয়া ভাল।

বোটের কামরায় শুয়ে অনেক কথাই ভাবছিলুম সেই রাতে। যখন ধড়মড় করে জেগে উঠলুম তখন দেখি আমার শিয়রে বসে অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে না কেউ।

বুঝলুম, ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখছিলুম আমি। তবু মনের মধ্যে তখনও বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রাবেয়ার মার কণ্ঠস্বর—'আল্লার আদেশে তুমি অপরাজেয়, মায়ের আশীর্বাদে তুমি দুর্বার, সত্য পালনের পুণ্যে তুমি আজ বাঘিনীর বিভীষিকা।'

এগারো

কাছারির ঘাটে পা দিতেই দেখি রূপো বরকন্দাজ দাঁড়িয়ে আছে তার পাঁচ-হাতি লাঠিখানাকে ঘাড়ে করে।

'ময়না কোথায় ?'

মুখ খুলতে চায়না রূপো। মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই ওর। তাই বাড়ি থেকে এত তাড়াতাড়ি আর ঠিক এই সময়টাতে আমি ফিরে এসেছি বলে বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে।

মনে মনে বুঝলুম, কোথাও একটা কিছু ঘটেছে। নইলে ময়নাব খবর বলতে এমন নাচার হলো কেন রূপো।

অনেক সাধ্য সাধনার পরে এইটুকুই শুধু বোঝা গেল যে বাঘিনীর সন্ধানেই বেরিয়েছে ময়না। ঘণ্টাখানেক আগে কাছারির ছোট ডিঙ্গিখানায় চেপে নৈমদ্দীকে নিয়ে ময়না যাত্রা করেছে।

রূপোকে আমি ভালমতই চিনি। তাই আমিও জিদ ধরলুম, রূপোর মুখে খবর না শোনা পর্যন্ত কাছারিতে উঠবোনা আমি। বোটেই বসে থাকবো আর উপোস করে দিন কাটাবো, রীতিমত অনশন ধর্মঘট।

যা ভেবেছি—রূপোর কাছ থেকে কথা আদায় করতে অনশনের হুমকির মত এমন অব্যর্থ অস্ত্র আর কি আছে। পাশুপাত প্রয়োগ করে ওকে হত্যা করা যায়, তবে কথা আদায় করা যায়না। কিন্তু আমার উপোস সে সইতে পারেনা।

'বাহাত্তুরে বুড়ি মরেছে তার জন্যি শোক লাগলো এত তোমার! বারো বছরের ছুঁড়িটার জন্যি মরম পুড়তি পারে, কিন্তু তার জন্যি দবিব ব্যাটাই উপোসী থাকবেনা। তোমার কিসির গরজ এতো!' —রাগ করেই রূপো বলে ফেললে শেষ পর্যন্ত।

মুন্সিগঞ্জের কাছারির প্রজা এই দবির সেখ। ভোরের একটু আগেই মারা পড়েছে একসঙ্গে দবিরের বুড়ি মা আর ওর মেয়ে।

খবরের মত খবর একটা। অতএব নৌকা ছেড়ে ঘোড়ার পিঠেই ছুটতে হলে তক্ষুনি।

দবির সেখের মত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষও হাউমাউ করে কাঁদছে। মেয়েটাকে দবির বড় ভালবাসতো—মাকেও।

ময়না আসছে ডিঙ্গি নৌকায়। কখন যে সে হাজির হবে তারও ঠিকানা নেই। অথচ এক মুহূর্ত সময়ও আর নষ্ট করা চলেনা। সময় এখন সোনার চাইতেও দামী।

মাটির পাঁচিল তুলে দবির সেখ সুরক্ষিত করেছে ওর বাড়ি। সুমুখে পেছনে পাঁচিলের গায়ে বসানো দুটি কাঠের দরজা। খিড়কির দরজার গায়ে দবিরের গোয়াল। নিত্যকারের অভ্যেসমত ওর বুড়ি মা তার না[illegible]কে সঙ্গে নিয়ে সাতসকালেই গরু বার করে, গোয়াল নিকোয়। আজও সে গরুগুলিকে বার করে আঙিনার নির্দিষ্ট খোঁটায় বেঁধে দিয়েছে সব কটিকেই।

কিন্তু তারপর?

যতদূর বোঝা গেল তাতে অনুমান করা যায় যে বাঘিনী ওৎ পেতে ছিল পাঁচিলের দরজার ওপাশে। দরজা খুলে দিয়ে পেছন ফিরতেই যা দেরী।

বুড়ি বা তার নাতনী কেউই একবার চেঁচিয়ে ডাকতে পারেনি। গরু-বাছুরও হম্বারবে ঘোষণা করেনি বাঘিনীর আবির্ভাব। নইলে বিছানা ছেড়ে দবিরও তো একছিলিম তামাক পুড়িয়েছে বারান্দায় বসে। গরু-বাছুর খোঁটায় বাধা হয়েছে নিত্যকারের মত। অথচ দোহনের বিলম্ব দেখেই দবির ডাকাডাকি করল ওর মাকে।

কারুরই সাড়া পেলনা দবির, না ওর মার না ওর মেয়ের।

পাঁচিলের দরজা খোলা—হয়তো ওরা বাইরে গেছে কোন কারণে! দবির এগিয়ে এলো।

পাঁচিলের দরজার কাছে জমাট রক্ত। রক্তের গোবর ছড়া ছিটিয়ে পাঁচিলের চৌকাঠ পেরিয়ে চলে গেছে বাঘিনী।

পাগলের মত ওর সেই খুনে রামদা হাতে নিয়ে ছুটে চললো দবির।

ওর মায়ের কাপড়, মেয়ের পরণের সেই আট হাতি পাছা পেড়ে শাড়ি—সবই পেলো দবির। পেলোনা শুধু মা ও মেয়ের কোন সন্ধান।

প্রায় আধ মাইল দূরের ঐ কেওড়া জঙ্গলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দবির। অনেক খুঁজেছে সে ঐ নদীর পারের কেওড়া জঙ্গলের গহন দুর্গমতার মধ্যে। কিন্তু কোন হদিশ মেলেনি।

রুকসাকে সঙ্গে এনেছি বটে, কিন্তু ক্যাবলা আসেনি। ক্যাবলা সঙ্গে থাকলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে যাহোক একটা নিশানা করতো। বানরীর পক্ষে সে তো সম্ভব নয়।

দবির সেখ যেখানে ওদের পরণের কাপড় দুটোকে পেয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে বাঘিনী কেওড়ার জঙ্গলেই টেনে নিয়ে গেছে তার শিকার দুটিকে।

দবিরের বাড়ির এলাকা ছেড়ে 'শর্ট কাট' করবার জন্যে বিলের উপর দিয়ে কোণাকুণি ভাবে চলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সে করেনি। বরং বাঁয়ে ঘুরে কিছুটা পথ এগিয়ে সে এসেছে একটা খালের ধারে। খালের পাড় বরাবর চলেছে সে তারপর, অবিশ্যি ঐ নদীর পারের জঙ্গলের দিকেই। খালের পাড় ধরে একশো হাত পথ অন্ততঃ সে এগিয়ে গেছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ঘাসের মাথাগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে আমার মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল।

খেই হারিয়ে গেছে তারপরে।

খালের ওপারে দেখা যাচ্ছে একফালি জঙ্গল—বেশ বড় সড় গোছের আর বেশ কুটিল চেহারা তার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে রইলুম ঐ দুটো জঙ্গলের দিকে।

স্বাভাবিকভাবে মনে হয় খালের পাড় বরাবর আরো এগিয়ে যেয়ে ভেড়ির বাঁধ টপকে বাঘিনী ঐ সুমুখের কেওড়ার জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

খাল পেরিয়ে অধিকতর দূরের পথ বেয়ে বাঁয়ের ঐ জঙ্গলখণ্ডে যাবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

যুক্তি হয়তো নেই। মন তবু সায় দেয় না। বার বার পরীক্ষা করে দেখলুম ঘাসের মাথাগুলোকে। কিন্তু বাঘিনী এই পথে তার শিকারকে টেনে নিয়ে গেছে বলে মোটেই মনে হলো না।

তা ছাড়া সুমুখের ঐ কেওড়ার জঙ্গলে বানরকুলকে দেখলুম, খেলায় মেতে আছে ওরা।

তবে কি খাল পেরিয়ে বাঁয়ের ঐ খণ্ড জঙ্গলেই আস্তানা নিয়েছে বাঘিনী! কিন্তু একসঙ্গে দু দুটো শিকার মুখে নিয়ে খাল পেরিয়ে যাওয়া তো সহজ কাজ নয়। মন বলছিল বাঘিনী একা নয়, কিন্তু আবার নোতুন সঙ্গী যদি সে পেয়েই থাকে তাহলে তার প্রমাণ পাওয়া তো উচিত ছিল।

নোতুন সঙ্গী নিতান্ত আনাড়ী হবে ঠিকই। তাই তার শিকার পদ্ধতি বা শিকারকে মুখে তুলে নিয়ে যাবার ধরন ধারণে কিছু না কিছু তফাৎ আছে। এতক্ষণ তো তারই সমর্থনে প্রমাণ খুঁজে মরেছি।

দবিরের মা ও মেয়ে দু তিন হাতের মধ্যেই ছিল। রক্তের দাগ থেকে একথা মনে করা যেতে পারে যে দুজনকে একই সঙ্গে আক্রমণ করেছে বাঘিনী আর তার সঙ্গী। কিন্তু ঠিক এক পথ বেয়েই ওরা শিকারকে টেনে নিয়ে গেছে এমন কথা যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

মন কিন্তু যুক্তি মানতে চায়না। অতএব আবার ফিরে গেলুম দবিরের বাড়িতে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে আরও ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হলো গোটা পথটাকে।

ঠিক একই রেখা বরাবর একই পথ বেয়ে শিকারকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে শিকারী। কিন্তু একটি মাত্র জায়গায় চারখানা পেছনের পায়ের দাগ—তুখানা পায়ের ছাপ আর তুখানার চাইতে চওড়ায় কিছু বেশি।

মনটা উল্লসিত হয়ে উঠলো প্রথমটাতে। কিন্তু দ্বিতীয় কোন নজীর না পেয়ে মনের আনন্দ মনেই মিলিয়ে গেল।

অভিমন্যুকে রেখে এসেছিলুম খালের ধারে। জঙ্গলের উপরেই নজর রাখতে বলেছিলুম ওকে।

ফিরে এসে শুনলুম যে একপাল বানর নাকি নদীর পারের কেওড়ার জঙ্গল থেকে ঐ খণ্ড জঙ্গলে গেছিল। হঠাৎ ঐ বানরকুল আবার খণ্ড জঙ্গল থেকে ফিরে গেছে কেওড়ার জঙ্গলে। ফিরে যাবার সময় ওদের তাড়াহুড়া ভাবটা দেখে অভিমন্যুর মনে সন্দেহ হয়েছে কিছুটা।

ভেলায় চড়ে খাল পেরিয়ে ঐ খণ্ড জঙ্গলেই যাব বলে ঠিক করলুম। খালের ওপারে পাশাপাশি তুটো জায়গা থেকে তুপ্রস্থ মাটি ধ্বসে পড়েছে।

সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠলো আবার। পাড়ের উপরে পায়ের ছাপ পড়েনি কিন্তু পায়ের নলি মাটিতে চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। ঘাসের মাথা আর খড়কুটোকে খুঁটিয়ে দেখে এতক্ষণে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হলো। ওরা একটি নয়, তুটিই বটে। বাঘিনী এই কটি দিনের মধ্যেই আবার সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে।

অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে এপারে এসেছি। ওর হাতে অস্ত্র বলতে একখানা টাঙ্গি মাত্র। তাই ওকে ফিরে যেতে বললুম।

অভিমন্যু চটে ওঠে, 'কও কি দাদাবাবু, অর্জুন সর্দারের ব্যাটা নই আমি। জানের ভয়ি নিমকহারাম বানাতি চাও আমারে। টাঙ্গিটারে হাতে ধরলি আমি বিশটা বাঘের মওড়া নিতি পারি। হেনেস্তা করে অমন কথা কবানা।'

অতএব অভিমন্যুকে সঙ্গে নিতে হলো, রুকসা তো আছেই সঙ্গে।

রুকসাকে ছেড়ে দিলুম। জঙ্গলের মধ্যে শিকারের সন্ধান করে ইঙ্গিত করবে রুকসা। ঘন্টা পেরিয়ে গেল। একবার দেখা দিয়ে রুকসা আবার ফিরে চললো জঙ্গলের গহনে।

ব্যাপারটা বুঝলুম না। সম্ভবতঃ রুকসা বাঘিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছে, তবে এখনও তার দর্শন পায়নি।

বনের অন্দর মহলে ঢুকবার জন্যে সুবিধেজনক একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন সময় দেখতে পেলুম এক শেয়ালীকে। কেয়ার ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ওর উপর লক্ষ্য রাখলুম। শেয়ালী বনের গহনে কিছু দেখবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ নেউটে বন থেকে ছুটে পালিয়ে এলো সে—সঙ্গে তার গুটি কয়েক ছা-বাচ্চা। শেয়ালী বন থেকে পালিয়ে এলো আমাদেরই কেয়া ঝোপের পাশে। আবার একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঐ জঙ্গলের দিকে। তারপর হঠাৎ একসময় আবার কেয়া ঝোপের কোন গর্তে সেঁধিয়ে গেল সে তার বাচ্চাদের নিয়ে।

মনে হলো মহৎ কোন জানোয়ারের আগমন হবে হয়তো এক্ষণি। তাই জায়গা বাছাই করে নিয়ে অপেক্ষায় রইলুম।

না– সার হলো শুধু নিষ্পলক প্রতীক্ষা।

অভিমন্যুকে নিয়ে এবার বনের মধ্যে এগিয়ে চললুম সন্তর্পণে—শেয়ালী যে পথে এসেছিল ঠিক সেই পথ ধরেই। বেশ খানিকটা পথ গুঁড়ি মেরে চলা সম্ভব হলো। তারপরেই জঙ্গল যেন নীরেট দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। থমকে দাঁড়াতে হলো। পথের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখি একটুকরো লাল কাপড় ঝুলছে কাঁটা গাছের গায়ে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলুম। লাল খুনে রাঙানো রঙীন ব্লাউজের টুকরো মাত্র। দবিরের মেয়ের গায়ের ব্লাউজ হবে নির্ঘাত।

হুঁসিয়ার হতে হলো। বন্দুকের গুলি পরীক্ষা করে নিলুম আবার। তারপরে এগিয়ে চললুম অভিমন্যুকে পিছনে নিয়ে। সতর্ক দৃষ্টি রেখেই চলেছি। কান দুটোকে খাড়া করে রেখেছি সামান্যতম শব্দের জন্যে—দশইন্দ্রিয় তখন দস্তুরমত সজাগ। তাই গাছের ডালে খস্ খস্ একটু শব্দ হতেই দেখি রুকসা। কি যেন ইঙ্গিত করছে রুকসা।

সুমুখেই একটা লতাব বেষ্টনী কি জানি কি আছে ঐ বেষ্টনীর আড়ালে।

রুকসা নেমে এলো গাছ বেয়ে। মুখের উপর তর্জনী রেখে সে আমাদের চুপিসাড়ে চলতে বলছে। আবাব গাছের ডালে চড়ে কিছুটা ডাইনে ঘুরে এগিয়ে গেল রুকসা।

রুকসাকে অনুসরণ করে কিছুটা ডাইনে ঘুরে এসেছি মাত্র। সুমুখের লতার বেষ্টনীতে যেন স্পন্দন জেগে উঠলো।

ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা একসার গাছের আড়ালে সুবিধেজনক একটা জায়গা দেখে সবে এলুম। লতার বেষ্টনীর ওপাশে ডোরাকাটা একটা লেজের ওঠানামা চোখে পড়লো। লেজের আঘাতে লতার বেষ্টনী আলগা হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যে, আর সেই ফাঁকটুকু দিয়ে দেখলুম যে বিশালকায় এক নরখাদক চলেছে আমাদের দিকে পিছন ফিরে।

জোড়ার অপরটি কোথাও আছে কাছাকাছি। কিন্তু সে কোথায় আছে তা জানা সম্ভব হলো না দেখে মন ভরে উঠলো এক দারুণ অস্বস্তিতে। অতএব আরও কিছুটা পেছু হটে যতখানি সম্ভব অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে হলো

অভিমন্যু সাহসী, তবে শক্তিশালী বলা চলে না। তা ছাড়া অস্ত্র বলতে তার সম্বল মাত্র একখানা টাঙ্গি। তাই ওব জন্যে এক প্রবল উৎকণ্ঠা তো আছেই।

বেষ্টনীর আড়ালে শত্রুকে চলাফেরা করতে দেখলুম। কিন্তু ঐ

আড়াল থেকে বেরিয়ে না এলে গুলি চালানো চলেনা। তা ছাড়া সব সময় ওর উপর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছেনা দেখে আর এক মুস্কিলে পড়লুম। অভিমন্যুকে ইঙ্গিতে বললুম গাছের উপরে চড়ে আমাকে প্রয়োজনীয় নিশানা দেবার জন্যে।

চুপিসাড়ে গাছে উঠবার চেষ্টা করছিল অভিমন্যু। বোধ হয় ওর পা ফসকে গেল কিছুটা—ছোট্ট একটা শব্দ এলো কানে। সঙ্গে সঙ্গেই লতার বেষ্টনীতে একটা বড় রকমের দোলা লাগলো আর লতাগুল্মের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো একটুখানি মাথা আর একটা চোখ মাত্র—অপর চোখটি নিয়ে মাথার অপর পাশ রইল আমার চোখের আড়ালে।

শত্রুকে সময় দেওয়া অনুচিত হবে ভেবেই ওর ঐ একটি চোখ লক্ষ্য করেই ছুটলো আমার একটি মাত্র গুলি।

কোথায় লাগে গুলির শব্দ। বিশগুণ ভারী ওজনের একটা ভয়ঙ্কর গর্জন করে আহত জানোয়ারটা যেন পিছন দিকে লাফিয়ে পড়লো। সমান ওজনের প্রতিহুঙ্কার উঠলো বেজে—হুঙ্কার আর প্রতি হুঙ্কার। প্রচণ্ড লড়াই চলেছে দুই ক্ষ্যাপা বাঘে। ভয়ঙ্কর সেই শব্দ গর্জনে বন উঠলো থরথরিয়ে কেঁপে। দক্ষ যজ্ঞের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে ভূতনাথের চেলাচামুণ্ডার দল যেন তাদের কলকোলাহলে কাঁপিয়ে তুলেছে পৃথিবীটাকে। মাথার ভেতরটাতে কে যেন হাতুড়ি পিটতে শুরু করল। দুর্জয় সাহস ঐ অভিমন্যুর। তবু সে গাছ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে। ঠক ঠক করে কাঁপছে অভিমন্যু। মনে হলো দুরন্ত শব্দ তরঙ্গে মাটি কাঁপছে যেন ভূমিকম্পে।

কি জানি কতক্ষণ জোড়ার একজন তার ক্রুদ্ধ গোঙরানির আওয়াজে প্রস্থানের বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে গেল। আহত জানোয়ারটি তখনও ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে লতার বেষ্টনীকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে।

সুযোগমত আমার আর একজোড়া গুলি যেয়ে বিঁধলো ওর মাথায়। কাতর একটা আর্তনাদ—দুঃসহ শত্রু লুটিয়ে পড়লো ছেঁড়া লতার স্তূপের উপর।

বন্য লতার দুর্ভেদ্য সেই বেষ্টনী আর নেই। অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি এখন।

অভিমন্যুর মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফোটে। 'আজ যা দেখতি পালাম দাদাবাবু, ময়না চাচাও তা দেখেনি কখনও। বাপরে বাপ! বাঘের হাঁকে মাটি ফাড়ে, বন কাঁপতি লাগে, বুকটাতেও কাঁপুনি ধরে—' অভিমন্যু ফোঁস করে একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ছাড়ে।

নিশ্বাস ছাড়লুম আমিও। অভিমন্যু সত্যি বলেছে, বোধ হয় কেউ শোনেনি এমন দুরন্ত শব্দ তরঙ্গ, আর কজনাই বা চোখে দেখেছে আহত বাঘের এই দুঃসহ হিংস্রতা।

সামলে নিতে বেশ একটু সময় লাগলো। বাঘিনীর জন্যে দুই প্রণয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি দেখেছি ক'বার। কিন্তু আজ যা কানে শুনলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত আর কিছু জানা নেই আমার।

কর্কসা যে কখন এসে আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়েছিল তা আমি খেয়াল করতেই পারিনি। মাটিতে পা দেবেনা সে কিছুতেই। আমার পিঠের উপর ঝুলতে থাকে তাই।

হ্যাঁ, বাঘ বটে, বাঘিনী নয়। বাঘিনী পালিয়েছে। খুঁটিনাটি পরীক্ষার পরে মনে হলো যে বাঘিনী এখানে নিদ্রামগ্ন ছিল। চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাঘ লাফিয়ে পড়লো বাঘিনীর ঘাড়ে। তারপর শুরু হলো ওদের কান ফাটানো চীৎকার।

চতুর বাঘিনী পালিয়েছে। সম্ভবতঃ সে এতক্ষণ ভেড়ির পারের কেওড়ার জঙ্গলে আস্তানা নিয়েছে। তার পেছু ধাওয়া করে লাভ নেই। আর সত্যি বলতে কি স্নায়ুযন্ত্রটিও যেন শরীরের সব উদ্যম সকল শক্তিকে নিঙড়ে নিয়েই তার নিজের প্রাণশক্তিটুকু কোনমতে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাই ময়নার অনুকরণে আমিও কপালে হাত ছুঁইয়ে লাখ সেলাম জানালুম সেদিন সেই অদৃশ্য শক্তিকে যিনি আমাকে সেই চরম মুহূর্তেও লক্ষ্যভেদ করবার গৌরব দিলেন

বারো

আরো কটি দিন। খবব এলো—জবর খবর। হাটের উপরে হানা দিয়েছিল বাঘিনী। মরেছে কজনা মাত্র। কিন্তু জখম হয়েছে অনেকে।

একবার নয়, ছুবার নয়, সন্ধ্যে পর্যন্ত হানা দিয়েছে বাঘিনা। ভাষণ ক্ষেপে উঠেছে, গজন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে হাটেরই আশে পাশে।

ভেড়ির বাঁধে হাটুরে-কাঠুরে মারা পড়ে বটে, তাবলে হাটেব উপরে হামলা!

কথাটা শুনতেও তাজ্জব লাগে।

আমার বিস্মিত দৃষ্টির সুমুখে হো হো করে হাসতে থাকে ময়না, 'ওর কালপূর্ণ হয়েছে দাদাভাই। এবার শেষ।'

সন্ধ্যার পরেই যাত্রা করবো আমরা।

নিত্যকারের মতই মার কবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিলুম।

আমার পোষা ভালুক রতন যেন কাত্নি গাইছে। কেন—কেন এই কান্না রতনের? ওকে আমি নিজের হাতে খাবার দিই, স্নান করাই। সকাল-বিকেল কুস্তি লড়ি ওর সাথে, আবাব চা খাই একসঙ্গে। রতন যে এখন আমার রাতদিনের সঙ্গী। কালী ওকে কত রকমের মজাদার খেলা শিখিয়েছে। আমাকে খুশি করবার জন্যে রতন আমাকে কত খেলাই না দেখায়। বাঘার চাইতে রতন আমার অনেক বেশি অনুগত। সারাদিন তো ছেড়েই রাখি ওকে। ইচ্ছে করলেই তো সে চলে যেতে পারে।

ওর কাঁত্নি শুনে মনটাতে তাই মোচড় লাগে। মাথা উচিয়ে ওঠে অজ্ঞাত এক বেদনা।

বন্ধনের ব্যাথা নয়, হয়তো সঙ্গিনীর সঙ্গলাভের ক্ষুধা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই ভাবছিলুম। হঠাৎ ভারিক্কী কোন জানোয়ার যেন ঢুকে পড়লো রতনের ঘরে। কি জানি কোন জানোয়ার!

মাটির বেড়ার গায়ে কান পাতলুম সাবধানে। রতনের গলা শুনতে পাচ্ছি, আর একটি মৃদু কণ্ঠ। বেশ বুঝতে পারি প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলনে রতন এখন মশগুল।

ফুলশয্যের রাতে আড়ি পেতেছি ভেবে ভারি লজ্জা হলো। ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে।

যাত্রা করলুম রাত দশটায়।

একবার ভাবলুম, রতনকে আজ ছেড়ে দিয়ে যাই, সুখে সংসার করুক সে। ময়না ওর বাঁধন খুলে দিল।

ময়ূরপঙ্খী বোট বাঁধা রয়েছে ঘাটে। জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বোটের ছাদে উঠে বসেছি। কোত্থেকে এসে বোটের উপর লাফিয়ে উঠলো রতন। বোটের মাঝি আঁউ মাউ করে উঠে লাফিয়ে পড়েছে নদীর জলে।

মাঝির কাণ্ড দেখে ভারি মজা পেয়েছে রতন। মানুষের মত দুপায়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখাচ্ছে সে।

নৌকা চললো তর তর করে। জোয়ারের টানে আর দাঁড়ের ঠেলায় পাখির ডানায় ভর করে উড়ে চলার মত।

রতনের নরম দেহের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছি আর ঘুম ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে দেখছি পৃথিবীটাকে।

নদীর জলে আকাশের চাঁদ যেন দোলনায় দুলছে। আশেপাশে তার নেচে চলেছে জলপরীরা, লক্ষ হীরের ঝিকিমিকি ওদের জরীর ওড়নায়।

বামে সুন্দরবন। পাতালপুরীর অন্ধকার ওর গর্ভে। দৃষ্টি ওখানে থমকে দাঁড়ায় ভয়ে। তবু সেই অতলস্পর্শী অন্ধকারের মধ্যে কোথাও বা জ্বলছে শত মণিদীপ, কোথাও বা বনদেবী

তাঁর শত সখী সঙ্গে বাসব সাজিয়ে বসে আছেন সহস্র আলোব মেলায।

কানে এলো, 'টিউ টিউ'। মণিদীপেব মেলা নয়, হবিণ-হবিণী দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তাদেব চোখেব মণি জ্বলছে।

'আ-উন'—বাতাসে ভেসে এলো বহুদূবেব আওয়াজ।

মণিদীপেব মেলায কাঁপন লাগলো বুঝি উত্তুরে হাওয়ায়, দোলন লাগলো গাছেব মাথায়, লাখ কাক একসঙ্গে চেঁচিযে উঠলো কা-কা-কা।

বতন একটু আড়ামোড়া ভেঙে নিল। ক্যাবলা আমাব পায়েব কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল, সন্দিগ্ধ চোখে একবাব বতনেব দিকে তাকিযে আবার মুখ গুজে বইল সে।

কুকসা আমাকে বাব দুই তিন ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাব গাযেব উপব চডে বসতে যাচ্ছিল। ময়নাব কাছে একটা চড খেয়ে স্থস্থিব হলো সে।

বাত তখন একটা। কাঠ বোঝাই একটা বড বজবা নোঙব ফেলেছে নদীব কুলে। বজরাব আডালে শব্দ হলো 'ঝুপ'। ক্যাবলা অমনি ঘেউ ঘেউ কবে ওঠে, একটানা ডাকতে থাকে বজবাব দিকে তাকিয়ে।

সন্দেহ হলো। বোটেব মাঝিকে বললুম কাঠেব বজবাব গাযে বোট ভেড়াতে। ময়না বলে, 'পাডেব দিকে চেযে দেখো দাদাভাই'

দেখলুমও। একটা বিশাল দেহ জানোয়াব বার দুই গা ঝাডা দিয়ে গায়েব জল ঝবিয়ে নিল। তাবপবে ঢুকলো যেযে নদীব পাডেব কেওড়াব জঙ্গলে।

বজবাব মাঝি মাল্লাদেব ডেকে তুললুম। কি কুম্ভকর্ণেব ঘুম ঘুমোয় ওরা!

হালেব মাচানে শুযে ঘুমুচ্ছিল হালেব মাঝি হেদায়াতুল্যা আব তাব বড ছেলে। ছেলে আছে, নেই তার বাপজান।

·হেদায়াতুল্যাকে ধরে নিয়ে গেছে বাঘিনী।

ময়নার সঙ্গে যুক্তি করে বোট ছেড়ে দিলুম তক্ষুনি। আরো এক-মাইল এগিয়ে গিয়ে নৌকা ভেড়ালুম এক শ্মশানঘাটে।

ভেড়ির বাঁধের উপর দিয়ে রতন ক্যাবলা আর রুকসাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছি আমরা ভেড়ির নিচে থেকে।

রুকসার সঙ্গে রতনের বেশ মাখামাখি আছে বটে, তবে ক্যাবলার সঙ্গে রুকসার সম্পর্কটা একেবারে আদায় কাঁচকলা গোছের। মাঝে মাঝে ক্যাবলা ওকে তেড়ে আসে বলে রুকসা ওর গা ঘেঁষতে নারাজ। ক্যাবলা আবার রতনকে রীতিমত সমীহ করে চলে। বুদ্ধিমতী রুকসা ক্যাবলাকে কলা দেখিয়ে চড়ে বসলো তাই রতনের পিঠে।

ভেড়ির উপরে ওরা আর ভেড়ির গা বেয়ে চলেছি আমরা। যেখানে বাঘিনী নৌকা থেকে মানুষ নিয়ে ডাঙ্গায় উঠেছে সেখানটাও পেরিয়ে এলুম। অথচ ভেড়ির উপরে ক্যাবলা, রুকসা বা রতনের কোন ভাবান্তর দেখা গেলনা।

কেওড়ার জঙ্গলে বাঘিনী লুকিয়ে থাকলে ক্যাবলার নজর এড়াবার কথা নয়। তাই একটু অবাক হয়ে গেলুম।

উপায়ান্তর না দেখে আরো এগিয়ে চলি। নদীর বাঁকে পৌছাতে এখনও প্রায় মাইলটাক পথ বাকি। এই বাঁকের মাথায় ভেড়ির এই পাশেও বিস্তৃত আছে একখণ্ড জঙ্গল। ভেড়ির মত অতখানি উঁচুতে না হলেও সমতল থেকে এই জঙ্গলের অবস্থান অনেকখানি উঁচু এলাকা জুড়ে।

লোকে বলে কুকুরমুখো জঙ্গল। সত্যিই তাই। ভেড়ির বাঁধের কাছে জঙ্গলের মুখটা কুকুরের মুখের মতই সরু।

দুপাশে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে ভেড়ির বাঁধ। জঙ্গলের ছায়ায় জায়গাটা বেজায় অন্ধকার। এইখানেই বাঘিনী মানুষ মেরেছে দু'দুবার। চেহারা ছবিতেই সে ভয়াল ভয়ংকর মহাশ্মশানের ইঙ্গিত তার রুক্ষ চাহনিতে।

অন্ধকার খুব গাঢ় নয়, লক্ষ কোটি দেউটি জ্বালিয়ে আছে দূর আকাশের তারা। বনের মাথায় মাটির বুকে নেমে এসেছে ওদের নিবু নিবু আলো—রহস্যময়ীর ওড়না ঢাকা মুখের মতই পৃথিবী।

কোথাও কোন শব্দ নেই। ঝিঁ ঝিঁ পোকা শুধু ঐক্যতান তুলে চেঁচিয়ে মরছে, সেই আদ্যিকাল থেকে।

গাছ বেয়ে উঁচু ডালে চড়ে ময়না একবার নজর বুলিয়ে নিলে ভেড়ির ওধাবের কেওড়ার জঙ্গলের উপর।

ভেড়ির গায়ে খাদ বাছাই করে অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। রতন আর ক্যাবলা রইল বাঁধের উপর, রুকসাকে তুলে দিলুম গাছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। ক্যাবলা আর রতন দুজনেই শুয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে।

ভাবছি, হয়তো বা ভুল করেছি। সবটাই তো অনুমানের উপর নির্ভর। বাঘিনী হয়তো এতক্ষণ অনেক দূরে, আমাদের নাগালেব বাইরে। আবার এমনও হতে পারে যে আমাদেরই উপর গোয়েন্দাগিরি করছে সে। এক মুহূর্তের অসাবধানতা—ব্যস্! আমাদের একজনকে মুখে তুলে নিয়ে যাবে সে।

মন বলছে সে আছে এখানেই খুব কাছাকাছি কোন জায়গায়। হয়তো সে কল্পনাতেও ভাবেনি যে নিশাচর দুই দ্বিপদী মানুষ এই গভীব রাতে ওৎ পেতে আছে তারই অপেক্ষায়।

অমন ধড়মড় করে উঠে পড়লো কেন ক্যাবলা? রতনও উঠে দাঁড়াল কেন? কেওড়ার জঙ্গলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে কি দেখছে ওরা?

তর তর করে গাছ বেয়ে নেমে এলো রুকসা। মাটির উপরে বার কয়েক লাফিয়ে আবার সে চড়ে বসলো গাছে।

ভেড়ির বাঁধ থেকে নেউটে নেমে এলো ক্যাবলা। রতনও নেমে আসছিল। খাড়াই বেয়ে নামতে যেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লো সে।

ওদের গলার বেল্ট থেকে দড়ি খুলে দিলুম, বন্দুক বাগিয়ে প্রতীক্ষায় রইলুম। এই বুঝি এলো সেই শুভলগ্ন। কান খাড়া করে আছি।

না, কোথাও কিছু নেই। বন্দুক নামিয়ে নিলুম।

'ফ্যাঁচ-ফ্যাচ'--সুমুখের সেই কুকুরমুখো জঙ্গলে বাঘিনীর নাক ঝাড়ার শব্দ।

বাঘিনী আমাদের বেকুব বানিয়েছে বটে, কিন্তু ওর সন্ধান পেয়েছি ভেবে মন ভরে উঠলো এক অভাবিত আনন্দে।

এই গহন জঙ্গলের অন্ধকারে এখুনি ওর পেছু নেওয়া অসম্ভব। আরো সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে রইলুম তাই ওর পথ আগলে। বাঘিনী যেন আমাদের বোকা বানিয়ে আবার ঐ কেওড়ার জঙ্গলে ফিরে না যায়।

ভোর হলো। গাছের পাখিরা বাসা ছেড়ে ডানা মেলে দিল দূর পথের পাড়িতে।

ধীরে ধীরে সূর্যের আলো ফুটলো—দস্তুরমত সকাল এখন। তবে বনতলের অন্ধকার তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। রাতের পরিশ্রমের পরে বাঘিনীও হয়তো অলস ঘুমে আচ্ছন্ন।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলেছে ক্যাবলা। হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো বা বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছি আমরাও।

জঙ্গলের গভীরে এসে কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে ক্যাবলা। স্পষ্টই বুঝতে পারি যে বাঘিনীর নিশানা হারিয়ে ফেলেছে সে।

ভাবছি কি করা যায় এবার, এমন সময় হাজির হলো রুকসা। কয়েকবার আমাকে পাক ঘুরে শেষ পর্যন্ত গাছে চড়ে বসে মাথা চুলকাতে শুরু করলো সে।

রুকসাও বাঘিনীকে খুঁজে পাচ্ছে না।

ময়না আমার মুখের দিকে চায়। আমি জানি কি বলতে চায় ময়না।

দীর্ঘ তিন বছরের একটা ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে সে আজ যবনিকা টেনে দিতে বদ্ধপরিকর। এই স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা সে আর সইতে পারছে না। তাই সে আজ নিজের জীবনটাকেই বাজি ধরতে চায়।

বাঘিনীর চার হবে সে নিজে।

বুকের ভেতরকারের হৃৎপিণ্ডটা একবার জোরে দুলে উঠলো। দুরন্ত কৌশলী শত্রু—সবাই বলছে যে সে অপরাজেয়।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম তবু।

কি জানি, বন্দুকের গুলিজোড়া আবার পরীক্ষা করে নিলুম।

ঘন গাছের তল দিয়ে লতাগুল্মের বেষ্টনী ভেদ করে আরো অনেকখানি এগিয়ে এসে পেলুম একটা পছন্দমত জায়গা।

কয়েক গজ সুমুখে সমকোণ রেখায় থাকবার জন্যে ময়নাকে ইঙ্গিত করলুম আমি। সম্ভবতঃ আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে তিরিশ ডিগ্রীর মত একটা কোণ সৃষ্টি করে মোটা গুঁড়িওয়ালা এক গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো ওর।

আপত্তি করলুম না। কারণ, অবস্থান সম্পর্কে বর্তমান স্থান নির্বাচনই শেষ কথা নয়।

বাঘিনী কোন পথে আসবে কে জানে! অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা, ফলে অবস্থানের অদল বদল হতেও বাধা। ঘন গাছের বেষ্টনী গুলি চালানোর পক্ষে এক মস্ত বাধা। বাঘিনী যে পথেই আসুক না কেন, সুমুখের ঐ হালকা ত্রিভুজ আকারের গণ্ডীর মধ্যে পা না দিলে গুলি চালাবার উপযুক্ত অবকাশ নাও মিলতে পারে।

ত্রিভুজ আকৃতি ঐ জায়গাটার মধ্যে খানিকটা এলাকা জুড়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে কটি ঝাঁকড়া মাথা গাছ। এই বৃত্তের কেন্দ্রে যেটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছে তাতে দুজন মানুষের পাশাপাশি বসে থাকাও চলতো।

'আ-আ-আ-উন্'—মৃদু অথচ গম্ভীর গর্জন বনের বদ্ধ বাতাসে ঢেউ জাগালো।

ক্যাবলা ভয় পেয়ে কেঁউ কেঁউ করে ওঠে। তাড়াতাড়ি আমি ওর মুখ চেপে ধরতেই সে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লো আমার বুকের তলে।

অস্থির হয়ে ওঠে রতনও। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে দেখে এদিকে ওদিকে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানে নাক উঁচিয়ে। তারপর আমার পিঠ আঁচড়াতে থাকে সে।

আবার সেই গম্ভীর ডাক—আরও দীর্ঘ, আরও জোরালো।

গোটা বন গম্ গম্ করতে থাকে। বুকটাও বুঝি কেঁপে ওঠে। অদেখা আড়াল থেকে ডেকে ওঠে একপাল কাক—কা-কা-কা।

একপাল শেয়ালও চেঁচিয়ে উঠলো বেসুরো গলায়। বাঘের আবভাবে কেউ ডাকবেই। মানুষের দুনিয়াতেও তাই বটে।

আবার সেই গর্জন। এবারে গাম্ভীর্য কম, জোর কম, তবে অর্থপূর্ণ অনেক বেশি।

যৌবন ক্ষুধায় আকুল হয়ে মদমত্ত ব্যাঘ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সাথী।

যৌবনের এই ক্ষুধা সর্বনেশে ব্যাধির মতই সংক্রামিত হয় রক্ত-মাংসের পরিব্যাপ্তিতে।

যে ক্যাবলা এতক্ষণ শামুকের মত তার দেহকে গুটিয়ে নিয়েছিল শক্ত খোলের আবরণে সেও তার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো হঠাৎ। ওর চোখেও সেই দুরন্ত ক্ষুধা, সঙ্গিনীর সান্নিধ্য লালসা।

রতনও হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেছে ওর যৌবন সম্পর্কে। দেহটাকে ফুলিয়ে মস্ত বড় একটা হাঁক তুললো সে।

আবার সেই ক্ষুধিত আহ্বান—আরও জোরালো।

এবার প্রত্যুত্তর এলো

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায়নি তখনও, ময়না আবার ডাক পাঠায়।

আবার আসে উত্তর।

ওদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধ্বনি তরঙ্গ যেন শতকণ্ঠ হয়ে সোরগোল তুলল গোটা জঙ্গল জুড়ে।

ময়না ডাক বন্ধ করে। ওদিক থেকে ডেকে মরে বাঘিনী—একবার, দুবার, তিনবার।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে বাঘিনী। শব্দের গতি আন্দাজ করে বুকে হেঁটে জায়গা বদল করে নিল ময়না।

বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ গাছের সেই ফাঁকটুকুতে ঠেলে দিলুম রতনকে। আমাকেও জায়গা বদল করে নিতে হলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

বাঘিনীর গর্জন শুনতে পেলুম আবার। ওর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আঙুল রাখলুম ট্রিগারে।

ঐ আসছে বাঘিনী—টগবগিয়ে আসছে। একটা গাছের গুঁড়িকে ডিঙিয়ে গাছের সারির মধ্যে মাথা গলিয়ে টগবগিয়ে আসছে সে।

শুমুখের ঐ লতাগুল্মের আড়ালটুকু পেরিয়ে এলেই—

বাঘিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কি যেন ভেবে নিয়ে ময়নার পিছন দিকে ঘুরে গেল সে।

সর্বনাশ!

ময়নাকে সে হয়তো দেখতে পেয়েছে।

না। আমার অনুমান সত্যি নয়। ওর চলার ভঙ্গী দেখে খানি আশ্বস্ত হলুম।

ঘন সন্নিবিষ্ট একসারি গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল বাঘিনী।

ব্যাকুল হয়ে উঠি আমি। বাঘিনী কি চলে গেল? কি জানি কি ওর মতলব!

আগাছার ঝোপে আত্মগোপন করে সে যদি আমার পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে অকস্মাৎ!

সম্ভবতঃ বাঘিনী আমার উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ

করেনি। তবুও নিরাপত্তার কথা ভেবে আরো একটু বুকে হেঁটে এগিয়ে যাবার জন্যে বন্দুকটাকে সুমুখের দিকে ঠেলে দিলুম।

হঠাৎ মনে হলো এক ভীষণ বিপদের মুখে আমি মাথাটাকে এগিয়ে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি বন্দুকটাকে আবার টেনে নিতে হাত বাড়িয়েছি, ঝোপের পাশে নাকের নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠলুম।

টগবগিয়ে বেরিয়ে এলো বাঘিনী ঝোপের আড়াল থেকে। একসারি গাছের এপাশে আমি, ওপাশে বাঘিনী।

মাথার উপরে খ্যাক্ খ্যাক্ করে উঠলে রুকসা। বাঘিনী থমকে দাঁড়ায়, চোখ তুলে চায় রুকসার দিকে। বাঘিনীর লম্বা লেজ বোধ হয় আমার পিঠের জামা ছুঁয়ে গেল। রুকসা এগিয়ে গেল ডালে ডালে লাফিয়ে। বাঘিনীও এগিয়ে চললো।

আমার কথা! অনেকক্ষণ দম বন্ধ করে থাকাতে বুকের বদ্ধ বাতাসের ফুৎকারে নিজেই চমকে উঠলুম। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে নিলুম আবার। কিন্তু বাঘিনী? আবার হারিয়ে গেছে সে।

ময়নার ডাক কানে এলো---আবার সেই ডাক। পিপাসিত জীবনের উদগ্র ক্ষুধা, সঙ্গিনীর লোভ, না পাওয়ার ক্ষোভ যেন মূর্ত হয়ে উঠলো ময়নার ডাকে।

উত্তর এলো সঙ্গে সঙ্গে। পঞ্চাশ গজ দূরের গাছের এক সারির মধ্য দিয়ে ফিরে আসছে বাঘিনী।

একটু গড়িয়ে মুখ ঘুরে নিলুম আমি। আমার বন্দুকের নল এখন বাঘিনীর কান বরাবর উঁচিয়ে ধরেছি। বাঘিনীর চলার সঙ্গে তাল রেখে আমার বন্দুকের নলও বাঁয়ে ঘুরছে, ঘুরছে আমার চোখের তারাও।

বিশ গজ দূরের পারে এক সারি গাছের আড়ালে এসে থমকে দাঁড়াল বাঘিনী।

ওর পেছনের অংশটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি মাত্র।

নিরুপায় হয়ে একটা খালি কার্তুজের খোল নিয়ে ছুঁড়ে মারলুম

রতনকে। গাছের গুড়িতে আঘাত লাগাতে ছোট্ট একটা শব্দ হলো। বাঘিনীও অমনি মুখ ফেরালো আর রতনের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো তক্ষুনি।

গাছের সারির বৃত্ত মধ্যে দুপায়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে একটা কিম্ভুত কিমাকার আওয়াজ করে উঠলো রতন।

রাগে গর গর করে ওঠে বাঘিনী। ঘন ঘন বার কয়েক লেজের ঝাপটা মেরে ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বন কাঁপিয়ে তোলে। তারপর, দুরন্ত গতিতে বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রতনের উপরে।

'গুড়ুম-গুড়ুম,' গর্জন করে উঠলো আমার হাতের হাতিয়ার।

দুরন্ত গতির মুখে দুর্নিবার আঘাতে যেন ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে পড়লো বাঘিনী।

ভয় পেয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটে পালালো রতন। আমার বগলের তলে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল ক্যাবলা।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বাঘিনী। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওর চোয়াল বেয়ে।

দু তিনটে কার্তুজ ছুড়ে মারলুম। আঘাতে স্পন্দন জাগলো না বাঘিনীর বুকে। কি জানি তবু ওর মৃত্যুকে যেন মেনে নিতে চায়না মন।

কণ্ঠনলীর ভেতর দিয়ে আর একজোড়া গুলি ওর মগজটাকে চুরমার করে দিল।

মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা—তা হোক।

অভাবিত সাফল্য। বন্দুকের কুঁদোর উপর মুখ রেখে হাঁপাচ্ছি তখন। দেহের ঘামে পরণের ব্রীচ সার্ট সব ভিজে।

ময়নার কাঁধে ভর দিয়ে তবেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি।

বাঘিনীকে ভাল করে চেয়ে দেখি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মধ্যাহ্নের সূর্য যেন সহস্র চোখে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইছে বাঘিনীকে। ঝিলমিল রোদে ঝকমক করছে ওর দেহের বর্ণাঢ্য

শোভা। দীর্ঘ ছন্দোময় দেহ, যৌবনেব দীপ্তিতে ভাস্বব, শক্তিব পূর্ণপ্রতিচ্ছবি—এমনটি বোধ হয় আব কখনও দেখিনি।

মানুষখেকো বাঘ একটু ভুঁড়িভাবী হয় বলে জানতুম। তাছাড়া ওব চোখে থাকে শয়তানেব চাহনি।

অবাক হলুম এই দেখে যে বাঘিনীব দেহে যেমন বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, বিশাল মুখখানিতে তেমনি হিংস্রতা ও চাতুর্যেব পবিবর্তে ফুটে বয়েছে চমৎকাব মমতাময়ী শ্রী।

বহমান ওকে কি চোখে দেখেছিল কি জানি। এতবড় একটা জয়েব আনন্দেও হাসতে পাবলুম না আমি।

রুকসাও ওকে চেয়ে দেখছিল কাতব চোখে। বাব কয়েক ঘউ ঘউ কবে ক্যাবলাও শেষ পর্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বইল বাঘিনীব দিকে।

বনেব বাইবে আসতেই দেখি দাঁড়িয়ে আছে বতন। সুমুখেব দুই পা তুলে আমাকে সে জড়িয়ে ধবে। ময়না ওব মাথায় একটা চাপড় মেবে বলে, ব্যাটা এখন কুস্তি লড়বাব সময় পেল

ময়নাব কথাব প্রতিবাদ কবে বতন সবস্ববে

॥ তেরো ॥

পড়ন্ত বেলায় ফিরে এলুম আখতারের বাড়িতে। কাছাবিব কর্তাদের থাকবার জন্যে নির্দিষ্ট একখানি ঘর আছে ওখানে। রাত্রিটা নিরিবিলি সেখানে কাটিয়ে সকালে রওনা হব বড় কাছাবিব উদ্দেশে।

একটা দীর্ঘ ইতিহাসের শেষ হয়েছে। বহু শ্রমের, বহু সাধনাব, বহু ঘটনার ও অনেক দুর্ঘটনার ইতিহাস, অমিত কর্মব্যস্ততাব আর অপরিমেয় আশাভঙ্গের ইতিহাস, বহু ক্ষয় আর অপূবণীয ক্ষতিব ইতিহাস। হাসিকান্নার আর আনন্দ-দুশ্চিন্তার নাটকীয় পট পরিবর্তন ঘটেছে। সেই ইতিহাসেব আজ সমাপ্তি।

অনেকদিন পেট ভরে খাইনি, বাড়া ভাত ফেলে রেখে ছুটেছি; অনেকদিন ঘুমাইনি যেন।

চোখ জুড়ে এসেছে যত বাজ্যের ঘুম, জীবনে এসেছে বেঁচে থাকার অবসাদ। বন্দুক বয়ে বয়ে বাহুতে ধরেছে ব্যথা। আজ ঐ খুনী হাতিয়ারটাকে শিকেয় তুলে রাখবো, শয্যার পাশে ঠেস দিয়ে আর রাখতে হবেনা ওকে। ঘুমুতে চাই সাধ মিটিয়ে, মায়ের সেই কবরের বেদীর উপরে মাথা রেখে খোলা মাঠের ধারে।

কিন্তু ঘুমুতে ওরা দেবে কেন আমাকে। ঘোড়ার পিঠে কিংবা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওরা গাঁয়ে গাঁয়ে, ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করছে যে বাঘিনী সবংশে মরেছে।

সন্ধ্যে হয়েছে। তা হোক, আজ আর ভয় নেই ওদের। ভেড়ির বাঁধের নিচে জোয়ারের দুর্দম জলস্রোত। বাঁধের উপরে উন্মত্ত জনস্রোত। হাতে হাতে মশাল, কাঁধের উপরে কিংবা মাথার মোটে বিচিত্র উপহার। আর বুকের মধ্যে বহে নিয়ে এসেছে ওরা অতলস্পর্শী ভালবাসা।

'আমি যে ইতিহাসের নায়ক, আমি যে ওদের দুঃখের দিনের সান্ত্বনা, দুঃখ পরিত্রাতা। আমাকে আজ অদেয় নেই তো কিছু। ঘোড়াবাজ আখতার পর্যন্ত ওর সেই সখের ঘোড়াটি আমাকে উপহার দিয়ে বসলো।

এই একটি সন্ধ্যার বিনিময়ে বাঙলাদেশের মসনদও বুঝি সেদিন বিলিয়ে দিতে পারতুম আমি।

রাত্রি দশটার পরে একটু ফাঁকা হলো। সবাই এসেছে, কিন্তু একটি প্রিয়জনের যে দেখা নেই। আমি জানি উপস্থিত মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশি খুশি হয়েছে আখতারের নাতনী। দশ-বারো বছরের প্রিয়দর্শিনী মেয়ে। জানালা দিয়ে কবার দেখেছি তাকে। প্রবল উৎসাহে সখীদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত আগন্তুকদের অভ্যর্থনার কাজে সে ব্যস্ত। জল দিচ্ছে, পান দিচ্ছে বাটা ভরে, বিশটা হুঁকোর কলকে জোগাচ্ছে তামাক-আগুন দিয়ে।

তার রাজপুত্তুর বন্ধুকে আজ সবাই বলছে বনবিবির বরপুত্তুর! হাসিতে খুশিতে উপচে পড়ছে আমিনা—সে, আজ একাই একশ'

আমিনার পথ চেয়েই বসেছিলুম। ওর সঙ্গে কথা না বলে যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে ঘাটে বাধা বজরার নোঙর তুলে হয়তো সে ভাসিয়ে দেবে জোয়ারের স্রোতে।

সখীদের সঙ্গে নিয়ে আমিনাও আসছিল। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখে যেন আঁৎকে উঠল আমিনা। ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। দাওয়ার উপরে ওর মা ওকে ধরে ফেললেন। আমিনা চেঁচাতে থাকে, 'তোমরা মিথ্যুক। ও লোকটা কখখনো না, কখখনো রাজপুত্তুর হতে পারে না। মাগো, মুখটা কেমন পোড়া পোড়া আর চোখদুটো যেন জানোয়ারের মত জ্বলছে। লোকটা যেন খুন খারাপি করে এসেছে।'

আমিনার গালে ঠাস ঠাস করে চড় কসিয়ে দিলেন ওর মা, 'পাজি হতচ্ছাড়ি, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো আমি।'

কাছারির বরকন্দাজ ছাড়াও কালী এসেছে আমাকে পাহারা দিতে। চোখে তবু ঘুম এলোনা। আমিনার কথাগুলো কানে বাজতে থাকে শুধু।

সঙ্গের সেই ছোট্ট আরশিটাকে বার করলুম নিজের চোখে মুখখানাকে একবার দেখবো বলে। সাহস হলোনা।

মন-মুকুরে তখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে জানোয়ারের সাথে লড়াই করতে যেয়ে আমিও যেন জানোয়ার হয়ে গিয়েছি।

জয়ের জ্বালা যে কত বড় তার পরিমাপ সেদিন কেউ করেনি। আমি বোধ হয় আজও ভয় পাই তার হিসেব নিকেশ করতে।

হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু, ঘোড়া, মাছ, ডিম ও তরীতরকারি—বিচিত্র উপহারে ভবে উঠেছিল কাছারি। পলাতকেরা ফিরে এসেছে তাদের ভাঙা ঘরে। গাঁয়ের মানুষেরা আবার তাদের ঘর বেঁধে দিচ্ছে, লাঙ্গল, গরু আর খামারের ধানও ধার দিয়েছে।

দিনের বেলায় কাছারিতে সেদিন ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। রাতে আবার গানের পালা।

হৈ হৈ কাণ্ড।

ময়না, কালী, রূপো এমন কি পলাতক পাঠক সিংও দুর্গার মত দশ হাতে কাজ করছে।

সদরে অন্দরে, ভেড়ির বাঁধে, নদীর কিনারায় কিংবা প্রকৃতির আঙিনায়, তেপান্তরের বিলে অথবা নদীর কোলে স্পন্দিত হচ্ছে এক অফুরন্ত চঞ্চল জীবনধারা।

আসরে বসে পালাগান শুনছিলুম। সন্ধ্যে রাতের পালা শেষ হবে রাত পোহালে।

শয়তানীর সঙ্গে রাজপুত্তুরের লড়াই—দীর্ঘ কঠিন সে সংগ্রাম।

বিশাল জনতা, একাগ্র মনে শুনছে, জাগ্রত চোখে নিরলস চিত্তে।

রাত বোধ হয় তখন বারোটা। বনবিবির সভায় চারণ দূত গান ধরেছে—